পিএইচ.ডি গবেষণাপত্র

ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির ‘প্রাচ্য’ ও ‘পাশ্চাত্য’ ভ্রমণ

আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকল্প ও প্রয়াস

গবেষক

সেমন্তী নিয়োগী

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' ভ্রমণ: আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকল্প ও প্রয়াস

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor Of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ProfessorSuchorita Chattopadhyay And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or doploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by

Supervisor : Candidate

Dated :Dated :

যাঁদেরকে, ধন্যবাদ

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়কে। আমার তুলনামূলক সাহিত্যের হাতেখড়ি যাঁদের হাত ধরে হয়েছিল সুচরিতা-দি তাঁদের অন্যতম। বি.এ প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে পিএইচ.ডি-র এই বেশ দীর্ঘ পথ ওনার সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ করা একেবারেই সম্ভব ছিলনা। গবেষণার প্রতিটি পর্বে, আমায় উনি নিজের মতো করে ভাবার স্বাধীনতা দিয়েছেন আবার যাতে দিকবিভ্রম না হয় সেই খেয়ালও রেখেছেন। বক্তব্য বা আঙ্গিক কোনও দিক থেকেই কোনও খামতি ওনার তীক্ষ্ণ নজর এড়ায়নি। এবং বলতে দ্বিধা নেই, গবেষণার একেবারে শুরুতেই ওঁনার সরবরাহ করা ভ্রমণ বিষয়ক লেখালেখিগুলি আমার প্রায় দিশাহীন দশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছিল বলেই আজ ধন্যবাদা দেওয়ার আয়োজন করতে পারছি। ধন্যবাদ জানাব আমার বিভাগের বাকি সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের। আমার গবেষণার প্রতি উৎসাহ তৈরিই হয়েছে তাঁদের পড়ানোর গুণে। তুলনামূলক সাহিত্যের নানা পরিসরে তাঁদের সযত্ন প্রশিক্ষণ আমার সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা আর কৌতূহলকে কখনো কমতে দেয়নি, আর এই না দেওয়ার ফলশ্রুতিই এই গবেষণাপত্র। যাঁদের ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিলনা তাঁরা হলেন আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের নিতাই-দা আর সুদীপ-দা। যখন যা বই লেগেছে ওনারা খুঁজে দিয়েছেন। নির্দিষ্টি মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও ইচ্ছেমতো বইগুলি রাখতে দিয়েছেন। একইভাবে সাহায্য পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকেও। প্রভূত সহযোগিতা পেয়েছি গোলপার্ক ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গ্রন্থাগারের সকলের কাছ থেকে, যেখানে শেষ কয় বছরের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। এই গ্রন্থাগারে শুধু প্রয়োজনীয় বই নয় বৈদ্যুতিন সাহিত্য জার্নালগুলি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। উনিশ শতক বিষয়ক বহু বই, পুরনো পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, নথির জন্যে পুরোপুরি ভরসা করেছি জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর। আমার নিজের আলোচনার সময়কাল বিষয়ে মূল ভাবনা তথা ধারণাগুলি দানাই বেঁধেছে এই সকল লাইব্রেরীর সাহচর্যে।

এছাড়া অবশ্যই বলব ইউ.জি.সি. নেট ফেলো হিসেবে বিভাগে পড়ানোর সুযোগের কথা, আমার ছাত্রছাত্রীদের কথা। ওদের পড়াতে গিয়ে অজান্তেই নিজের অনেকটা পড়া হয়ে গেছে। বিশেষত বাংলার ঔপনিবেশিক পর্ব বিষয়ে অনেক বই-এর সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়েছে ওদের পড়ানোর সূত্র ধরে।

বিশেষভাবে বলতে হয় কিছু বন্ধুর কথা। গবেষণার এই দীর্ঘপর্বে যখনই আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগেছি পাশে থেকে ক্রমাগত সাহস জুগিয়েছে চয়নিকা। উনিশ-বিশ শতকের বাংলা সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক বহু বই ওর থেকে পেয়েছি। অনেক সংশয় কেটে গেছে, ভাবনারা নতুন বাঁক পেয়েছে ওর সঙ্গে আলাপচারিতায়। আরও দুই বন্ধু গৌরব আর আত্রেয় সবসময় উৎসাহ দিয়েছে, লেখা শেষ করার তাগাদা দিয়েছে আর যখনই দরকার হয়েছে বই থেকে শুরু করে গবেষণা সংক্রান্ত হাজারো খুঁটিনাটি নিয়মকানুনের ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভাগের অন্যান্য গবেষকদের কথাও অবশ্যই বলতে হয়। বিশেষ করে ঊর্মি, পৌলোমী দীপান্বিতা আর প্রত্যয়-দার কথা। নানা সময় গবেষণাকেন্দ্রিক নানা ব্যাপারে ওঁদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল।

বাড়ির মানুষদের কথা আলাদা করে বলতে চাই না, কারণ যতই বলি না কেন বাকি থেকেই যাবে। মা (কবিতা নিয়োগী), বাবা (সমীর কুমার নিয়োগী), দিদি (সোমালী রায়) এবং জীবনসঙ্গী (অভিষেক মুখার্জী)- ওদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি আমার যাবতীয় ঝুটঝামেলা সহ্য করার প্রায় 'অবিশ্বাস্য' ক্ষমতা ছাড়া এই কাজ শুরু বা শেষ কোনোটাই হতনা। আমার নিজের ওপর বিশ্বাসে তেমন জোর না থাকলেও আমার বাড়ির মানুষগুলি সবসময় আমার উপর এত বেশি বিশ্বাস দেখিয়েছেন যে আত্মবিশ্বাসের খামতি বেশ কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে, নতুবা গবেষণার কাজ কতটা এগোত সে অবিশ্বাস আমার এখনও পুরোদমে আছে।

সূচীপত্র

১. প্রস্তাব 6

২. প্রথম অধ্যায়: পটভূমি 27

৩. দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রসঙ্গ: ইউরোপ ভ্রমণ

৩.১ প্রেক্ষিত ও যাত্রাপথ 83

৩.২ গন্তব্যের পথে পথে 108

৪. তৃতীয় অধ্যায় প্রসঙ্গ: এশিয়া ভ্রমণ

৪.১ প্রেক্ষিত ও যাত্রাপথ 145

৪.২ গন্তব্যের পথে পথে 181

৫. চতুর্থ অধ্যায়: পর্যালোচনা 239

৬. পরিশেষে 285

৭. গ্রন্থপঞ্জি 294

প্রস্তাব

(১)

The reader of a good travel-book is entitled not only to an exterior voyage, to descriptions of scenary and so forth, but also to an interior, a sentimental or temperamental voyage, which takes place side by side with the outer one.

Norman Doughlas[1]

নতুন নতুন দেশ বা অঞ্চল, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, যাপনভঙ্গিমার সঙ্গে পরিচিতি লাভের চাবিকাঠি হিসেবে 'ভ্রমণ' চিরকালই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে ভ্রমণভিত্তিক এই পরিচয়ের প্রকৃতি ও প্রবণতা বা পারস্পরিক সাংস্কৃতিক লেনদেনের ভিত্তিভূমিকে নিছক পক্ষপাতহীন বা নৈর্ব্যক্তিক ভাবলে কিন্তু ভুল ভাবা হবে। বরং ভ্রমণ এবং সেইসুবাদে লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তের উপস্থাপনরীতি বহুমাত্রায় নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ভ্রমণকারীদের স্থান-কাল-প্রেক্ষাপট-লিঙ্গগত অবস্থানের সাপেক্ষে। অর্থাৎ, ভ্রমণ বা ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু 'ব্যক্তিক' তাগিদ বা অনুভবের একান্ত ব্যক্তিগত-বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যান নয়। তার সঙ্গে ওতপ্রোত

---

[1]উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে Paul Fussell-এর Abroad : British literary Travelling between the Wars থেকে (Oxford: Oxford University Press, 1980) পৃষ্ঠা- ২০৩.

থাকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা অনুষঙ্গ। তাই ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতার চরিত্রও নির্ণীত হয় গন্তব্যভূমি এবং সেখানকার মানুষ সম্পর্কে ভ্রমণকারীর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধারণা বা ধারণাহীনতার নিরিখে। অর্থাৎ বলা যায়, 'অপর'-কে (ভিন্ন দেশ-অঞ্চল, সেখানকার মানুষ, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিন্নতা) দেখা বা বোঝার প্রক্রিয়ায় অনিবার্য অভিঘাত ঘটে 'আত্ম'-এর (ভ্রমণকারীর নিজস্ব অবস্থান ও পরিপ্রেক্ষিতের)। আবার আত্ম-অপরের এই যোগাযোগ 'আত্ম' বিষয়ে পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনাকেও উস্কে দিতে পারে। ভ্রমণ হয়ে উঠতে পারে 'আত্ম' আর 'অপর' উভয়কে নির্মাণ তথা বিনির্মাণের এক যুগপৎ অভিব্যক্তি। তদোরভ যেমন বলেন,

> The I doesn't exist without a you. One cannot reach the bottom of oneself if one excludes others. The same holds true for knowledge of foreign countries and different cultures: the person who knows only his own home always run the risk of confusing culture with nature, of making custom the norm, and of forming generalizations based on a single example : oneself.[2]

তদোরভের কথা অনুসরণ করে বলা যায়, ভ্রমণের আপাত 'বহির্দশন' আদতে 'আত্মদর্শন' তথা আত্মমূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ পাঠের পথটিকে প্রশস্ত করতে চায়। চেনা চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, অন্যতর সমাজ-সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ এবং নিজেদের যাপনরীতির সঙ্গে সেই ভিন্নতার তুলনা-আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে দিয়েই সম্ভাবনা তৈরি হয় এক সম্যক 'আত্মবিশ্লেষণ'-এর। কিন্তু সেই 'আত্মবিশ্লেষণ' কি আদৌ নির্মোহ হয়ে উঠতে পারে? নাকি 'আত্ম'-এর উপর 'অপর'-এর ছায়াপাত কীভাবে বা কতটা ঘটবে, সেই বিষয়ে 'আত্ম'-এর সচেতন কোনো প্রতিরোধ

---

[2]Tzvetan Todorov, *The Morals Of History.* Alyson Waters (trans.) (Minneapololis: University of Minnesota Press, 1995), পৃষ্ঠা- ৬৬.

কাজ করবে কিনা তা নির্ধারিত হয় ‘অপর’-এর সঙ্গে তার ক্ষমতা-সম্পর্কের সমীকরণটির দ্বারা। ডেবি লিসলে যেমন মনে করেন, ভ্রমণকথনে ‘আত্ম’ আদতে ‘অপরকে’ নির্বাক-নিষ্ক্রিয় জড়সত্তা মাত্র বানিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে প্রকাশের কোনো সক্রিয়তা বা স্বধীনতা সেখানে থাকেনা- “...travelogues are usually fashioned over and against a series of others who are denied the power of representing themselves”[3]। আমরা বুঝতে পারি, তিনি আসলে ভ্রমণবৃত্তান্তের কথনশৈলীকে এক অসম ক্ষমতা বিন্যাসের আধার হিসেবে দেখছেন। প্রসঙ্গত লিসলের মতো অনেক ইউরোপীয় তাত্ত্বিকই ভ্রমণবৃত্তান্ত নামক সাহিত্যসংরূপটির বিবিধতা তথা বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একধরনের ক্ষমতা প্রকাশের প্রকল্পায়নের কথা বলছেন। বিশেষত পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক থেকে শুরু সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশ বিস্তারের পর্বে, ইউরোপ বহির্ভূত বিশ্বের উপর ইউরোপের নানা দেশের আগ্রাসনের সঙ্গে ভ্রমণের এক নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেছেন তাঁরা। তাঁদের মনে হয়েছে, উপনিবেশ সম্পর্কে উপনিবেশক দেশের ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত তথা প্রকাশিত বক্তব্য আদতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব কায়েমেরই এক সুচারু পন্থা হয়ে উঠেছে। উপনিবেশের অচেনা-অদেখা যাপন-এর উপর ‘অসভ্যতা’, ‘অনগ্রসরতা’-র তক্‌মা বসিয়ে আসলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি নিজেদের স্বনির্মিত ‘সভ্যতার’ সংজ্ঞাকে মান্যতা দিতে চেয়েছে। তাই যখনই ক্ষমতাসীন পক্ষের (এক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে ইউরোপের ধনী, উপনিবেশের অধিকারী কোনো দেশের প্রতিনিধি) তরফ থেকে ক্ষমতাহীনের (অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোনো দেশ বা উপনিবেশিত এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার নানা স্থান) দেশ-আচার-বিচার-সমাজ-সংস্কার-এর ‘পরিচয়’ ঘটেছে তখনই ক্ষমতার

---

[3]Debbie Lisle, “The Cosmopolitan gaze: rearticulations of modern subjectivity”, *The Global politics of Contemporary Travel writing* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006,), পৃষ্ঠা- ৬৯.

অসামঞ্জস্যতার অভিঘাতে নতুন দেখা দেশ বা মানুষরা ‘নির্মিত’ হয়েছে নেতিবাচক ব্যঞ্জনা নিয়ে; বিপরীত যুগ্মপদের মানদণ্ডে। কার্ল থম্পসনের ভাষায়,

> ...much travel writing entails the traveler achieving a symbolic or psychological mastery over the people and places they describe. Moreover, the travel writer's act of self-fashioning also often proceeds by a logic of differentiation' whereby the Other is constructed in some subtle or unsubtle way principally as foil or counterpoint to the supposedly heroic, civilized and/or cultured protagonist.[4]

অর্থাৎ সমতাহীন এক ক্ষমতাবন্টনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ‘আত্ম’-এর একেপেশে উচ্চকিত প্রকাশই ভ্রমণকারীদের বর্ণনাভিমুখের প্রধান সূচক হয়ে ওঠে। ‘অচেনা’ দেশ ও তাদের ‘অজ্ঞাত’ মানুষরা সেখানে চিহ্নিত হয় ‘শিক্ষিত’ ‘সুসভ্য’ ‘সাহসী’ ভ্রমণকারীর এক অধস্তন ও অভিব্যক্তিহীন ‘অপর’ পক্ষ হিসেবে। কিন্তু মুশকিল হল, ক্ষমতার সাপেক্ষে অনুধাবিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ভ্রমণ-তত্ত্বের সূত্র ধরে শুধু প্রভুত্বকামীর ক্ষমতার আস্ফালনের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। সেখানে ক্ষমতাশূন্যের কোনো উচ্চারণ আমরা শুনতে পাইনা। কিন্তু ক্ষমতাশালীবর্গ নির্দিষ্ট এই ‘অপর’ যখন ভ্রমণের ‘বিষয়’ থেকে ‘বিষয়ী’ হয়ে উঠে সক্রিয় ভ্রমণকারীর পদে উন্নীত হয়, তখন তো আত্ম-অপর-এর পরিচয়ের অদলবদল ঘটে যায়। এতক্ষণ যারা ‘অপর’ বলে পর্যুদস্ত হচ্ছিল তারা যখন ‘আত্ম’-এর ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তখন তারা তাদের ‘অপর’ পক্ষকে কোন্ মানদণ্ডে বিচার করে? তারা কি ক্ষমতাসীন মহলের অবদমন বা উন্নাসিকতাকেই আত্মস্থ করে নেয়? নাকি তাদের বৃত্তান্তগুলি ঔপনিবেশিক

[4] Carl Thompson, "Revealing the self", *Travel Writing* (London and New York: Routledge) 2011, পৃষ্ঠা- ১১৯.

পীড়নের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিরোধ আর স্বতন্ত্রীকরণের স্বকীয় পরিসর তৈরি করে 'ভ্রমণ'-এর কোনো প্রতিকথন তৈরি করতে চায়? ক্ষমতাহীন-এর 'আত্ম' বা 'অপর' উপস্থাপনের এই বিপরীতমুখী ছকটির পাঠগ্রহণই আমার গবেষণার মূল আবর্তন। এক্ষেত্রে আমার নির্বাচিত সময়কাল ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলা। পরাধীন ভারতে, বাঙালির বিদেশ যাত্রার (ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ) বৃত্তান্তগুলিকে আমি একটি উপনিবেশিত জাতির 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'-র প্রকল্পভূমি হিসেবে পড়তে চাইব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রাক-স্বাধীন পর্ব অবধি (অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি) বঙ্গীয় ভ্রমণকারীদের বিদেশ বেড়ানোর বৃত্তান্তগুলির উপস্থাপনের নানা ভিন্নতা, স্বরান্তরের সাপেক্ষে আমি উপনিবেশিতের 'আত্মদর্শন'-এর নানা জটিল বাঁকবদলের পাঠ নিতে চাইব।

(২)

বাঙালির বিদেশ বেড়ানো বিষয়ে বিশ্লেষণ শুরুর আগেই আমাদের আলোচনার সূচনাবিন্দু আর সীমানা দুটিকেই কিছুটা নির্দিষ্ট করে নেওয়া দরকার। স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার যে 'উপনিবেশিত পর্বে বাঙালির বিদেশ ভ্রমণ' বলতে আমরা ঠিক কোন্ সময় এবং কোন্ কথনগুলিকে ধরতে চাইছি। বস্তুত সপ্তদশ শতক থেকেই বাংলার বিভিন্ন অংশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি এবং বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি তৈরি হতে শুরু করে দিলেও খাতায়-কলমে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের শুরু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে। কিন্তু 'উপনিবেশিত' পর্ব বলতে এই আলোচনায় আমরা শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক আগ্রাসনের প্রারম্ভকেই সূচিত করতে চাই না বরং সবিশেষ জোর দিতে চাই শাসিতের উপর শাসকের মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব নির্মাণের রাজনীতিটির উপর। যে রাজনীতির

ডালপালা বিস্তার শুরু হয় যখন আইন-শাসন-অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের শিক্ষানীতির নিয়ন্ত্রণও চলে যায় ঔপনিবেশিকদের হাতে। এবং যার অনতিক্রম্য অভিঘাত গ্রহণ করে প্রধানত উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিন্দু/ব্রাহ্মেরা। জন্ম হয় ইংরেজি শিখতে তৎপর নব্য বাঙালিদের। এই আলোচনার মূল আবর্তনে আছেন যে ভ্রমণকারীরা তাঁরাও প্রায় প্রত্যেকেই এই শ্রেণিরই প্রতিভূ। তাই ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রকাশিত প্রথম বিলেত সফরের বৃত্তান্ত *বিলায়েত নামা (The Wonders Of Vilayet)* [5] যদিও প্রকাশ পাচ্ছে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে, ফার্সিতে। লিখছেন মির্জা শেখ ইতেসামুদ্দিন। রাজা তৃতীয় জর্জের দরবারে মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে বিলেত যাত্রার এবং সে দেশে তিন বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত কথনগুলির সময়কাল আরও বেশ কিছু বছর পেরিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হচ্ছে; মেকলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি যখন বাংলার মাটিতে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। এবং এই সময়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্তটি লেখাও হচ্ছে ইংরেজিতে। রমেশচন্দ্র দত্তের *Three Years in Eutope*[6], ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাত্রার (১৮৬৮-৭১ খ্রিস্টাব্দ) অভিজ্ঞতা নিয়ে।[7] কারণ সাল-তারিখের বিচারে ঔপনিবেশিক আমলের হলেও, "প্রাচীতে যাহা

---

[5]Mirza Sheikh I'tesamuddin, *The Wonders of Vilayet : Being the Memoir, Originally in Persian, of a Visit to France and Britain,* Kaiser Haq (Trans.) (Leeds : Peepul Tree Press, 2001).

[6]Romesh Chandra Dutt, *Three Years in Europe, 1868-1871* (*including an account of his second visit in 1886)*, (Calcutta: 1896).

রমেশচন্দ্রের প্রথমবারের বিদেশ যাত্রার বিষয়ে লেখা চিঠিগুলি বাংলাতেও প্রকাশিত হচ্ছে পরবর্তী কালে : *ইয়ুরোপে তিন বৎসর অর্থাৎ ইউরোপবাসিদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় ও নানাদেশ বর্ণনাবিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ,* (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯০)। এই গবেষণাপত্রে আমরা বাংলা বইটি থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

[7]যদিও এর বেশ কিছু বছর আগে থেকেই উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ যাত্রার ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্তের মতো আরও অনেকেই বিবিধ কর্মসূত্রে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু

কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ”[৪]- মননগত এই উপনিবেশায়নের সঙ্গে পরিচয় ইতেসামুদ্দিনের ছিলনা। তাঁর আমলে, ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্যবীক্ষা উৎকর্ষের চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়নি। আইন-আদালত বা পাণ্ডিত্যের ভাষা হিসেবে ফার্সির কদর তখনও অটুট ছিল। ফলত ইংরেজি ভাষা না জানার জন্যে ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ইতেসামুদ্দিনের নিজের আভিজাত্য বা শিক্ষা-রুচি-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়নি। এবং সর্বোপরি, বিজিত জাতিসুলভ কোনো সঙ্কোচ বা জড়তা নিয়েও তিনি বিলেত পাড়ি দেননি। বরং নিজের জাতিগত পরিচয় তথা ঐতিহ্য বিষয়ে যে তিনি রীতিমতো সচেতন ও সাবলীল ছিলেন সে কথার প্রভূত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বৃত্তান্তটিতেই। কিন্তু আগামী একশ বছরেই যে এই ছবি কীভাবে বেমালুম পাল্টে যেতে শুরু করেছিল তার সাক্ষী ইতিহাস। প্রশাসনিক রদ্‌বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার সামাজিক বিন্যাসেরও ভোলবদল হতে শুরু করেছিল। নবাবী আমলের সম্ভ্রান্তদের জায়গা দখল করে নিয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নবোত্থিত জমিদাররা। ইংরেজি শিক্ষা আর সেই দৌলতে পাওয়া সরকারী চাকরির উপর ভিত্তি করে জন্ম নিয়েছিল এক শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বদলেছিল শিক্ষা ও আভিজাত্যের পুরনো মানদণ্ডগুলি। এবং এসব বদলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বা বলা ভালো এসবের অনিবার্য পরিণাম হিসেবেই বদল হয়েছিল বাঙালির ভ্রমণ বিষয়ক ভাবনাচিন্তারও। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের জাতিগত উৎকর্ষকে আত্মস্থ করে নেওয়া রমেশচন্দ্রের প্রজন্মের কাছে স্বজাতি বা স্বদেশ সম্বন্ধে ইতেসামুদ্দিনের মতো জড়তাহীন বিশ্বাসের অবকাশ স্বভাবতই ছিল না। বরং বলা যায়, ইতেসামুদ্দিনের অনুভব-কাঠামো বা ভাবনা-বিশ্বাসের সঙ্গে

তাঁদের লেখা বিক্ষিপ্ত ডায়েরি বা কিছু চিঠি বাদ দিলে রমেশচন্দ্রের বইটিকেই প্রথম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

[৪]বঙ্গযুবাদের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের গভীরতা বিষয়ে উক্তিটি করছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* বইতে (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১০২) এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এই সমস্ত ভ্রমণকারীদের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত জীবনচর্যার মাঝে গড়ে উঠেছিল এক ভীষণ ব্যবধান। বস্তুত এই ব্যবধানকেই সীমন্তী সেন চিহ্নিত করেছেন 'pre-colonial' এবং 'colonial'- এই দুই ভিন্ন ভাবসঞ্জাত বিশ্ব হিসেবে। তাঁর ব্যাখ্যায়- "Here The term 'pre-colonial' is not indicative simply of temporal precedence; it is meant to refer to a different vision of world order, a different sense of historicity and most significantly a different sense of I and other."[9] আমাদের আলোচনার ঝোঁকও আদতে এই 'colonial' অধ্যায়ের ইংরেজি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণির লেখা বৃত্তান্তগুলির উপর থাকবে। বস্তুত 'pre-colonial' আর 'colonial' অধ্যায়ের ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে শুধু রুচি বা শিক্ষাগত তফাতই থাকে না, তফাৎ থাকে তাঁদের ধর্ম আর ভাষাতেও। নবাবী আমলের দরবারী আদবকায়দা বা শাসনের পরিবর্তে নতুন সাহেবী শাসনকে উচ্চবর্গীয় মুসলিম সামন্তরা স্বীকার করতে পারেননি- ক্ষমতা-গর্ব-আভিজাত্য সম্পর্কে বিস্মৃত হওয়া তাঁদের পক্ষে স্বভাবতই খুব সহজ হয়নি। তুলনায়, পূর্ববর্তী হিন্দু রাজকর্মচারীরা অনেক দ্রুত তা মেনে নিয়েছিল। বিশেষত দূরদর্শী সুযোগসন্ধানী হিন্দু বৃত্তিজীবীরা পলাশীর আগে থেকেই দালাল, মুন্সি, মুৎসুদ্দি হিসেবে কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত তৈরি করেছিল। অনেকেই পাড়ি জমিয়েছিল কলকাতায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ঔপনিবেশিক নানারকম নীতির মাধ্যমে মুসলমান সমাজের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ব্রিটিশদের হাতে ভারতের ভূমিব্যবস্থার দায়িত্ব যাওয়ার পর, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের নানা বিশৃঙ্খলায় প্রাচীন জমিদার বংশগুলি বিপন্ন হতে শুরু করেছিল। অতিরিক্ত করের বোঝায় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেই ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু অভিজাত মুসলিম পরিবার অবলুপ্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর, যে নতুন জমিদার

[9]Simonti Sen, "Of Another East and Another West", *Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910* (New Delhi: Oriental Longman Private Limited, 2005), পৃষ্ঠা- ২৮.

শ্রেণির জন্ম হতে শুরু করে বা জমি আর সরকারী চাকরিকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে থেকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়েও প্রাধান্য ছিল হিন্দু বাঙালিদেরই। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারীভাবে ইংরেজি ভাষার অগ্রাধিকার স্বীকৃতি পায়। বৈষয়িক গরজেই হিন্দু উচ্চবর্গীয়দের শিক্ষার ঝোঁক ফার্সি থেকে ক্রমশ ইংরেজিতে সরে যায়। তারা পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করে সরকার প্রদত্ত নানা সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে। অথচ অন্যদিকে মুসলিম সমাজের অধিকাংশই ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফৌজদারী বিচারে কাজীদের স্থান বাতিল হয় ও আদালতের কাজের ভাষা হিসেবে ফার্সির বদলে বাংলা চালু করা হলে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি অনেকটাই খর্ব হয়। ফলত আমরা যে 'colonial' অধ্যায়টির দিকে চোখ রাখব সেখানে লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির সিংহভাগই লেখা হয় মূলত ব্রিটিশ শাসনের সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু/ব্রাহ্ম উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা।

প্রসঙ্গত ব্রিটিশ শাসন পূর্ববর্তী সময়েও এদেশে ভ্রমণের ঐতিহ্য নেহাৎ কম ছিল না। স্বপন মজুমদার যেমন তাঁর "In Merchant's and Pilgrim's footsteps: The Indian corpus of Travel Writing"[10] প্রবন্ধটিতে ভারতীয় ঘরানায় মহাকাব্য থেকে শুরু করে সঙ্গম কবিতা থেকে ভক্তিসাহিত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য বর্গের মধ্যে ভ্রমণের বহুমুখী উপস্থাপনার দিকটি নিয়ে বিশদে আলোচনা করছেন। তবে ব্রিটিশ শাসন পূর্ববর্তী সময়ে হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে মূলত তীর্থযাত্রার ধারাটিই প্রচলিত ছিল। ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণির চিন্তা-চেতনার নানা পরিসরে দৃশ্যতই যে বদল আসতে শুরু করে ভ্রমণ বিষয়ক ভাবনাও তার যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। আমরা চোখ রাখব এই বদলের উপর অর্থাৎ নব্য বাঙালি মননে গড়ে ওঠা ভ্রমণের নতুন ডিসকোর্সটির উপর যেখানে পূর্ববর্তী দলবেঁধে

[10]Swapan Majumdar, "In Merchant's and Pilgrim's footsteps: The Indian corpus of Travel Writing", *Indian Travel Narratives*, Somdatta Mandal (Ed.) (Jaipur: Rawat Publications, 2010), পৃষ্ঠা- ২৬-৩৬.

তীর্থভ্রমণের ধারণা ভেঙে বা বলা যায় তীর্থযাত্রার সমান্তরালেই ভ্রমণের আরও একটি ধারা জন্ম নিতে থাকে। ভ্রমণের এই নতুন ঘরানায়, দেশ বেড়ানোর লক্ষ্য আর তীর্থস্থান বা দেবভূমি দর্শনের গোষ্ঠীগত পুণ্যার্জন ছিলনা বরং তা হয়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানসের শিক্ষিত-সচেতন পর্যবেক্ষণনির্ভর অভিব্যক্তি যা বৃদ্ধি করে মানুষের জ্ঞানের পরিধি, আবার একইসঙ্গে উদ্‌যাপন করে তাঁর অবকাশকে। যাতায়াত পরিকাঠামোর উন্নতি ভ্রমণের সুযোগ ও সুবিধাকেও বহুলাংশে সহজতর করে দিয়েছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু যেমন বিজয় রাম সেনের লেখা *তীর্থমঙ্গল*-এর ভূমিকা লিখতে বসে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন পূর্ববর্তী ভারত তথা বাংলার ভ্রমণের ধারণা তথা ধরনের প্রকৃতিগত নানা ভিন্নতাকে চিহ্নিত করে লেখেন-

> এখনকার ইংরেজি শিক্ষিত জন-সাধারণের বিশ্বাস যে, ইংরেজি ভ্রমণ-কাহিনী (Travels) পাঠ করিয়া তাহারই আদর্শে বাঙ্গালায় ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে তাঁহাদের এই বিশ্বাস অমূলক। অবশ্য এখনকার মত রেলে চড়িয়া ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত ভারত ঘুরিয়া আসিয়া লম্বাচৌড়া 'ভারত-ভ্রমণ' লেখা তখনকার লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল,- এখনকার মত তখনকার লোক স্বাস্থ্য-রক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন না, কিছুকাল পূর্ব্বেও এদেশে হাওয়া-খাওয়ার কথা উঠে নাই। তখনকার লোকে সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু বা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম আছে- সেই কাজে শরীর ও মনের উন্নতি বা স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইতেন।[11]

বস্তুত কোনোরকম 'ধর্ম্মোদ্দেশ্য' ছাড়াও যে দেশভ্রমণের পিছনে অন্য কোনো অভিপ্রায় বা নিছক নতুন দেশ দেখা-চেনার কৌতূহল থাকতে পারে সে বিষয়টির সঙ্গে যে প্রাক-ঔপনিবেশিক

[11]বিজয় রাম সেন, "ভূমিকা", *তীর্থমঙ্গল,* নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.) (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২)।

ভারতীয় তথা বাঙালি মনন বিশেষ পরিচিত ছিল না, সে দিকটির কথা তুলে ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পথের সঞ্চয়" প্রবন্ধটি শুরু করেন,

> আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন?' একথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই, তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হালকারকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফলের বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।
> প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি টিক্‌টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।[12]

"ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইতেন" থেকে "ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য" – উচ্চারণগত এই ভিন্নতাই বুঝিয়ে দেয় বদলায়মান সময় তথা সমাজে ভ্রমণ বিষয়ক সাধারণ মূলগত ভাবনাগুলি কীভাবে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল। প্রসঙ্গত পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক থেকে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের উপনিবেশ পত্তন প্রক্রিয়ার যে সূচনা পর্ব সেখানে এই 'ভ্রমণ' আর নিত্যনতুন দেশ 'আবিষ্কার' এক জরুরি ভূমিকা নিয়েছিল। সে সময় এক দিকে ইউরোপের মাটিতে চলছে 'আলোকদীপ্তি'-র উল্লাস, জাতীয় চেতনার উন্মেষ, আর ইউরোপ বহির্ভূত বিশ্বে গড়ে উঠছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আর আধিপত্য বিস্তার। বস্তুত এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাধারা প্রসূত 'প্রগতি'

[12]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পথের সঞ্চয়", *রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮), পৃষ্ঠা-৬২৭-৬২৮।

আর ‘বৈজ্ঞানিকতা’-র ধারণাকে কেন্দ্র করে ইউরোপ নিজের যে ‘উজ্জ্বল’ ভাবমূর্তি বানিয়েছিল তাকে ‘বিশ্বজনীন’ এক মতবাদে পরিণত করার উপায়ই ছিল ‘ভ্রমণ’। ভারত তথা বাংলায় ব্রিটিশ শাসন তথা শিক্ষাব্যাবস্থার অভিঘাতে যে নতুন শিক্ষিত শ্রেণিটি গড়ে উঠেছিল, যাঁদের চিন্তাদর্শ ইউরোপীয় মানদণ্ডের ‘সভ্যতা’ ও ‘প্রগতি’-র বিভিন্ন লক্ষণের প্রায় অনতিক্রম্য প্রভাবাচ্ছন্ন ছিল তাঁরাও খুব স্বাভাবিকভাবেই ‘ভ্রমণ’-কে সভ্য জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিলেন। ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের দেশ-বিদেশ অভিযানের বৃত্তান্ত বা দেশে দেশে উপনিবেশ কায়েমের কাহিনী তাঁদের বেশিরভাগের কাছেই প্রতিভাত হয়েছিল জাতিগত যোগ্যতা প্রমাণের মাপকাঠি হিসেবে। এবং পরাধীন জাতি তার বর্তমান দুর্দশা ঘোচাতে যে সমস্ত নিদান অবলম্বন করতে চায়, ভ্রমণ হয়ে ওঠে তার অন্যতম। এই ভ্রমণ পরমার্থের সন্ধানে তীর্থযাত্রা নয় বরং ইহজাগতিক নানা অপর্যাপ্ততা আর দুর্বলতা অতিক্রমণের অন্যতম আলম্ব হয়ে ওঠে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত শঙ্করলালকে একটি চিঠিতে স্বামীজী যেমন লিখেছিলেন- “সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশ যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।”[13] বস্তুত তৎকালীন হিন্দু সমাজে, ভ্রমণ বিশেষত সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ যে ভারতীয় তথা বাঙালিদের জাতিগত পশ্চাদপসরণের অন্যতম কারণ, ফলত পরাধীন জাতির আত্মসংশোধনে অবস্থানগত এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা যে একান্ত জরুরি সে বিষয়ে কমবেশি সকলেই নিশ্চিত থাকেন। এবং সমুদ্রযাত্রার ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিষয়টি রীতিমতো সামাজিক বিতর্কের স্তরে উন্নীত হয়।

---

[13] *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড*,, ৫৮নং পত্র, বোম্বাই, ২০শে সেপ্টেম্বর (কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৯৬২), পৃষ্ঠা- ৩৪২।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার অতিআবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে বলেন-

আপনারা আজ একবার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, সমুদ্র যাত্রার প্রথা সংসারে না থাকিলে মানবজাতিকে কি ঘোর অজ্ঞানতার ও অবনতির অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। যে আমেরিকা আজ মস্তকোত্তোলন করিয়া সৌভাগ্য ও সম্পদ সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং যে আমেরিকা ভূমণ্ডলের অর্দ্ধখণ্ডস্বরূপ সেই আমেরিকা,- সমুদ্র যাত্রার প্রথা না থাকিলে কি অবস্থায় কাল যাপন করিত? যে আফ্রিকা কিছুকাল পূর্ব্বে বহুবিধ বর্ব্বরতার আবাস-ক্ষেত্র ছিল, জিজ্ঞাসা করি, সমুদ্র যাত্রা না থাকিলে লিভিংষ্টোনের মত মহামান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া আফ্রিকাকে শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে অগ্রসর করাইতে সমর্থ হইতেন কি না? আর যে ইংরাজ জাতির সমাগমে ভারতে নূতন আলোক ও নূতন জীবনের সঞ্চার হইতেছে, এবং বহুবিধ কুরীতি ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের সমক্ষে উন্নতির বিবিধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করি সমুদ্র যাত্রা না থাকিলে ইংরাজ জাতি ভারতের কূলে পদার্পণ করিয়া এই সকল মঙ্গলের সুচনা করিতে পারিতেন কি না? সমুদ্রযাত্রার দ্বারা যদি বাণিজ্যের উন্নতি হয়, সভ্যতার বিস্তার হয়, রাজনৈতিক মঙ্গল সাধিত হয়, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ সংসাধিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মত জাতির পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা বিশেষ প্রয়োজনীয় কি না? আর পূর্ব্বপুরুষের সৎকীর্ত্তি রক্ষা করা যদি সৎপুত্রের কর্ম্ম হয় এবং আমাদিগের যদি সৎপুত্র হইবার কামনা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা আছে কি না? এবং অবশেষে আমি আপনাদিগকে হিন্দুজাতির ভাবী উন্নতি ও ভাবী মঙ্গলের নামে এবং মানবপ্রকৃতির চিরোন্নতিশালীনতার নামে জিজ্ঞাসা করি যে, এই অবর্ণনীয় দুর্গতির ও অধোগতির অবস্থায় হিন্দুজাতির পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা একান্ত বাঞ্ছনীয় কি না?[14]

[14]দেবেন্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায়, *হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রার ইতিহাস* (কলিকাতা: বাল্মীকি যন্ত্র, ১২৯৯), পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।

আমরা বুঝতে পারি ইংল্যান্ড তথা ইউরোপকে সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে আত্মস্থ করে নেওয়া মননে কীভাবে সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে দেশে দেশে ক্ষমতা বিস্তারই জাতির শক্তিসামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এবং ইউরোপীয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জাহাজ ও বন্দর নির্মাণ, সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জন এবং সর্বোপরি জলপথে বাণিজ্য প্রভৃতি দক্ষতাগুলি রপ্ত করতে পারলে তবেই যে হিন্দুরা অন্যান্য সভ্য জাতিদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা তথা বলিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে বিষয়েও তিনি দ্বিধামুক্ত থাকেন-

> অবশেষে আমি এক প্রস্তাব করি যে, যদি বিশ বা ত্রিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দেশের জমিদার ও ধনাঢ্য-মহোদয়গণ সমবেত হইয়া সেই টাকা সংগৃহীত করিয়া এক ফাণ্ড সংস্থাপিত করুন, এবং সেই ফাণ্ড হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও জাহাজ চালান কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর দুই জন করিয়া এদেশীয় যুবক ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে পাঠাইয়া দিন, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া এদেশে আসিয়া ডক স্থাপন করুন,- জাহাজ নির্ম্মাণ করুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল উপাধিধারী সংসারে অন্নসংস্থানের কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদিগের কাহাকেও নাবিক এবং কাহাকেও জাহাজের অপরাপর কর্ম্মচারীগণরূপে নিযুক্ত করিয়া হিন্দু আপনাদিগের অর্ণবপোত আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে যাত্রা করুন। যখন দেখিব ইংরাজ জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতির অর্ণবপোতের সঙ্গে হিন্দু অর্ণবপোতের পতাকামালা সাগরের তরঙ্গ-কল্লোলিত বিশাল বক্ষে পত পত শব্দে উড়িতেছে এবং যখন দেখিব হিন্দুবণিকেরা পৃথিবীর নানা দেশে গমন করিয়া আপনাদিগের পণ্য বিক্রয় দ্বারা নানা দেশ হইতে নানা ধন রত্ন আনিয়া আমাদিগের জাতীয় বৈভবের বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছেন, তখন জানিব হিন্দুর পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি এই প্রস্তাব সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলনকারীদিগকে বিশেষরূপে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।[15]

আমাদের আলোচনায় আমরা চোখ রাখতে চাইব উপনিবেশিত পর্ব থেকে শুরু হওয়া ভ্রমণের এই নতুন ধারাটির বিস্তারের উপর যেখানে ভ্রমণকে ঘিরে নিছক আধ্যাত্মিক পুণ্যার্জনের মোহ

---

[15] দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৯।

রচিত হয়না বরং দানা বাঁধতে থাকে জাগতিক নানা উৎপীড়ন। এবং ভ্রমণের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার প্রবণতাও। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের যে সময় থেকে ভ্রমণের এই নতুন সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে প্রায় সেই একই সময়ে বিকশিত হতে শুরু করছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের দুনিয়াও। নতুন নতুন সংবাদপত্র আর সাময়িকপত্রের পাতা ভরাতে গদ্য রচনার চাহিদাও উর্দ্ধমুখী হয়েছে। এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতিলাভের অনিবার্য অভিঘাতে এই দেশেও প্রবন্ধ, উপন্যাস, আত্মজীবনী ইত্যাদি গদ্যনির্ভর নানা সাহিত্যসংরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ভাস্কর মুখোপাধ্যায় যেমন এদেশে আধুনিক কায়দার ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা সূচনার মূল কারণ হিসেবে সূচিত করছেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে উপন্যাস, জীবনী, আত্মজীবনী প্রভৃতি আত্ম-উন্মোচক বর্গের বিকাশের ইতিহাসটিকে- "...travel per se was not the cause of the rise of the travelogue as a genre in Bengali. What was instrument in its rise was the instrument was the development of vernacular prose and the for basic genres that help express the modern self : novel, biography, auto biography and diary."[16] এবং ভ্রমণকে সভ্য জীবনের অন্যতম অভিব্যক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া বাঙালির আধুনিকতার প্রকল্পের সঙ্গে ভ্রমণ বিষয়ক কথনের এক ওতপ্রোত অবস্থানের কথা উল্লেখে করছেন তিনি। তাঁর ব্যাখ্যায়, "The inception of traveloge in Bengali was part and parcel of the project of fashioning a "modern" self."[17] আমাদের আলোচনাও এই "modern self"-দের কেন্দ্র করেই যাঁরা একদিকে ঔপনিবেশিক পাঠক্রমে অভ্যস্ত হওয়ার সুবাদে পাশ্চাত্য

---

[16]Bhaskar Mukhopadhyay, "Rethinking Colonial Genres : The case of the Bengali Travelogue", *Literary Studies in India: Genology* (Kolkata: Jadavpur University, Comparative Literature, July 2004), পৃষ্ঠা- ৮৪।

[17]প্রাগুক্ত।

সভ্যতাসংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন আবার একইসঙ্গে তৎপর হয়েছিলেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিরোধে, হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এদেশের জাতীয়তাবাদী নানা চিন্তার উদ্যোক্তা। ভ্রমণ মারফৎ অপর জাতি-সংস্কৃতিকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে আমরা বুঝতে চাইব দেশজ সংস্কার আর নতুন পরিচিত সংস্কৃতির মাঝে বারেবারে বিভ্রান্ত হতে থাকা এই শ্রেণির আত্মদর্শনকে। বিশ্লেষণ করতে চাইব 'উপনিবেশ' আর 'বাঙালি' এই দুই শব্দের 'ঐতিহাসিক' সম্বন্ধসূত্রতা এবং সেই সম্পর্কের ক্রমবদলের জটিলতাকে।

একদিকে দেখতে চাইব, বাঙালি যখন পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হয়ে তার ঔপনিবেশিক প্রভু 'ইংল্যান্ড' তথা ইউরোপকে দেখতে যায় তখন পদানতের হীনম্মন্যতা, উপনিবেশক-উপনিবেশিতের অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক তার দৃষ্টিপথকে কীভাবে অভিভূত করে? আবার ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ কালপর্বে, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধও তো চিরকাল এক খাতে বাহিত হয় না। ঔপনিবেশিক পীড়ন যত প্রকট হয়, স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল হতে শুরু করে, তখন শাসককে দেখার ধরন বা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের প্রণালীতে কীভাবে বদল আসে?

অন্যদিকে দেখতে চাইব, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বেড়ানোর সময়, যাদের সঙ্গে বিসম ক্ষমতাসম্বন্ধের আড়ষ্টতা নেই, বরং প্রতিবেশিতার স্বস্তি আছে, পারস্পরিক ঐক্যস্থাপনের উদ্যোগ আছে অথবা অনেক সময়েই দেশগুলিকে 'সুপ্রাচীন' ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার ঋণবাহী ভেবে একধরনের 'উন্মার্গগামিতা' আছে, সেখানে ভ্রমণকারীদের 'বহির্দশন' এবং সেইসুবাদে গড়ে ওঠা 'আত্মদর্শন' কোন্ পথে চালিত হয়?

দুই ভিন্ন গন্তব্যমুখী বৃত্তান্তগুলিতে ব্যবহৃত থিম বা কথনবস্তুর প্রকৃতি, সংরূপগত দিক্‌বদল এবং ঔপনিবেশিক সময়পর্বকে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াগুলির একটি তুলনামূলক পাঠগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বুঝতে চাইব, দেশ বেড়ানোর কথনগুলি কীভাবে আদতে উপনিবেশাশ্রিত একটি জাতির

'আত্মপ্রতিষ্ঠা' তথা 'আত্ম-অনুসন্ধান'-এর, তাদের মনন-চেতনের নিরন্তর চাপানোতরকে প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে?

এই আলোচনা তথা বিশ্লেষণকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব মূলত চারটি পর্যায়ে – পটভূমি, প্রসঙ্গ : ইউরোপ ভ্রমণ, প্রসঙ্গ : এশিয়া ভ্রমণ, পর্যালোচনা।

যেহেতু আমরা ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিকে পড়তে চাইছি উপনিবেশিত সমাজের বহুস্তরীয় চিন্তাস্রোতের গুরুত্বপুর্ণ দলিল হিসেবে, তাই ঔপনিবেশিক পর্বের নানা চারিত্রিক লক্ষণ এবং সেই বিশেষ সময়ে জন্ম নেওয়া উচ্চবর্গের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু/ব্রাহ্ম শ্রেণির উত্থানের ইতিহাসটিকে বিস্তারিতভাবে বলা ও বোঝা অত্যন্ত জরুরি বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ, আমাদের নির্বাচিত বৃত্তান্তগুলির রচয়িতারা এই বিশেষ সময় ও শ্রেণির প্রতিভূ। এবং ইউরোপ বা এশিয়ার নানা দেশকে দেখার ধরনও তাঁদের অবস্থান দ্বারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই তৎকালীন নানা ধারণা তথা মনোবৃত্তির, ভারতের আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের বাস্তবতা-জটিলতা প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে আমাদের চোখ রাখতে হবে 'উপনিবেশবাদ' সংক্রান্ত নানা তথ্য এবং তত্ত্বের উপর। ফলত আমরা প্রথমেই "পটভূমি" অংশে বুঝতে চাইব প্রাক-ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক পর্বের বাংলার আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক-শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তন এবং সেই ক্রম পরিবর্তিত সময় থেকে উদ্ভূত আমাদের আলোচ্য শ্রেণিটির চিন্তা-চেতনার নানা প্রকৃতিকে। এবং সেই সূত্রেই আমরা চোখ রাখব, প্রাক-উপনিবেশ থেকে উপনিবেশের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থার বদলায়মান পরিস্থিতির উপর। কারণ এই ইতিহাস তথা প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে 'নব্য' বাঙালির উত্থান ও তাদের নব্যতার প্রকৃতি বা মনন-চেতনের কাঠামো কিছুই চেনা যাবে না। বোঝা যাবে না তাদের বোধ-বুদ্ধিতে গড়ে ওঠা 'ভ্রমণ'-এর নতুন ডিসকোর্সটিকেও। এই পর্যায়ের আলোচনাকে আমরা বিস্তারিত করব মূলত তিনটি পর্বে –

ক) রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রূপবদল

খ) মেকলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি ও তার প্রভাবে জন্ম নেওয়া এলিট শ্রেণি এবং শাসক বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য

গ) ঔপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে এলিট শ্রেণির ক্রম পরিচয় ও আত্মপ্রতিরোধের নানা বিক্ষিপ্ত প্রয়াস

"পটভূমি" পর্বের আলোচনার সূত্র ধরেই আমরা প্রবেশ করব যথাক্রমে ইউরোপ ও এশিয়া বৃত্তান্তের পর্বগুলিতে। প্রসঙ্গত বাঙালি যাত্রীদের মধ্যে ইউরোপ ভ্রমণের ধারা পাকাপোক্তভাবে শুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। এবং আগেই উল্লেখ করেছি রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন প্রমুখের কথা বিক্ষিপ্তভাবে বললেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব মূলত রমেশচন্দ্রের কথনটি দিয়ে। একদিকে যেমন আমরা ইউরোপ যাত্রাকে ঘিরে ঔপনিবেশিক বাঙালির আবেগ-অনুভবের সার্বিক কাঠামোটির উপর চোখ রাখব। তেমনই আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু হওয়া কথনগুলির সঙ্গে বিশ শতকে স্বাধীনতার নিকটবর্তী সময়ে রচিত কথনগুলির দৃষ্টিভঙ্গীগত ফারাকগুলিও বোঝার চেষ্টা করব।

এশিয়া ভ্রমণের ধারা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে প্রধানত বিশ শতকের শুরু থেকে এবং এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা শুরু হবে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের চিন যাত্রার কথনটি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার যে আমাদের এশিয়া বিষয়ক আলোচনাটি সীমিত থাকবে মূলত কিছু বিশেষ দেশের উপর– চিন, জাপান, বর্মা বা অধুনা মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ শতকে সামাজিক-মানবিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবমাননার অসংখ্য ঘটনার সূত্র ধরে বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত (আমাদের আলোচ্য শ্রেণি) শ্রেণির মনে ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে জমতে থাকা হতাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যখন জাতীয়তাবাদী বোধ ক্রমশই মাথা চাড়া দিতে থাকে তখন এই প্রতিবেশী দেশগুলি বিষয়ে এক বিশেষ উৎসাহ

জাগতে শুরু করে। পৃথিবীর মানচিত্রে উদীয়মান শক্তি হিসেবে জাপানের উত্থান ভারতীয় মননেও এক গভীর আশা-উদ্দীপনার জন্ম দেয়। শিক্ষা-সভ্যতার নানা পরিসরে জাপান হয়ে উঠতে থাকে ইউরোপের সম্ভাব্য বিকল্প। আবার জাপান সহ চীন, সুমাত্রা, জাভা, বর্মা ইত্যাদি দেশের উপর ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-দর্শনের অভিঘাত নিয়ে বৌদ্ধিক মহলে চর্চার সুবাদে গড়ে উঠতে থাকে এক বৃহত্তর এশিয়ার বোধ। উপনিবেশিত জাতির এই বিশেষ মনোভাবগুলিকে মাথায় রেখেই আমরা এশিয়ার নানা দেশ বেড়ানোর কথনগুলির পাঠ করতে চাইব। দেখতে চাইব উপনিবেশিত জাতির আত্মনির্মাণ তথা অনুসন্ধানের তাগিদ কেমনভাবে এই বৃত্তান্তগুলির এক বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠছে। পরাধীন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকল্প ও প্রয়াসের এই পাঠে রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাত্রাকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারব না- ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এই সফর যা নিছক পারস্য ভ্রমণ নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা জটিলতা অনুধাবনের, তৎকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতি বিচারের এক অতি জরুরি ভাষ্য হয়ে ওঠে। তাই আমাদের উল্লিখিত দেশগুলি বিষয়ে রচিত লেখাগুলির পাশাপাশি নানা অনুষঙ্গে-প্রসঙ্গে আমরা “পারস্যে”[18]-র উপরেও চোখ রাখব।

আলোচনার সুবিধার্থে, ইউরোপ ও এশিয়া দুই পর্বের কথনগুলিকেই আমরা আলোচনা করব দুটি ধাপে। “প্রেক্ষিত ও যাত্রাপথ” এবং “গন্তব্যের পথে পথে”। অর্থাৎ প্রথমে চোখ রাখব, ভ্রমণের প্রেক্ষিত, প্রস্তুতি আর যাত্রাপথের উপর। আর পরের ধাপে বুঝতে চাইব চূড়ান্ত গন্তব্যে পা রাখার পরে, ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতা ও অনুভবের নানা মাত্রাকে- যাত্রাপূর্ব প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তব পর্যবেক্ষণের টানাপোড়েনকে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, আমরা যেহেতু একটি দীর্ঘ সময়পর্বকে আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি তাই সাল-তারিখের ক্রমানুসারে সকল ভ্রমণকারীদের ব্যক্তিগত পরিচয়

---

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *“পারস্যে”*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ, *১৩৯৬*)।

বা তাঁদের বৃত্তান্তগুলি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। বরং ভ্রমণকথনগুলির সামগ্রিক পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন যুগ-অনুভূতির নানা লক্ষণগুলিকে পড়তে চাই। তাই ভিন্ন ভিন্ন কথনগুলিকে পাশাপাশি রেখে সেগুলির বক্তব্যের একটি সার্বিক তুলনামূলক পাঠ নিতে চাইব। বুঝতে চাইব কীভাবে ভিন্ন গন্তব্য, ভ্রমণের অভিপ্রায়, সময়ের ফারাক, লিঙ্গগত প্রভেদ প্রভৃতি বিষয়গুলি কথনগুলির চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। এই বিষয়ে ব্যতিক্রম অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নানা সময়ে নানা দেশ দেখার অগাধ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের এই আলোচনায় বারেবারে বিস্তৃত আকারে উঠে এসেছে এবং পৃথক পরিসরের দাবি করেছে। ইউরোপ ভ্রমণের পর্বে যেমন আমরা তাঁর ১৭ বছর বয়সে প্রথম বিদেশ যাত্রার অনুভূতির সঙ্গে পরবর্তীকালে বিশেষত নোবেল জয়ের পরের পর্বে যখন তিনি বিশ্ববন্দিত সেইসময়ের ইউরোপ ভ্রমণ এবং সেই ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কথা বলেছি। তেমনই তাঁর প্রথম যাত্রাকালে করা নানা 'অনভিজ্ঞ' মন্তব্য বিষয়ে তাঁর পরবর্তী 'আত্মসমালোচনা'-র কথাও বিশদে তুলে ধরেছি । শুধু তাই নয়, পুত্র রথীন্দ্রনাথের লেখার সূত্র ধরেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ইউরোপের মাটিতে জন্ম নেওয়া উদ্দীপনার কথা আলোচনা করেছি। একইভাবে এশিয়া ভ্রমণের পর্বেও আমরা রবীন্দ্রনাথের চীন, জাপান এবং জাভা বিষয়ে নানাবিধ উৎকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ যা প্রায়শই সমসাময়িক অন্যান্য যাত্রীদের থেকে বহুলাংশে আলাদা সেই বিষয়টিকে বিস্তারিত করেছি । জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা বা জাভার বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণকালে তৎকালীন "বৃহত্তর ভারত"-এর বোধের অভিঘাত বিষয়ে তাঁর ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে প্রয়োজনে চোখ রেখেছি তাঁর পারস্য ভ্রমণের নানাবিধ পর্যবেক্ষণের উপরেও।

'পর্যালোচনা' অংশে আমরা ইউরোপ ও এশিয়া এই দুই ভিন্ন গন্তব্যমুখী ভ্রমণের সুবাদে লেখা বৃত্তান্তগুলির একটি পারস্পরিক তুলনা এবং সার্বিক বিশ্লেষণ করব। আমরা বুঝতে চাইব

ইংরেজি শিক্ষিত 'আধুনিক' মননে ভ্রমণ বিশেষত শাস্ত্রীয় বিধি অমান্য করে সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশ ভ্রমণ ঠিক কেমন দ্যোতনা বহন করে। বিদেশী জাতি-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পরাধীন জাতির মননকে কীভাবে আলোড়িত করে। বস্তুত আমাদের আলোচনার পরিসরে এমন এক সময়কাল রয়েছে যা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুই-এর নিরিখেই এক অতীব ঘটনাবহুল অধ্যায়। এবং সেই সকল ঘটনার অনিবার্য ছায়াপাত পড়েছে আমাদের কথনগুলির উপরেও। তাই আমরা দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নিরিখে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির বিবিধ প্রবণতা এবং বক্তব্যগুলির তুলনামূলক পাঠ নেব। বুঝতে চাইব গন্তব্যের বদলে কীভাবে ভ্রমণকারীদের দৃষ্টিকোণ এবং উপস্থাপনায় বদল আসছে। সেইসঙ্গে দেখব একই গন্তব্য বিষয়েও ভ্রমণকারীদের মনোভাবের ভিন্নতাগুলিকে। এবং সর্বোপরি বুঝতে চাইব ভ্রমণকথনগুলি কতটা এবং কীভাবে শাসিতের অবস্থানগত নানা অস্থিরতার, তাঁদের মনন-চেতনের দোলায়মানতার প্রতিফলক হয়ে উঠেছে।

প্রথম অধ্যায়:

পটভূমি

(১)

> সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।...ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে- তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব...এতবড় প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।[19]
>
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপনিবেশ তথা উপনিবেশায়ন। ভারত বা বলা যায় সারা পৃথিবীর ইতিহাসের সাপেক্ষেই এমন এক বিষম 'বাস্তব', যাকে আমাদের এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কাকে বলে উপনিবেশ? এককথায়, উপনিবেশ হল অধিকৃত জমি ও সম্পদ। আর দখলকৃত এই ভূখণ্ডের সম্পত্তি ও জনগোষ্ঠীর উপর সর্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়াই হল উপনিবেশায়ন। তবে এক গোষ্ঠী বা তাদের ভূমির উপর অপর গোষ্ঠীর শাসন বিস্তার বা সম্পদ লুণ্ঠনের ধারা তো ইতিহাসের এক পুরনো অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত ইংরেজিতে 'কলোনি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সন্ধান করলেই এর প্রাচীনতার পরিচয় মেলে। শব্দটি আসছে 'কলোনিয়া' থেকে। 'কলোনিয়া' অর্থাৎ প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য অধিকৃত এবং শাসিত বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে রোমানরা গিয়ে বসতি স্থাপন করত। কিন্তু পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতকে, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে দ্রুত ধাবমান পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান আর উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রির

---

[19]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "লড়াইয়ের মূল", রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৭), পৃষ্ঠা-৫৫৪-৫৫৫।

বিশাল বাজার তৈরির স্বার্থে এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে যেভাবে নিজেদের দখলে আনছিল, তার প্রকৃতি বা প্রবলতা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। এই নতুন ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া শুধু অধিকৃত দেশের ধন-সম্পদের দখলদারিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উপনিবেশক আর উপনিবেশিতের মাঝে এক জটিল ক্ষমতাসম্বন্ধ তৈরি করেছিল। পূর্ববর্তী ধারায়, অনেক সময়েই সাম্রাজ্যবাদীরা অধিগৃহীত অঞ্চলে এসে বসবাস করে সেখানকার মানুষজন ও তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে যেত। কিন্তু উপনিবেশ বিস্তারের এই নতুন পর্বে 'কেন্দ্র' অর্থাৎ ঔপনিবেশিক দেশ বা শক্তির সঙ্গে উপনিবেশের এক সচেতন বিভাজন এবং বিসমতা তৈরি করা হয়। উপনিবেশিত দেশের উপর আরোপিত আইন-শাসনের প্রাত্যহিক নিয়মনীতিগুলির মূল উদ্দেশ্যই ছিল কেন্দ্র আর উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যের 'তফাৎ'-কে নিশ্চিত করা।

উপনিবেশ থেকে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ লুণ্ঠনের পদ্ধতিকেও এক নতুন মাত্রা দিয়ে শোষণের পথকে অনেক বেশি প্রকট ও প্রকাণ্ড করে তোলা হয়। একদিকে উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল ও মানুষ (ক্রীতদাস ও শ্রমিক হিসেবে) পাচার হয়েছিল আর অন্যদিকে উপনিবেশ পরিণত হয়েছিল কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্যের বাজারে। অর্থাৎ আদানপ্রদান যাই হোক না কেন, মুনাফার ভাগীদার হচ্ছিল সবসময়েই কেন্দ্র। ছলে-বলে-কৌশলে ভূমি ও জনগোষ্ঠীর উপর দখলদারিত্ব, সম্পদ আত্মসাতের বিবিধ বন্দোবস্ত, কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যবস্থা অনুসারে ও অনুপাতে উপনিবেশের উৎপাদনপ্রক্রিয়ার পরিচালন ও সংযমন, খাজনা বা লভ্যাংশ আকারে সম্পদ আরোহণ ও কেন্দ্রে পাচার- ঔপনিবেশিক শক্তির এই সর্বগ্রাসী কর্মকাণ্ডের জেরে উপনিবেশগুলির সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোই বিধ্বস্ত হতে শুরু করে। বিপর্যস্ত করা হয় সেখানকার সামাজিক-প্রশাসনিক বিন্যাস। আর এই একচেটিয়া প্রভুত্ব আর মুনাফা ক্রমশ বিকশিত ও বিস্তৃত করতে থাকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লবকে। উপনিবেশবাদের বিশিষ্ট

তাত্ত্বিক আনিয়া লুম্বা যেমন মনে করেন, উপনিবেশায়নের এই নতুন পর্বই আদতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্পবিপ্লব আর পুঁজিবাদী বিকাশের ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেছিল–

> The essential point is that although European colonialism involves variety of techniques and patterns of domination, penetrating deep into some societies and involving a comparatively superficial contact with others, all of them produced the economic imbalance that was necessary for the growth of European capitalism and industry. Thus we could say that colonialism was the midwife that assisted at the birth of European capitalism, or without colonial expansion the transition to capitalism could not have taken place in Europe.[20]

প্রসঙ্গত লেনিন পুঁজিবাদ নামক এই বিশেষ উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থারই চরম প্রকাশ হিসেবে দেখেছিলেন আধুনিক বিশ্বের 'সাম্রাজ্যবাদ'-কে। তাঁর বহুচর্চিত *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*[21] বইটিতে তিনি ব্যাখ্যা করছেন কীভাবে উদ্বৃত্ত পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে ইউরোপের দেশগুলি তাদের পুঁজিপতিদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ষোড়শ শতক থেকে। সেই অর্থে, উপনিবেশবাদকে সাম্রাজ্যবাদিতার একটি বিশেষ রূপ হিসেবেও ভাবা যেতে পারে যেখানে প্রায় সারা বিশ্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় ইউরোপের পুঁজিবাদী/সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে। আর পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থার ধারাবাহিক চরিত্রবদলের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশের শাসন-

---

[20]Ania Loomba, "Situating Colonial and Post colonial studies", *Colonialism/ Post colonialism: The new critical idiom*, (London and New York: Routledge, 2005), পৃষ্ঠা- ৪.

[21]Vladimir llich Lenin, *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*, (Resistance Books, 1999).

শোষণের নীতিতেও বদল আসতে থাকে। এবং বলাবাহুল্য, বণিক-পুঁজি, শিল্প-পুঁজি, আর্থিক-পুঁজি- বিবর্তনের সকল ধাপেই সাম্রাজ্যবাদী বা উপনিবেশিক দেশের সমৃদ্ধির ব্যাস্তানুপাতে চলতে থাকে উপনিবেশের পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্যবৃদ্ধি।

কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকায় উপনিবেশায়নের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক অবদমন, প্রশাসনিক বৈষম্য, রাজনৈতিক আগ্রাসনেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব কায়েমের এক সুতীব্র অধ্যায়। প্রসঙ্গত ইউরোপ বহির্ভূত পৃথিবীতে, ইউরোপ যখন একের পর এক উপনিবেশ বিস্তার করছে তখন সেই একইসময়ে ইউরোপের মাটিতে চলছে আলোকদীপ্তির উল্লাস, ঘটছে জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ। উপনিবেশ পত্তনপ্রক্রিয়া একদিকে যেমন ইউরোপীয় দেশগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি, পুঁজিবৃদ্ধিকে বহতা দিচ্ছিল তেমনই ‘এনলাইটেনমেন্ট’-এর চিন্তাধারা প্রসূত ‘প্রগতি’ আর ‘বৈজ্ঞানিকতা’-র ধারণা বা জাতীয়য়াবাদ প্রসূত জাত্যভিমানের উপর ভর করে নিজেদের যে ‘উজ্জ্বল’ ভাবমূর্তি তারা বানিয়েছিল তাকেও এক ‘বিশ্বজনীন’ মতবাদে উন্নীত করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলির কাছে উপনিবেশের মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-সংস্কৃতি সবই ছিল ‘অপরিচিত’, ‘নতুন’। আর এই না-দেখা, না-চেনা উপনিবেশগুলি তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল ইউরোপনির্দিষ্ট ‘প্রগতি’, ‘সভ্যতা’-র সম্পূর্ণ বিপরীতপক্ষ। এবং তাদের নিজনির্মিত’ ‘শ্রেষ্ঠত্ব’-র বোধ সম্পূর্ণতা পেতে শুরু করেছিল সভ্যতার স্তরক্রমের সিঁড়ি বেয়ে। উপনিবেশক হয়ে উঠেছিল ‘সভ্য’ ও ‘শ্রেষ্ঠ’ যখন তার বৈপরীত্য আবিষ্কৃত হয়েছিল উপনিবেশিতের ‘অসভ্যতা’ আর ‘আদিমতা’-য়। ঔপনিবেশিকদের লেখা উপনিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বই, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, ইতিহাসচর্চা, ধর্মযাজকদের বক্তৃতায় ক্রমাগত উপনিবেশের ‘ভিন্নতা’-কে ‘বর্বরতা’-র আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। এবং ‘সুসভ্য’ ইউরোপীয় দ্বারা শাসিত হওয়াই যে বর্বরতাকে অতিক্রমের আদর্শ পথ, উপনিবেশস্থাপন যে আদতে ‘সভ্যকরণের

প্রকল্প' সেই 'নৈতিক' ব্যাখ্যাও বিবিধ বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হতে থাকে। আর উপনিবেশায়নের সাফল্য হয়তো এখানেই, উপনিবেশিত সমাজও (অন্তত একাংশ, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে ওঠা শ্রেণি) অনেক সময়েই 'সভ্যকরণ'-এর এই ধারণাকে, উপনিবেশকের 'আধুনিকতা'-র এই তত্ত্বকে আত্মস্থ করে নিয়ে ঔপনিবেশিক 'শাসন'-কেই কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেছিল। অর্থাৎ শাসকের আধিপত্য স্থাপন শুধু দমন-পীড়নের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, অনেকসময়েই বরং আন্তেনিও গ্রামসি যাকে 'হেজিমনি' বলে অভিহিত করেছেন, উপনিবেশিত মননে ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের 'শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে সেই সম্মতি তথা সম্মোহনও নির্মাণ করে নিতে পেরেছিল। উপনিবেশের মাটিতে ছলে-বলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার মানুষের চিন্তা-চেতনার উপর তারা নানা পথে একধরনের সার্বিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এই ভাবাদর্শগত আধিপত্যের উপর ভর করেই শাসকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথও প্রায় নিরঙ্কুশ ও স্বয়ংচালিত হয়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনবিস্তার প্রকৃতির এই সাধারণ তথ্য তথা সূত্রগুলিকে মাথায় রেখে, আমরা এবার ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পর্বের বিশিষ্টতাকে বুঝতে চাইব। বুঝতে চাইব, ভারত তথা বাংলার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্য আর ভাবাদর্শগত অবদমন- এই দুটি তল ও তাদের দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রকে। একদিকে আমরা দেখব, কীভাবে দেশীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতা, অব্যবস্থচিত্ততার সুযোগ নিয়ে, নিজেদের উন্নততর সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশকরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শাসন-সমাজনীতিকে পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলছিল। কীভাবে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক চাহিদার সাপেক্ষে নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ভারতীয় অর্থনীতি।

আর এই আলোচনারই সমান্তরালে পড়তে চাইব, ঐ শাসনপ্রকল্পকে অটুট রাখতে উপনিবেশিত মননের উপর শাসকের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভুত্ব বিস্তার কীভাবে ঘটছিল।

বস্তুত আগেই উল্লেখ করেছি, ভারত তথা বাংলার উপনিবেশ পত্তন পর্বটির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের আলোচ্য ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির রচয়িতা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত 'নব্য' বাঙালি শ্রেণির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের নানা স্তরকে পড়তে চাইব। তবে তাদের অবস্থানের বাস্তবতা তথা সার্বিকতার সন্ধান পেতে চাইলে, এই অধ্যায়কে অবশ্যই শুধুমাত্র উপনিবেশিক অবদমনের বিবিধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। সেই সঙ্গে চোখ রাখতে হবে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি উপনিবেশিত সমাজের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের বহুমুখী পর্বটির দিকেও৷ কারণ ঔপনিবেশিক ইতিহাস শুধু অর্থনৈতিক পশ্চাদপসরণ বা পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রসঙ্গেই শেষ হয়না, বরং সেই সূত্র ধরেই চলে আসে উপনিবেশিতের আত্মপ্রতিরোধ, বিক্ষুভ-বিদ্রোহের আরেক ইতিহাস। যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের শেষ ধাপে।

ভারতে ইয়রোপীয় উপনিবেশ পত্তনের শুরু ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে, যখন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। কিন্তু এই দেশ ইউরোপের কাছে নেহাৎ অপরিচিত ছিল না। বহু আগে থেকেই ইউরোপের বাজারে ভারতের লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, লঙ্কা, গোলমরিচ, সুতি ও রেশম বস্ত্র, দামী পাথর, হাতির দাঁতের জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রভূত চাহিদা ছিল। সপ্তম শতকে মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের আধিপত্য বিস্তৃত হলে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের পথে এই ব্যবসা আরব ও ইতালীয় বণিকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। আরব বণিকরা ঐ সব পণ্যসম্ভার ইতালির বিভিন্ন বন্দরে চড়া দামে বিক্রি করত। আর সেখানকার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ত ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্ট্যান্টিনোপল দখল করে নেওয়ার পর ভারত-ইউরোপ

বাণিজ্যপথ তাদের বণিকদের করায়ত্তে চলা আসে। তারা ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে অনেক বেশি দামে সেসব জিনিস ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লুটতে শুরু করে। ফলত ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকেরা, ব্যবসার স্বার্থেই সমুদ্রপথে সরাসরি ভারতে পৌঁছাতে উদ্যোগী হয়। সেসুবাদেই প্রথম আসে, পর্তুগীজরা। পথের হদিশ মিললে, একে একে আসতে থাকে ফরাসি, ওলন্দাজ, ইংরেজেরা। তবে উপনিবেশ বিস্তারের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত ইংরেজদের কাছে অন্যেরা পিছু হটতে থাকে। বস্তুত ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনাকাল হিসেবে সাধারণত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের বছরকে চিহ্নিত করা হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার 'শেষ স্বাধীন নবাব' সিরাজদৌল্লার পতন বাংলা তথা ভারতে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দখলদারিত্বের সুযোগকে সুনিশ্চিত করেছিল। তবে ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের বণিকদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি ও ভূমি আদায়ের চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল তার বহু আগে থেকেই। এদেশে ইংরেজরা পা রেখেছিল মোগল আমলেই। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছরের জন্য প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল ব্যবসা দিয়েই। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি তৈরির জন্য, ইংল্যান্ড-রাজ প্রথম জেমসের সুপারিশ নিয়ে কোম্পানির তরফ থেকে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স আগ্রায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করেন। সম্রাট প্রাথমিক অনুমতি দিলেও শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ বণিকদের বিরোধিতায় তা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এক নৌযুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পর্তুগীজদের পরাজয় ঘটলে জাহাঙ্গীর তাদের পূর্ব আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি তৈরি হয় সুরাটে। এরপর ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রোর তত্ত্বাবধানে, জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে কোম্পানি তাদের ব্যবসা জমানো শুরু করে। ফরাসি ও পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে

বিরোধিতা সামলাতে সামলাতেই শুরু হয় কোম্পানির ভূমি দখল প্রক্রিয়া। এবং ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে সুরাটের পাশাপাশি আগ্রা, আহম্মদনগর, ব্রোচ প্রভৃতি স্থানে তাদের কুঠি তৈরি হয়ে যায়। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে তারা মাদ্রাজের ইজারা নেয় এবং সেখানে বাণিজ্যকুঠির সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট ফোর্ট জর্জ নামক একটি দূর্গও নির্মাণ করে নেয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হলে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস, বিয়ের যৌতুক হিসেবে মুম্বই শহরটি পান ও কোম্পানিকে বিক্রি করে দেন। কিন্তু কোম্পানির কাছে এদেশে পাকাপাকি আধিপত্য জমানোর রাস্তা খুলে গিয়েছিল, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর। কারণ এরপরই শক্তিশালী উত্তরাধিকারীর অভাবে, একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ, উত্তরাধিকার সমস্যা, অভিজাত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দলাদলি আর অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমিক পতন শুরু হয়ে যায়। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট আর নানা সমস্যায় জর্জরিত দুর্বল রাজতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সামন্তপ্রভুরাও স্বাধীন হতে শুরু করে। সারা ভারত জুড়ে উপনিবেশ তৈরির জন্য এই গৃহযুদ্ধ আর রাজনৈতিক অস্থিরতারই সুযোগ নেয় ব্রিটিশরা। বাণিজ্যের পাশাপাশি বা বলা ভালো নিজেদের ব্যবসায়িক তথা আর্থিক প্রতিপত্তিকেই আরও বেশি জোরদার করতে এদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ে তারা। দেশীয় রাজাদের সামরিক দুর্বলতা, পারস্পরিক বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে একে একে জয় করে নিতে থাকে বাংলা, মহীশূর, অযোধ্যা, শিখ, মারাঠাদের স্বাধীন রাজ্যগুলিকে। তবে ভারত জুড়ে নানা প্রক্রিয়ায় ইংরেজদের রাজ্য আর বাণিজ্য বিস্তারের বিশদে না গিয়ে, আমরা আমাদের আলোচনার পরিসরটিকে নির্দিষ্ট করব মূলত বাংলা উপর ।

(২)

“বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী /রাজদণ্ডরূপে”[22]- ব্রিটিশদের বাংলা দখলের ইতিহাস সম্পর্কে এই খেদোক্তি বহুব্যবহৃত। তবে বণিক থেকে রাজায় রূপান্তর অবশ্য শর্বরী মাত্র পোহালে হয়নি, তার পিছনে ছিল বেশ কিছু বছরের পূর্বপ্রস্তুতি। বাংলার অর্থনীতিতে, কোম্পানির অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে গিয়েছিল সপ্তদশ শতক থেকেই। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে, সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যার হরিহরপুরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্যিক কারবারের হাতেখড়ি হয়েছিল। এরপর ব্যবসা যত বেড়েছে একে একে কুঠি তৈরি হয়েছে বালেশ্বর, হুগলী, মালদা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন সুবাদার মুহম্মদ সুজার কাছ থেকে কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি আদায় করে নেয়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক সুতানুটি গ্রামে একটি কুঠি নির্মাণ করেন এবং ব্যবসায়িক বন্দোবস্তকে আরও পাকা করতে, ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে, কোম্পানি তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়ম দূর্গ নির্মাণ করে। এরপর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে তারা বার্ষিক বারশ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদারি লাভ করে।

[22]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “শিবাজী-উৎসব” (মূল রচনাকাল: গিরিডি ১১ই ভাদ্র, ১৩১১ বঙ্গাব্দ), উৎস: https://www.tagoreweb.in/ ।

ইতিমধ্যে, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন আরম্ভ হলে, তৎকালীন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁও ক্রমশ মোগল কেন্দ্রীয় শক্তির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে, ঔরঙ্গজেব যে মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনিই বাংলা ও উড়িষ্যার 'সুবাদার' বা নবাব নিযুক্ত হয়ে কার্যত স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। অন্যদিকে এই বছরই, কোম্পানিও দুর্বল মোগল রাজতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তদানীন্তন সম্রাট ফারুখশিয়রের কাছ থেকে একটি ফরমান আদায় করে নেয়। ফরমানে, কোম্পানিকে আগের মতোই, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বিনা মাসুলে বাণিজ্যের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি কলকাতার ইংরেজ-কুঠির অধিকর্তাকে বিনা বাঁধায় কোম্পানির মালপত্র চলাচলের জন্য 'দস্তক' বা 'ছাড়পত্র' বিলির অধিকার দেওয়া হয়। 'দস্তক' লাভের এই 'কূটনৈতিক' সাফল্যই বাংলায় কোম্পানিকে ক্রমে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে থাকে। দস্তকের যত্রতত্র ব্যবহার শুরু হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ বা তাঁর উত্তরসূরীরা বহু বাঁধা দিয়েও কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। বরং কোম্পানির পাশাপাশি কোম্পানির কর্মচারীরাও তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে বেআইনীভাবে সেই দস্তক ব্যবহার করতে শুরু করে। শুধু তারাই নয়, সেইসব কর্মচারীদের কর্মচারী অর্থাৎ দেশীয় গোমস্তা, মুন্সী এবং স্বাধীন ইউরোপীয় ও দেশীয় ধনী বণিকেরাও দস্তকের অপব্যবহার শুরু করে। অনেক সময় কোম্পানির কর্মচারীরাই সেই দস্তক জাল করে তা মোটা টাকায় দেশীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের আশ্রিত গোমস্তাদের বেআইনী পথে দস্তক ব্যবহারে স্বভাবতই দেশীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা এভাবে পিছু হটে যাওয়ায় দেশীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ করে।

কোম্পানির ও তার কর্মচারীরা কর ছাড়া ব্যবসা চালানোয় নবাবও প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। এবং যেহেতু অভ্যন্তরীণ শুল্কই ছিল নবাবী আয়ের প্রধান উৎস, মুর্শিদকুলি খাঁ–এর সময় থেকেই কোম্পানির সঙ্গে নবাবদের নানা স্বার্থসংঘাত বাঁধতে থাকে। সিরাজদৌল্লার আমলে এই সংঘাতই চরমে উঠলে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ ঘটে। নবাব বংশের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ষড়যন্ত্রের সাহায্যে, মীরজাফর-মীরকাশিমদের বশীভূত করে সে যুদ্ধ সহজেই জিতে নেয় ইংরেজেরা। শুরু হয় বণিকের ‘মানদণ্ড’, ‘রাজদণ্ড’-এ রূপান্তরিত হওয়ার পরবর্তী ইতিহাস। (তৎকালীন রাজধানী) মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে নিজ মনোমত ‘নবাব’ নির্বাচনের অধিকার হস্তগত করে বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরে কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে নবাবী অধ্যায়ের অস্তরাগ ঘটে আর অন্যদিকে নবাবদের কাছ থেকে বিচিত্র পথে উৎকোচ-উপঢৌকন আদায় থেকে শুরু করে, অবাধে অবৈধ পথে বাণিজ্য আর রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে কোম্পানি ও তার কর্মচারীরাই কার্যত এদেশের নতুন ‘নবাব’ হয়ে ওঠে।

অবশ্য বাংলাকে পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে আনতে কোম্পানিকে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি যুদ্ধ করতে হয়। কারণ, সিরাজদৌল্লা পরবর্তী নবাব মীরজাফর, ইংরেজদেরই মনোনীত ও দরবারী ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম হলেও কোম্পানির ও তার কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যে আর্থিকভাবে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে, কোম্পানির সঙ্গে তাঁরও বিরোধ বাঁধতে দেরি হয়না। দস্তকের অপব্যাবহার বন্ধ করে কোম্পানিকে জব্দ করতে, তিনি দেশীয় বণিকদের উপর থেকেও যাবতীয় শুল্ক তুলে নেন। নবাবের এই চরম পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়াতেই বেঁধে যায় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসের ‘চূড়ান্ত’ ফলনির্ণয়কারী বক্সারের যুদ্ধ। যেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মীরজাফর, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও দিল্লীর বাদ্‌শাহ শাহ আলমের সম্মিলিত পরাজয় ঘটলে সমগ্র সুবে বাংলার রাজস্ব ভাণ্ডারই কোম্পানির হাতে চলে

আসে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগষ্ট, বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তিতে দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় দেওয়ানী বিভাগের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার পর স্বভাবতই বাংলায় কোম্পানির প্রতিপত্তি প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে।

দেওয়ানীর অধিকার অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকারের উপরেও আইনী সীলমোহর পড়ে যায়। দেওয়ানী লাভের আগেই, ২০শে ফেব্রুয়ারি, মীরজাফরের পুত্র নবাব নজম্‌উদ্দৌল্লার সঙ্গে এক চুক্তি করে, কোম্পানি তাদের নির্বাচিত 'নায়েব নাজিম'-এর হাতে নবাবের সমস্তরকম 'নিজামতি' বা প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্ব অর্পণ করে। বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার চুক্তিতে, নবাব পরিণত হন কোম্পানির বৃত্তিভোগীতে। তাঁর সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হয়। এবং 'নিজামত' ও 'দেওয়ানী' দুটি ক্ষমতাই কোম্পানির কুক্ষিগত হয়। কিন্তু কোম্পানি তখনো শাসনভার সরাসরি নিজেদের হাতে নেয়না। তারা এক দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চালু করে। মহম্মদ রেঁজা খাঁকে বাংলার ও সিতাব রায়কে বিহারের নায়েব-সুবার পদে নিযুক্ত করে তাদের হাতে নিজামতী ও দেওয়ানীর ভার দেওয়া হয়। আইনত তাঁরা থাকেন নবাবের অধীনে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হতে থাকেন কোম্পানির স্বার্থ দ্বারা।

দেওয়ানীর অধিকার হস্তগত হলে কোম্পানির আর্থিক অরাজকতাও লাগামছাড়া হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত এসময় কোম্পানিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও দেশীয় রাজা ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর, সেসব যুদ্ধের খরচ মেটাতে বাংলার অর্থভাণ্ডারকে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে শুরু করে তারা। দেওয়ানী পাওয়ার আগে, ১৭৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই কোম্পানি রাজস্ব আদায় করে প্রায় তার দ্বিগুণ- ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। নবাব আলিবর্দির আমলে যে

পূর্ণিয়া জেলা থেকে রাজস্ব আদায় হত চার লক্ষ টাকা, কোম্পানি নিযুক্ত কর্মচারী সুচেতরাম সেখান থেকে আদায় করেছিল ২৫ লক্ষ টাকা। ক্ষমতা কোম্পানির হাতে যাওয়ামাত্রই বেশি রাজস্ব আদায়ের আশায় কোম্পানি বাংলার ভূমিব্যবস্থার বিন্যাসকেও পাল্টে দিতে শুরু করে। অদলবদল ঘটাতে থাকে রাজস্বনীতিতে। প্রতি বছরের ভিত্তিতে জমি ইজারা দেওয়া শুরু হয়। ইজারাদাররাও, তাদের স্বল্পকালীন জমির স্থায়িত্বকে পুষিয়ে নিত, চড়া কর ধার্য করে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ শোষণ শুরু করে। অক্ষম প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতে থাকে। বস্তুত দেওয়ানী লাভের পরেই, এদেশের বাণিজ্যিক পণ্য কেনার টাকা ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ভারতের মাটিতে বাণিজ্যিক বা সামরিক যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে নূন্যতম সময়ে সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ। স্বভাবতই প্রজার স্বার্থ ও সুবিধা-অসুবিধা, উৎপাদনের ঘাটতি প্রভৃতি জরুরি বিষয়গুলিকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনা। মহম্মদ রেজা খাঁ আবার প্রজাদের উপর 'নজর' নামে এক নতুন কর চাপিয়ে দেয়। ফলে রাজস্ব দিতে অক্ষম অনেক কৃষকই জমি ছেড়ে পালাতে থাকে। কৃষির উৎপাদনও কমতে থাকে। এর উপর আবার, রাজস্ব দেওয়ার মাধ্যম ফসল থেকে মুদ্রা করে দেওয়া হয়। ফলে, কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। রাজস্ব দান বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য তাদের নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে মুদ্রা সংগ্রহ করতে হয়। আজন্মা বা কম ফলনের মরশুমেও প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য তারা বাধ্য হয় ঋণ নিতে। এই অবস্থার অনিবার্যতাতেই জন্ম হয় মহাজনী সম্প্রদায়ের। খাজনার চড়া হার আর খাজনা আদায়ের অত্যাচ্যার থেকে বাঁচতে কৃষকরা মহাজনদের দ্বারস্থ হতে থাকে। সেই সুযোগে মহাজনেরাও সস্তায় ফসল কিনে নিয়ে, ঋণের টাকার উপর চড়া হারে সুদ বসাতে থাকে।

রাজস্ব আদায়ে অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য। দস্তকের অপব্যবহার চলতে থাকে। বরং আরও জোর গতিতে

শুরু হয়। কোম্পানি কর্মচারীরা তাদের দালাল ও গোমস্তাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রামগঞ্জের নানান অঞ্চল থেকে তেল, মাছ, বাঁশ, ধান, সুপুরি, লবণ, তামাক ও অন্যান্য শিল্পজাত জিনিস দেশীয় উৎপাদকদের থেকে জোর করে সস্তা দামে কিনে এনে তা অনেক বেশি দামে এদেশীয় বাজারে বিক্রি শুরু করে। ফলত ক্রয় ও বিক্রয়- দুক্ষেত্রেই বাংলার উৎপাদকেদের ক্ষতি হতে আরম্ভ করে। লবণ, চাল, তামাক, সুপুরির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসার অধিকার কোম্পানি একেচেটিয়াভাবে নিজেদের হাতে রেখে দেয়। অনেক সময় আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বাজারে এইসব জিনিসের অভাব তৈরি করা হতে থাকে। ফলে জিনিসের দাম হয় আকাশ ছোঁওয়া। আর কোম্পানির লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকে। প্রসঙ্গত ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কোম্পানি নিজস্ব এজেন্সী মারফৎ পণ্য সংগ্রহ করত। বস্তুত কোম্পানির কর্মচারীরাই (যারা নিজেরা নানা ধরনের ব্যক্তিগত বানিজ্যে লিপ্ত ছিল) আসলে এই এজেন্টের কাজ করত। ফলত কোম্পানির ব্যবসা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা একীভূত হয়ে কর্মচারীদের দুর্নীতি ও লোভ সীমাহীন হয়ে ওঠে। সস্তায় মাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা দেশীয় তাঁতী ও কারিগরদের অগ্রিম বা দাদন নিতে বাধ্য করত। দেশীয় উৎপাদকেরা অতি সামান্য টাকায়, নিজেদের লোকসান করেও দাদন নিতে বাধ্য হত। এবং একবার অগ্রিম নেওয়ার পর তাঁতীদের নিজের লোকসান করেও মাল পাঠাতে হত। বেশি দাম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তারা দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে মাল বিক্রি করতে পারতনা। আবার উৎপন্ন মাল কোম্পানির কাছে নিয়ে গেলেও তাদের ঠকতে হত। প্রায়ই, পণ্যের গুণমান উপযুক্ত নয় বলে কোম্পানির কর্মচারীরা সেই মাল কোম্পানির তরফ থেকে বাতিল করে দিত, অথচ একই জিনিস আরও সস্তায় নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য কিনে নিত। এর উপর কোম্পানি কাঁচা তুলোর ব্যবসাকেও একচেটিয়াভাবে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছিল। ফলে তাঁতীরা আর আগের মতো স্বাধীনভাবে দক্ষিণ ভারত থেকে তুলো আনাতে পারতনা। বরং বাধ্য হত কোম্পানির থেকে বেশি দামে তুলো কিনে, তৈরি কাপড়

কোম্পানিকেই কম দামে বিক্রি করতে। স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচার আর লোকসানের জেরে বহু তাঁতী কাজ ছেড়ে দিতে শুরু করলে বাংলার বস্ত্রশিল্প ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। ১৭৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক অনাবৃষ্টি ও পর পর দুই বছর ফসলহানি হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কোম্পানির নীতি অনুসারে, সুবে বাংলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে খাদ্যশস্য চলাচল নিষিদ্ধ থাকায়, উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় শস্য নিয়ে আসা হয়না। ফসলহানির খবর পেয়েই কোম্পানি তার কর্মচারী আর সেনাবাহিনীর জন্য ব্যাপক পরিমাণে চাল মজুত করে ফেলে। ফলত চালের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। অবস্থার ফায়দা তুলতে থাকে কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের গোমস্তারা। চালের মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ধান-চালের ব্যবসা শুরু করে দেয়। নিরুপায় কৃষকদের কাছ থেকে বীজধান পর্যন্ত তারা কিনে নিতে শুরু করে। আর মজুত করা খাদ্যশস্য চড়া টাকায় বিক্রি করে মুনাফা লুটতে থাকে। অনাবৃষ্টি, আজন্মার সঙ্গে সঙ্গে এই অনমনীয় অমানবিক নীতির নিদারুণ পরিণতি হিসেবেই ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ – ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, এই দুর্ভিক্ষে বাংলা সুবার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। বাংলার দুই-তৃতাংশ প্রাচীন জমিদারি বংশ লোপ পায়- দুর্ভিক্ষে মারা যায় বা কর দিতে না পেরে জমিদারি হারায়। বহু ইজারাদারও ইজারা হারান। পুরনো জমিদার বা ইজারাদারদের জায়গায় বহু নতুন মানুষ আসতে শুরু করে- কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর গোমস্তার কাজ করে যারা প্রচুর টাকা রোজগার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যেও ঋণ মকুব করা হয়না। বরং মৃত ও পলাতক প্রজাদের দেয় করের ঘাটতি মেটাতে কোম্পানি জীবিত প্রজাদের উপর ‘নাজাই’ নামক কর চালু করে দেয়। এবং ১৭৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ যখন চরমে, তখনো তারা আগের বছরের থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করে। কিন্তু মন্বন্তর আক্রান্ত বাংলায় প্রায় অধিকাংশ মানুষ মারা যাওয়ার পর কৃষিজমিগুলি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ

হয়ে যায়। চাষবাস বন্ধ হয়। অফুরন্ত অনাবাদী জমি পড়ে থাকায় জমির দামও কমে যায়। রাজস্ব আদায়ের উপায় থাকে না। বিভিন্ন অঞ্চলে কোম্পানির ও ইজারাদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষক ও তাঁতীদের বিদ্রোহও শুরু হয়।

মন্বন্তরে বিপর্যস্ত বাংলায় কোম্পানির আয় ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে পড়লে, ব্রিটিশ সরকার ও কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স-ও দ্বৈত শাসনের অচলতা টের পায়। তারা বুঝতে পারে, উপনিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করতে, কোম্পানির লাগামছাড়া লুটপাট আর জোরজুলুমের (যার পরিণতিতেই ঘটে যায় মন্বন্তর) পরিবর্তে যাবতীয় শাসন-শোষণ আর স্বার্থসিদ্ধিকে আইন-শৃঙ্খলার মোড়কে বিন্যস্ত করাটা বেশি জরুরি। উপনিবেশের মাটিতে একটি স্থায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপন করার তৎপরতা থেকেই, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী ও নিজামতকে একীভূত করে, গভর্নর জেনারেল হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস সুবে বাংলার শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে নেন। আনা হতে থাকে নানা আনুষাঙ্গিক প্রশাসনিক রদ্‌বদল। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। নবাব আগেই, ক্ষমতাহীন হয়ে কোম্পানির বৃত্তিভোগী হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। এখন থেকে তার বার্ষিক বৃত্তিও কমে অর্ধেক হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানাকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরানো হয়।

(৩)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানীর অধিকার হাতে এলেও এদেশের মাটিতে যুৎসই রাজস্বপ্রক্রিয়া চালু করতে কোম্পানির সাহেবদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। তাদের অত্যধিক জুলুমের পরিণতি

হয়েছিল মন্বন্তর। যার ফলে বাংলার অধিকাংশ জমি অনাবাদী ও পরিত্যক্ত হওয়ায় কোম্পানি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। স্বভাবতই বাংলার বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার স্বার্থে নতুন নতুন অফিস তৈরি, কমিটি নিয়োগ, প্রতি জেলার তত্ত্বাবধানে আলাদা আলাদা কর্মচারী নিয়োগ চলতে থাকে। কৃষি উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ, অঞ্চল বিশেষে আলাদা আলাদা রাজস্ব আরোপ ও আদায়ের সঠিক উপায়, রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যায়হ্রাস- এসবের হিসেব-নিকেশ করতে বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলে। প্রথমে কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভেনিউ, পরে রেভেনিউ কন্ট্রোল বোর্ড, তারপর বোর্ড কমিটি অফ রেভেনিউ, সবশেষে বোর্ড অফ রেভেনিউ স্থাপিত হয়। উপযুক্ত ও লাভদায়ী রাজস্বনীতি বিষয়ে ইংল্যান্ডের কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স, বিভিন্ন পরিদর্শক, উঁচুস্তরের প্রশাসকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, বাদানুবাদ চলছিল অনেকদিন থেকেই। ইংল্যান্ডের মাটিতে সেসময় সেদেশের ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পন্ন জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষীরাই কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে শিল্পবিপ্লবকে তরান্বিত করতে শুরু করেছিল। ফলে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স-এরও মনে হতে থাকে, একইভাবে ভারতেও জমিতে ব্যক্তিমালিকানা কায়েম হলে ‘ব্যাক্তিগত সম্পত্তির যাদুস্পর্শে’ জমিদারদের উদ্যোগেই হয়তো কৃষির উন্নতি হবে। উৎপাদনে দীর্ঘকালীন বিকাশের নিশ্চয়তা আসবে। আয় সুনিশ্চিত হবে। সর্বোপরি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন নাস্তানাবুদ হওয়ার পর কোম্পানিও একাজ থেকে নিস্তার চাইছিল।

এই সূত্রেই ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের ভিত্তিতে ‘পাঁচশলা বন্দোবস্ত’ চালু হয়। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ‘একশলা বন্দোবস্ত’। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দশ বছরের মেয়াদে ‘দশশলা বন্দোবস্ত’ জারী হয়। এবং এভাবে ঘন ঘন নীতি পরিবর্তনের পর অবশেষে যুগপৎ উৎপাদনে উন্নতি এবং নিরাপদ রাজস্ব আদায়ের উপায় হিসেবে, পরিচালক সভার অনুমোদনে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ ‘দশশলা বন্দোবস্ত’-ই ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’-তে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থা

অনুসারে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব প্রদানের (জমিদারকে দেয় প্রজাদের খাজনার নব্বই শতাংশ) মাধ্যমে জমিদার-তালুকদারদের পাকাপাকি বংশানুক্রমিকভাবে জমির মালিকানা দিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, ভবিষ্যতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে বা উৎপাদন বাড়লেও জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির এই বন্দোবস্তের কোনো বদল আসবেনা। কিন্তু ভবিষ্যতে খরা, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও রাজস্ব মকুব হবেনা। বরং নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব মেটাতে না পারলে সমগ্র জমিদারি বা তার কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রি করে পাওনা মেটানো হবে।

কোম্পানি আশা করেছিল, জমিতে স্থায়ী স্বত্ব লাভ করলে, জমিদারেরা কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াবেন। এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে কর পেতে থাকলে কোম্পানির আয়ও সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন বাংলার অর্থনীতি মন্বন্তরের রেশ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল আংশিক খাদ্যাভাব। ফলত এই বন্দোবস্তে যেভাবে চড়া হারে খাজনা বেঁধে দেওয়া হয় তা মেটানো কৃষকদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায়ের অসুবিধায়, ‘সূর্যাস্ত আইন’ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে সরকারী কোষাগারে রজস্ব জমা করতে না পেরে বহু প্রাচীন জমিদার বংশ জমিদারি হারায়। প্রসঙ্গত এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার কুড়ি বছরের মধ্যেই বাংলার প্রায় অর্ধেক পুরনো জমিদার উচ্ছেদ হয়ে যান। পুরনো জমিদারিগুলি কিনে নিতে থাকে কোম্পানির বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, শহরের উঠতি ধনী ব্যক্তিরা- কোম্পানির দালালি করে, ধানচাল, তেজারতির কারবার করে যারা প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল। স্বভাবতই এইসব ভুঁইফোড় জমিদারদের সঙ্গে কৃষক বা জমির কোনো সম্বন্ধ ছিলনা। জমিদারিকে তারা শুধুমাত্র একটি লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন। বেশিরভাগ সময়েই আবার এইসব জমিদারেরা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাদের নায়েব-

গোমস্তাদের হাতে দিয়ে শহর কলকাতায় বিলাসব্যসনে দিন কাটাতে থাকে। ‘অনুপস্থিত জমিদার’-দের কর্মচারীরাও নিজেদের মুনাফার অংশ সুরক্ষিত করতে, প্রজাদের কাছ থেকে নির্ধারিত করের অনেক বেশি আদায়ের জন্য নানারকম জুলুম চালাতে থাকে।

সর্বোপরি এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোম্পানি, এতদিন অবধি যে জমিদারেরা কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়কারী ছিল তাদের হাতে জমির স্বত্ব দিয়ে এদেশে তাদের অনুগত একটি সহায়ক শ্রেণি তৈরির আশা করেছিল। যারা নিজেদের স্বার্থেই কোম্পানির শাসনধারাটিকে বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বস্তুত এদেশে নিজেদের প্রশাসনিক ভিত্তিকে মজবুত করতে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দানা বাঁধতে থাকা কৃষক বিদ্রোহ আর বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে কোম্পানির দেশীয় ধনী উচ্চবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সুপ্রকাশ রায় যেমন বাংলায় চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করার প্রেক্ষিতে কোম্পানির অভিসন্ধি বিশ্লেষণ করে বলছেন–

> বন্দোবস্তের পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতে এমন একটি নূতন শ্রেণি তৈরী করা, যে শ্রেণি এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে। অষ্টাদশ শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের সকল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা দেশীয় সমর্থনহীন একক ইংরেজ-শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল।...এই ক্রমবর্ধমান গণবিদ্রোহের আঘাত হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে বাঁচাইবার জন্য দেশের মধ্যেই একদল কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইভাবে নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠীকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইলেন।[23]

---

[23]সুপ্রকাশ রায়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত”, *ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা: ডিএনবিএ ব্রাদার্স, ১৯৭২), পৃষ্ঠা- ১১০।

ইতিমধ্যে পত্তনি আইনে জমিদারদের পত্তনি স্বত্ব প্রবর্তনের অধিকার দেওয়া হয়। ফলত জমিদারেরা দ্রুত খজনা আদায়ের লোভে বা কোনো আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলে, নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে, তাদের জমিদারিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে পত্তনিদারদের দিয়ে দিতেন। এই পত্তনিদারেরাও একইভাবে উচ্চহারে এক বা একাধিকের (দর পত্তনিদার) মধ্যে জমির বন্দোবস্ত করে দিতেন। দর-পত্তনিদারেরাও আবার তাদের জমি ভাড়া দিয়ে দিতেন দর-দর পত্তনিদারদের মধ্যে। এইভাবে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে দর-পত্তনি, দর-ইজারা, হাওলাদার, গাঁতিদার প্রভৃতি ধাপে ধাপে অসংখ্য উপস্বত্ব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এই মধ্যস্বত্বের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলার প্রায় ষাট শতাংশ জমিদারিতে উপস্বত্ব তৈরি হয়েছিল। বর্ধমানে ৮৬ শতাংশ, বাখরগঞ্জে ৭৩ শতাংশ, বীরভূমে ৫৬ শতাংশ আর যশোরে ৫২ শতাংশ। উপস্বত্বের ধাপ যশোর ও চব্বিশ পরগণায় চার ধাপ এবং বাখরগঞ্জে সাত ধাপ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নানা ধরনের পত্তনি-উপপত্তনিতে ভাগ হয়ে জমিদারি ক্রমে খণ্ড খণ্ড হতে থাকে এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় জমিদারির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড় লক্ষ। যাদের বেশির ভাগই ছিল মাঝারি বা ছোট জমিদারি। শতাব্দীর শেষ দশকে বোর্ড অফ রেভেনিউ-এর তথ্য অনুসারে, প্রায় ৯৯ শতাংশ জমিদারিতেই বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার কম ছিল। এমনকি প্রায় ৮৫ শতাংশ জমিদারি বার্ষিক একশো টাকারও কম রাজস্ব দেয়। এইভাবে পত্তনির পর পত্তনিতে বিভক্ত হয়ে জমিদার ও তার নীচে স্তরে স্তরে বেড়ে চলা উপস্বত্বভোগীদের নিয়ে এক বিশাল সামন্তসৌধ সংস্থাপিত হয়। এবং যেহেতু প্রতিটি স্তরেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুনাফা, সেই দাবি মেটাতে কৃষকদের উপর শোষণ ও করের বোঝাও ক্রমে বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে যোগ হয় মহাজনদের অত্যাচার। এবং বেশিরভাগ জায়গাতেই জমিদার বা নায়েব-গোমস্তারাই মহাজনী কারবার চালাতে থাকে। ফলে ঋণের দায়ে কৃষককে

জমিদার তথা মহাজনের কাছে জমি বেচে তার জমিতেই ভাগচাষী হয়ে থাকতে হয়। জমি থেকে পাওয়া খাজনা বা উৎপাদনের উদ্বৃত্ত কৃষক বা কৃষির উন্নতিতে আদপেই ব্যবহৃত হয়না। বরং তা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে বণ্টিত হতে শুরু করে। মালিকানা পেয়েও জমিদারেরা জমি বিষয়ে যত্নশীল হননা। ফলত কৃষির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ সময়েই কৃষকের জীবনমান, কৃষির সরঞ্জাম, হালবলদ, সারের ব্যবহার, সেচ ও জল নিকাশী ব্যবস্থা কোন দিকেই জমিদাররা নজর দেননা। অনাবাদী করমুক্ত জমির সংস্কারেও জমিদারেরা আদৌ বিশেষ উদ্যোগী হননি। বরং অনেকসময়, প্রাথমিক কিছু খরচ করে পতিত জমিতে চাষ শুরু করার পর কৃষকদের কাছ থেকে সেইসব খরচা আবওয়াব আর বাড়তি খাজনার মধ্যে দিয়ে উসুল করে নেওয়া হতে থাকে। আবার অনেকজায়গায়, জমির লোভ দেখিয়ে কৃষকদের বেগার খাটিয়ে বিস্তীর্ণ অনাবাদী অঞ্চলগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার পর তাদের উপর চড়া হারে কর চাপানো হয়। ফলে কৃষকদের দুরবস্থা বেড়ে চলে।

কৃষির দুরবস্থার সমান্তরালেই চলতে থাকে দেশীয় তাঁত আর কারিগরি শিল্পের ভাঙন। বিশেষত আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের গতিবৃদ্ধি শুরু হলে স্বভাবতই সেখানকার জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে কোম্পানির এতদিনকার বাণিজ্যরীতি বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এদেশে এসে, প্রাথমিক পর্বে কোম্পানির বাণিজ্যের মূল ভিত্তি ছিল নীল, রেশম, কার্পাস, সুতিবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানী। কিন্তু ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশের মাটিতে সেসব দ্রব্য বিক্রির খোলা বাজার এবং সেখান থেকে কম দামে আবশ্যক কাঁচামাল নিয়ে যাওয়ার চাহিদাও বেড়ে যায়। ইংল্যান্ডের অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থা ও ব্যবসায়ীরাও ক্রমাগত ভারতে ব্যবসার সুযোগের জন্য, কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলত কোম্পানির উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নজরদারী বাড়াতে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটের ভারত আইন জারী

হয়। এবং শিল্পপতিদের চাপে, সরকার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দেই ভারতীয় বাজার তাদের জন্য কিছুটা খুলে দিতে বাধ্য হয়- কোম্পানি মারফৎ তারা ৩০০০ টন মাল পাঠাবার অনুমতি পায়। এবং অবশেষে, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ্ আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বানিজ্যাধিকার লোপ পায়। এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার পুরোপুরি রদ্ করা হয়। ফলত ইংল্যান্ডের অন্যান্য বণিকদের প্রবেশ আরম্ভ হয়। বনিক পুঁজি ক্রমশ শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হলে শুরু হয় লুণ্ঠনের নতুন পর্ব ও প্রক্রিয়া। ভারত পরিণত হয় ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানাগুলির কাঁচামালের উৎস ও উৎপন্ন পণ্যের খোলাবাজার।

ইংল্যান্ডের শিল্পপুঁজির স্বার্থে ভারতীয় বাজারকে ব্যাপক হারে কাজে লাগানো হতে থাকে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড। আর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তার আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ইংল্যান্ডে তৈরি সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় ভারতে আসত ৩০ লক্ষ গজ, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ। এভাবে অবাধ গতিতে যন্ত্রোৎপাদিত সস্তাদরের ব্রিটিশ পণ্য বাজারে আসতে শুরু করলে স্বভাবতই ভারতীয় বিভিন্ন হস্তশিল্প, কারিগরি শিল্পের অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের শিল্পসমৃদ্ধিকে বহতা দিতে ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগগুলিকে নানাভাবে বিঘ্নিত করা হতে থাকে। তাই যেহেতু শুরু থেকেই শিল্পবিপ্লবে অগ্রগণ্য ক্ষেত্র নিয়েছিল ব্রিটেনের কলে উৎপন্ন সুতো ও সুতিবস্ত্র, তার কোপ পড়েছিল বাংলার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্পের উপর। ব্রিটিশ পণ্যের বাজার তৈরি করতে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাজারে বাংলার বস্ত্রের (সে দেশে অতি জনপ্রিয়) আমদানি রোধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দুই দশক থেকেই। ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর বিরাট শুল্কভার চাপানো হচ্ছিল। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ক্যালিকোর ওপর ইংল্যান্ডে আমদানি শুল্কের হার ছিল ১৮%। আর ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তা দাঁড়ায় ৬৭.০৫%। মসলিনের ওপর শুল্ক বসানো হয়

৩৭.০৫%। বাংলার সুতো ও থান কাপড়, যা এতদিন কোম্পানি ব্যাপক হারে কিনে নিত তা কমতে কমতে আস্তে আস্তে বাদ যায় কোম্পানির ক্রয়তালিকা থেকে। এবং ১৮১৩-৩৩ খ্রিস্টাব্দ- মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে বিলেতের বাজার থেকে বাংলার সুতি ও সুতিবস্ত্র প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর অন্যদিকে ভারতীয় বাজার ভরে যায় ম্যাঞ্চেস্টার-ল্যাঙ্কাশায়ারের শাড়ি-ধুতিতে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এসেছিল ১৫৬ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র। আর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। আর এরই ব্যাস্তানুপাতে, ১৭৯০ সালে যেখানে ঢাকায় সুতিবস্ত্রে বিনিয়োগ করা হয় ২৫ লক্ষ টাকা; ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার পরিমাণ কমে হয় মাত্র ২ লক্ষ টাকা। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় ভারতীয় বাজার যে অসম্ভব দ্রুতগতিতে দেশীয় শিল্পসমূহকে হটিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের হাতে চলে যাচ্ছিল, উপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। বিলিতি কলে তৈরি সুতো বাজারে আসতে শুরু করলে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে চড়কা বা টেকুয়ায় কাটা সুতোর আর চাহিদা থাকেনা। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই কোম্পানির জোরজুলুমে বাংলার বস্ত্রশিল্পীদের জীবন যে কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। তখন কোম্পানি কম দাদনের বিনিময়ে তাদের কাপড় বুনতে আর বেচতে বাধ্য করত। আর এবার ইংল্যান্ডের বস্ত্র উৎপাদনের মাসুল দিতে বাংলার তাঁতীদের হাতে আর কাজই থাকে না। অসংখ্য তাঁতী কর্মহীন হয়ে পড়ে। বস্তুত উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ঢাকা, মুর্শিদাবাদের মতো বস্ত্রশিল্পের মূল কেন্দ্রগুলির অবস্থার অবনতি হতে শুরু করেছিল। একই হাল হয়েছিল ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, কালনা, আরামবাগ, গোপীনাথপুর, বাদোরা, রাজগ্রাম, বীরসিংপুর প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলির।

বস্ত্রশিল্পের মতোই দেশীয় পিতল-কাঁসার শিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে বিলিতি অ্যালুমিনিয়ম আর জার্মান সিলভারের কাছে। সার্টিন কাপড়ের আমদানিতে নষ্ট হয় মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্পের বাজার। এবং শহুরে উচ্চবর্গীয় ধনীদের মধ্যেও সাহেবী পোশাকের অনুকরণ, বিলিতি সাজসজ্জা

আর বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের ঝোঁক ক্রমে বাড়তে থাকায় দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমে তাদের বাজার হারায়। এককথায়, এযাবৎ শিল্পপ্রধান বাংলার প্রথাগত বৃত্তিবিন্যাসের বুনিয়াদটাই বিধ্বস্ত হতে শুরু করে। তাঁতী-কারিগরদের কুলবৃত্তির পরম্পরা ভেঙে গেলে তারা জীবনধারণের জন্য ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হয়। এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির রূঢ় বাস্তবতায় অবশিল্পায়নের (শিল্পোৎপাদন ও তাতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি) ধারা যত মজবুত হয়, কুটিরশিল্প আর অন্যান্য উপজীবিকা যত অবলুপ্ত হয়, বাংলায় জমিতে ভূমিহীন ভাগচাষীর ভারও তত বাড়তে থাকে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পর কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার মহারাণীর কাছে হস্তান্তরিত হলে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের পরিসর আরও বিস্তৃত হয়। ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে আরও বেশি পুঁজি লগ্নি করে, সস্তায় এদেশের শ্রম ও জমিকে কাজে লাগিয়ে, নিজেদের লাভের অঙ্ককে আরও বাড়িয়ে নিতে শুরু করছিল।

ইংল্যান্ডের অভূতপূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধির সমান্তরালে ভারত তথা বাংলার শিল্প-অর্থনীতিতে এক সম্পূর্ণ বিপরীতচিত্র রচিত হচ্ছিল। বস্তুত উপনিবেশ স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ইংল্যান্ডের ধনতন্ত্রকে পরিপুষ্ট করে তোলা, যার জন্য জরুরি ছিল এদেশের অর্থনীতির সঠিক বিকাশ বা বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা। এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পর যাবতীয় শাসন-আইন আরোপিত হয়েছিল সেই আর্থিক স্বার্থ চরিতার্থের কথা মাথায় রেখে, ধনিক-শোষণের তাড়না থেকে। পরাধীন সমাজের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা শিল্প-বাণিজ্যের রাশ শুরু থেকেই ব্রিটিশদের হাতে থাকায় বাঙালি ব্যবসায়ী বা ধনিকেরা সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি। বস্তুত ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুখশিয়রের 'দস্তক' লাভের পর থেকেই বাংলায় কোম্পানির যাবতীয় ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধাকে ক্রমশ নিজেদের কুক্ষিগত করতে আরম্ভ করেছিল। ফলত

অষ্টাদশ শতক থেকেই স্বাধীনভাবে কারবার বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী ভিড়ে গিয়েছিল কোম্পানির কর্মচারীদের দলে। অথবা পরিণত হয়েছিল কোম্পানির বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল আর দাদন-ব্যবসায়ীতে। তাদের কাজ ছিল কোম্পানির বা তার কর্মচারীদের রপ্তানির মাল যোগান দেওয়া ও আমদানিকৃত পণ্য দেশীয় বাজারে বিক্রির বন্দোবস্ত করা। অথবা প্রয়োজনে তাদের পুঁজির ব্যবস্থা করা। আর উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে শিল্প-পুঁজির রমরমা শুরু হলে এই দালাল-মুৎসুদ্দি বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের শিল্প লগ্নির কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি হয়নি, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভর করে বা তার স্বার্থ অনুসারে, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের অনুচর-পার্শ্বচর হিসেবে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মুখে পড়ে একদিকে দেশের গ্রামীণ কুটিরশিল্প-হস্তশিল্পের ধারা বিধ্বস্ত হয়। অথচ তার পরিবর্তে দেশীয়দের স্বাধীন উদ্যোগে যন্ত্রনির্ভর কলকারখানাও গড়ে উঠতে পারেনা ঠিকভাবে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে এদেশে চটকল, চা-বাগিচা, কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে যে নতুন নতুন শিল্প তৈরি হয় সেগুলিরও সিংহভাগই ছিল ব্রিটিশ মালিকানার নিয়ন্ত্রণে। যেমন চটকল গড়ে ওঠার প্রায় শুরু থেকেই ইণ্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলিত মালিকানা দ্বারাই কাঁচা পাটের মূল্য স্থির, উৎপাদনের পরিমাণ, মজুরি নির্ধারণের মতো যাবতীয় বিষয় চালিত হত। এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদায় মন্দা দেখা দিলেই মালিকপক্ষ ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকে কলের মজুর ও পাটচাষীদের উপর। বাজারের ওঠা-পড়া সম্পর্কে চাষীদের সম্যক ধারণা না থাকায় প্রায়ই তাদের লোকসান হত। নিরুপায় হয়ে তাদের কম দামে পাট বেচতে হত। অথবা বাড়তি কাঁচা পাট মাটিতে পুঁতে ফেলা ছাড়া উপায় থাকতনা। কয়লাখনির ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের মতো দেশীয়দের উদ্যোগ ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে খুব বেশি দিন পাল্লা দিতে পারেনি। বাগিচা শিল্পেও প্রায় শুরু থেকেই ব্রিটিশ পুঁজির প্রাধান্য ছিল। এসব শিল্পের লভ্যাংশের সঙ্গে তাই এদেশীয়দের

অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিলনা। উপরন্তু কর্ণওয়ালিশের ব্যবস্থায় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হওয়ায় জমি স্বভাবতই হয়ে ওঠে একাধারে আভিজাত্যের মাপকাঠি ও অফুরন্ত মুনাফার উৎস। তাই বাঙালি বণিক-ব্যবসায়ী বা অর্থবানেরা নিরাপদ মুনাফার লোভে জমিতে বিনিয়োগ আরম্ভ করে। আবার জমি থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি পণ্য উৎপাদন বা কারখানায় বিনিয়োগের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় তাও আবর্তিত হয় বা আবদ্ধ থাকে ভূসম্পত্তি বৃদ্ধির কাজেই। তাদের সঞ্চিত টাকা শিল্পের সক্রিয় পুঁজি হয়না। জমিদারি কেনা-বেচা, বন্ধকী আর মহাজনী কারবারেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামন্ত্রতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের মতো দেশে, তেমন কোনো প্রতিকল্প গড়ে ওঠেনা বাংলায়।

নতুন ভূমিব্যবস্থা ও শিল্পনীতির অভিঘাতে অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সামাজিক গঠনকাঠামোতে বদল আসতে শুরু করে। প্রাক-ব্রিটিশ পর্বের গ্রামসমাজের কৃষি-শিল্পের সমবায়ী অর্থনীতিভিত্তিক যে চেহারা ছিল তা বিপর্যস্ত হতে থাকে ক্রমাগত। কোম্পানি সৃষ্ট নতুন জমিদারশ্রেণি মূলত বসতি জমাতে থাকে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহরে। তাদের মাধ্যমে প্রস্তুত হয় নগর-সংস্কৃতির ভিত। এবং কৃষক-প্রজা ও গ্রামের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমে বাড়তে থাকে। এই বদল বা বিপর্যয় প্রসঙ্গেই, অশোক সেন, তাঁর "বাংলার অর্থনীতি : বাঙালির উনিশ শতক" প্রবন্ধটিতে বলছেন-

> ব্যাপক হস্তান্তরের ফলে জমিদার শ্রেণির গড়ন্‌টাই পাল্‌টে যাচ্ছিল। আগেকার জমিদার মাত্রেই প্রজাহিতৈষী ছিলেন, তার খুব প্রমাণ নেই। তবে ভূমিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ভাবাদর্শটা আলাদা ছিল। স্তরে স্তরে, বৃত্তিতে বৃত্তিতে সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য অনুসারে অবশ্যই বাস্তবিক বৈষম্যে চিহ্নিত ছিল আগেকার গ্রামসমাজ। পার্থক্য এই যে রাজার দাবি, রাজস্ব

> সংগ্রহে রাজপ্রতিনিধি জমিদার তথা অন্য কোন ভূম্যধিকারীর কর্তৃত্ব, আবার কৃষকের চাষাবাদের ধারাবাহিক অধিকার কোন কিছুই কারও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ছিল না। যেন এক কৌমের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতায় নিহিত থাকে আগেকার গ্রামসমাজের অবলম্বন। তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মে আচরণের স্বাধীনতা অনেক বাড়ছে। কিন্তু যৌথ নির্ভরতার অনুষঙ্গ ভেঙে পড়ায় সামাজিক শূন্যতার দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষত তেমন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা কোনো সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরের ব্যাপ্তিতে গ্রথিত হয় না।[24]

বস্তুত "ব্যক্তিগত সম্পত্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা কোনো সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তরের ব্যাপ্তিতে গ্রথিত হয় না" বা হতে পারে না কারণ পূর্ববর্তী সামন্ততন্ত্রের কৌম অবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করলেও তার পরিবর্তে পুরোপুরি ধনিকতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও গড়ে উঠতে পারেনা। ইংল্যান্ডে কৃষির উদ্বৃত্ত পুঁজি যেভাবে শিল্পকে সমৃদ্ধ করে ধনতন্ত্রকে বিকশিত করার সুযোগ পায়, পরাধীন বাংলার ব্রিটিশ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে দেশীয় পুঁজির স্বাধীন বিকাশ বা বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়না। ফলস্বরূপ জমিদারি বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া, সুদের কারবার, কোম্পানির কাগজ কেনাবেচাতেই স্থাণু হয় বাঙালি অর্থবানদের পুঁজি। তৈরি হয় অলস-উদ্যমহীন এক জমিদারশ্রেণি। ইউরোপের মতো বুর্জোয়া বিপ্লব বা ধনতন্ত্র কিছুরই সুষম বিকাশ ঘটেনা। তাই ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্র ও বণিক শ্রেণির উত্থানের সময় যেভাবে ধনিক উদ্যোগে উৎসাহী একটি 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, এদেশে তা হয়না। বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য উপস্বত্বে বিভাজিত ছোট ছোট জমিদারিকে আশ্রয় করেই বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় তালিম নিয়ে বিভিন্ন সরকারী চাকরি হয়ে ওঠে এদের আশ্রয়। বিশেষত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১০০ টাকার উপরের

---

[24]অশোক সেন, "বাংলার অর্থনীতি : বাঙালির উনিশ শতক", *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চোধুরী (সম্পা.) (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩), পৃষ্ঠা- ৪২।

বেতনের চাকরিতেও ভারতীয়দের নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন তখন সেটিকে আশ্রয় করেই এই শ্রেণি পুষ্ট হয়। এবং ক্রমেই ইংরেজি/ইউরোপীয় শিক্ষার আভিজাত্যের খাতিরে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তারা জমিদারদেরই সমকক্ষ হয়ে ওঠে। পরিচিত হয় 'নব্য' শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণি হিসেবে। তবে জমির উপর নির্ভরতা বা দুর্বলতা তাদের রয়েই যায়। নিরাপদ মুনাফা অর্জনের দুর্নিবার আকর্ষণ বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বা সরকারী চাকরিজীবী মধ্যবিত্তদেরও জমির ব্যপারে উৎসাহী করে তোলে। ফলে, ১৮৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দের প্রশাসনিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলায় উকিল, ব্যারিস্টার, আমলা, শিক্ষক সকলেই কিছু না কিছু জমির অধিকারী। ফলে এদেশের মধ্যবিত্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতীক হয়না, বরং আধা সামন্ততান্ত্রিক আর অসম্পূর্ণ ধনতন্ত্রের জটিল পাকেচক্রে দোলায়মান থাকে তাদের অবস্থান। তাদের অবস্থানের বাস্তবটিকে, আরও গভীরভাবে বুঝতে এবার আমরা চোখ রাখব ঔপনিবেশিক বাংলার শিক্ষানীতিটির উপর।

(৪)

ভারতে ঔপনিবেশনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, শাসনের সঙ্গে শিক্ষার ওতপ্রোত অবস্থানের বিষয়ে পরমেশ আচার্য বলেন-

> যুদ্ধ জয়ে বন্দুক-কামানের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও বিজিতের উপর বিজেতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরো আনুষাঙ্গিক আয়োজনের প্রয়োজন হয়। ক্লাইভ দেশটা জয় করেছিল

> প্রধানত বন্দুক ও কামানের জোরে। কিন্তু চার্লস গ্র্যান্ট, আলেকজাণ্ডার ডাফ, বেরংটন মেকলে, ট্রাভেলিয়ান, বেন্টিঙ্ক প্রভৃতি যাজক বা ব্রিটিশ আধিকারিকদের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ব্যতীত এদেশে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া বুঝি সম্ভব হত না...অবশ্যই এই প্রচেষ্টা সফল হতো না যদি উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক সমাজপতিদের আনুগত্য ও সহযোহিতা অর্জন সম্ভব না হতো। এই আনুগত্য ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছিল ইংরেজি মাধ্যম পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, সে বিষয়েও বুঝি সন্দেহের অবকাশ নেই।[25]

এই উদ্ধৃতির সূত্র ধরে বলা যায়, উপনিবেশ বিষয়ক এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা দেখেছিলাম, ঔপনিবেশিক শাসনের জাল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের সমান্তরালে উপনিবেশিতের মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক দুনিয়াকেও এমনভাবে অভিভূত করতে চায় যে উপনিবেশের একাংশ উপনিবেশকেরই সহযোহী ও অনুগত হয় ওঠে। বাংলায় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপনের রাজনৈতিক-প্রশাসন-অর্থনৈতিক পর্বের পূর্ববর্তী পাঠেও আমরা দেখেছি, এদেশে এসে শুরু থেকেই দেশীয় একটি শ্রেণির সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের আঁতাত তৈরি হয়েছে, যারা শাসনপ্রক্রিয়াকে চালু রাখতে জরুরি ভূমিকা নিয়েছে। এই শ্রেণিই কোম্পানির দালাল-গোমস্তার কাজ করেছে, নতুন প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায় জমিদার বা মধ্যবিত্ত/ভদ্রলোক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, কলকাতা শহরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা শুরু করেছে। মূলত এই সুবিধাভোগী ‘বাঙালি ভদ্রলোক সমাজপতিদের’ তৎপরতাতেই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের বুনিয়াদও তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর শাসনক্ষমতা যখন নবাবের হাত থেকে ক্রমশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হচ্ছে তখন এদেশের তথা বাংলার শিক্ষা মূলত তিন ধরনের

---

[25]পরমেশ আচার্য, “বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তাঃ উনিশ শতক”, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চোধুরী (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* পৃষ্ঠা- ২২৮।

প্রতিষ্ঠান নির্ভর ছিল – সংস্কৃত শিক্ষার টোল, আরবি-ফার্সি শেখার মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য পাঠশালা ও মক্তব। ভারতে পা রাখার পর, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো বণিক সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পণ্যের বেচাকেনা ও বাণিজ্যিক মুনাফা। তাই কোম্পানির আমলের প্রথম বেশ কিছু বছর মূলত অতিবাহিত হয়েছিল রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারেই - নব্য অধিকৃত ভূখণ্ডের অর্থসম্পদ আহরণ এবং অপহরণে। বস্তুত ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর, ব্রিটিশ শাসকদের একাংশের মনে হয়েছিল শিক্ষাবিস্তারই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কারণ। এবং কোম্পানির কর্তারা আশঙ্কা করে, ভারতে আমেরিকার কায়দায় ইউরোপীয় শিক্ষা চালু করলে ভারতবাসীও অচিরেই স্বাধীনতা দাবি করবে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সরা জানান, “That one of the leading and most efficient separation of America from Great Britain, as the anothers country, was the founding of Colleges and establishing seminaries for education in different provinces. Sound policy dictated that we should in the case of India avoid and steer clear of the rock we had split upon in the case upon America.”[26] তবে এরই মধ্যে ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই কলকাতার বণিক সমাজ ও ধনীদের একাংশের মধ্যে বৈষয়িক গরজে ইংরেজি শেখার তাগিদ জন্মেছিল। এবং সেই সুযোগে উনিশ শতকের প্রারম্ভেই কিছু ‘ফিরিঙ্গী’-র স্ব-উদ্যোগে কলকাতায় কিছু ইংরেজি পাঠশালা তৈরি হতে শুরু করেছিল। যেমন চিৎপুর রোডের শেরবোর্নস সেমিনারি স্কুলের ছাত্র ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। আমড়াতলার মার্টিন বাউল স্কুলের ছাত্র ছিলেন শ্রী মতিলাল ঘোষ।

---

[26]Ram Gopal Sanyal, *A general biography of Bengal celebrities: both living and dead* (Kolkata: Uma Churn Chucker Butty, 1889), পৃষ্ঠা- ১২৮.

ডুমণ্ড একাডেমি বা ধর্মতলা একাডেমির ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও। পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত "সেকালের কলকাতার ইংরাজী স্কুল" প্রবন্ধে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ তৈরির আগে বাংলায় এরকম ৩৪টি স্কুলের তালিকা পেশ করছেন। কিন্তু এসবই ছিল ব্যক্তিগত-বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। কিন্তু পলাশী-বক্সারের যুদ্ধ জেতার পর কোম্পানি আর নিছক বণিক-সংগঠন থাকেনি, ক্রমশ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক শক্তি হিসেবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাদের শাসনজাল বাংলা সহ প্রায় সমগ্র দেশে বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। স্বভাবতই এদেশের শাসনভারকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে এদেশের মানুষের শিক্ষাবিধি সম্পর্কে তাদের ভাবনাচিন্তা শুরু করতে হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে, সেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তারা প্রচলিত আরবি, ফার্সি, সংস্কৃতের উপরই জোর দিতে চেয়েছিল। দেশীয় জনগণের সনাতনী ধর্ম-কর্ম-শিক্ষা-দীক্ষার উপর কোনো পরিবর্তন আনতে সাহস করেনি। সেই সূত্রেই ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্‌সের নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং মূলত প্রশাসনিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানি ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বস্তুত এইসময় থেকেই কোম্পানির কর্মচারীদের একাংশের মনে ভারতে ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষারীতি এবং ইংরেজি পঠন-পাঠন প্রচলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যদিও শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থাৎ দেশীয় প্রচলিত রীতি মেনেই আরবী-ফার্সি-সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না কি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হবে সেই নিয়ে প্রাচীনপন্থী ও পাশ্চাত্যবাদীদের টালবাহনা শুরু হয়। এই মতদ্বৈধ থাকার কারণেই ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদে যখন ভারতবাসীর শিক্ষার খাতে প্রথম অনধিক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় তখনো শিক্ষাবিষয়ক কোনো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যেই রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে কিছু ধনী

উচ্চবর্গীয় হিন্দুর আনুকূল্যে ইউরোপীয় রীতির শিক্ষাদানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি অভিজাত হিন্দুর একাংশ, এযাবৎ যাঁরা উচ্চপদের আশায় ফার্সি শিখেছিলেন তাঁরা উপলব্ধি করেন, কোম্পানির আমলে নতুন রাজশক্তির সঙ্গে যোগসূত্রের ভাষা হিসেবে ইংরেজির অনন্ত সম্ভাবনার কথা। ফলত তাঁরা একপ্রকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ইংরেজি ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা নির্মাণ করে নিতে চেয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারী অনুদান ছাড়াই, তেজচন্দ্র বাহাদুর, গোপীমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখের বদান্যতায়, কলকাতার বুকে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় শ্রীরামপুর কলেজ। সেই একই বছর যথাক্রমে সরকারী উদ্যোগে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিভিন্ন স্কুলগুলিকে সরকারী অনুদান দেবার উদ্দেশ্যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির কর্তারা যদিও তখনও ভারতীয়দের ইংরেজি ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। বরং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই জুলাই কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য যে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন তৈরি করে, তার দশজন সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক। ফলত ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য প্রভূত অর্থ বরাদ্দ হয়। আগ্রা ও দিল্লিতেও নতুন প্রাচ্যবিদ্যার কলেজ তৈরি হয়। সেখানে সংস্কৃত ও আরবিতে মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে। ইংরেজি থেকে সংস্কৃত ও আরবিতে বই অনূদিত হতে থাকে। কলকাতা মাদ্রাসা এবং বেনারসের সংস্কৃত কলেজকে পুনর্গঠিত করার পাশাপাশি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয়দের নিজস্ব ভাষায় ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি এই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তথা পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষা সম্পর্কে অনীহা; ইংরেজি শিক্ষার অন্যতম সমর্থক রামমোহন রায় স্বভাবতই মেনে নিতে

পারেননি। লর্ড আর্মহার্স্টকে লেখা তার সেই বহুচর্চিত চিঠি লেখা হয় এ সময়েই। যেখানে তিনি ভারতীয়দের ইউরোপীয় গণিত, দর্শন, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি জরুরি ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে পরচিতি ঘটানোর অনুরোধ জানান। তিনি লেখেন,

> We would therefore be guilty of a gross dereliction of duty ourselves, and afford our rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occassions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be benefecial to the counntry, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.[27]

আর্মহার্স্ট রামমোহনের ইংরেজি ভাষার দক্ষতায় মুগ্ধ হলেও সে চিঠির জবাব আসেনি। সরকারীভাবে ইংরেজির স্বীকৃতি পেতে লেগে গিয়েছিল আরও ১১ বছর। কিন্তু বাঙালির পাশ্চাত্যবীক্ষার ইতিহাসে, সে ‘চিঠি’-র গল্প বারবার ফিরে এসেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* –এ- “প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা” অধ্যায়ে বলছেন, “রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আর্মহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন।”[28] অন্তত একাংশের স্বদেশবাসীদের মুখ ও মন যে সত্যিই পশ্চিমমুখী হতে শুরু করেছিল, বিশেষত বিদেশী সরকারের কাছে চাকরি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যার ‘সারবত্তা’ সম্পর্কে তাঁরা ক্রমেই সন্দিহান

---

[27]শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃষ্ঠা- ৫৬।

[28]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৬।

হয়ে পড়ছিলেন যার প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন সাময়িকপত্রের পাতায় পাতায়। এবং ইংরেজদেরও “সাম্রাজ্য শাসনযন্ত্র ও বাণিজ্য শোষণযন্ত্র” যত বিস্তৃত হচ্ছিল তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারীদের প্রয়োজনও ততই প্রবল হচ্ছিল। কোম্পানি বুঝেছিল বিলেত থেকে কর্মচারীদের নিয়ে আসার থেকে অনেক বেশি লাভজনক অল্প মাইনেতে ভারতীয়দের সেইসব পদে নিয়োগ করা। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, তাই কোম্পানির সনদ্ নবীকরণের সময়, সরকারের অধীনস্থ উচ্চ পদগুলিকে ইংরেজদের পাশাপাশি ইংরেজি জানা ভারতীয়দের জন্যেও উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন আইন তৈরি হয়, যার ৮৭ নং ধারায় বলা হয়, “And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of his Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office or employment, under this and said company.”[29] এমতাবস্থায়, খোদ সংস্কৃত কলেজের (বলাবাহুল্য যে কলেজ তৈরি হয়েছিল সরকারী অর্থ ব্যয় করেই) প্রাক্তন ছাত্ররাই, চাকরির বাজারে তাদের দিশাহীনতার কথা জানিয়ে চিঠি লেখে এডুকেশন কমিটিতে, *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায়, ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ-

শ্রীযুক্ত এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারি সাহেব বরাবরেষু।

গভর্নমেন্টের সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনাকার অতি সম্ভ্রান্ত কমিটির নিকটে অতি বিনয় পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০/১২ বৎসরাবধি গভর্নমেন্টের সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্রে উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমাদের অধিককাল গত হইয়াছে এবং ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সার্টিফিকেটও পাইয়াছি।

[29] *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃষ্ঠা- ৭৫।

> কিন্তু তদ্রূপ সার্টিফিকেট পাইয়াও আপনাকার অত সম্ভ্রান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে আমাদের বর্ত্তমানাবস্থায় মঙ্গল হওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমাদের প্রতি স্বদেশীয় মহাশয়েদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাঁহাদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের আর কোন গতি নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান প্রধান সাহেবদের অনুগ্রহ ব্যতিরেক হয় না অতএব আমরা আপনকার অতি সম্মানিত কমিটির নিকটে অতি বিনীত পূর্বক নিবেদন করিতেছি যা আপনারা শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলে এমন পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্মশিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন।[30]

শাসকবর্গও অনুভব করে যে শাসনপ্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু এবং দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজদের ভাষা-সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপন জরুরি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, শিক্ষা কমিটির তৎকালীন সভাপতি মিঃ টি.বি.মেকলে তাঁর সেই অতিচর্চিত শিক্ষা সংক্রান্ত মিনিটটি পেশ করেন। উপনিবেশিত বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনন-চেতনের নির্মাণে ও নিয়ন্ত্রণে যা নানামাত্রায় ‘ঐতিহাসিক’ হয়ে ওঠে। প্রাচ্যবাদীদের যাবতীয় যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, মেকলে জানান, প্রাচ্যের ভাষা না জেনেও একথা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে, ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের কাছে প্রাচ্য নেহাতই নিঃস্ব –

> I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done what I could do to form a correct estimate of their values. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in Eastern tongues. I am quite ready to take the

---

[30]পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃষ্ঠা- ১৫৬।

> Oriental learning at the valuation of the Orientalises themselves. I have never found one among them, who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.[31]

ফলত তাঁর মনে হয়, সরকারী প্রশ্রয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রাচ্যজ্ঞানের পিছনে সময় নষ্ট করা যুক্তিহীনমাত্র-

> ...I think it is clear that we are not fettered by any pledge expressed or implied; that we are free to employ our funds as choose; that we ought to employ them to teaching what is best worth *knowing*; that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic; that the natives are desirous to be taught English and are not desirous to be taught Sanskrit or Arabic; that neither as the language of law nor as the language of religion, have the Sanskrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement; that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars; and that to this end our efforts ought to be directed.[32]

বরং ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্য বিস্তার তথা কায়েম রাখার জন্যে, ভারতীয়দের চিরকাল ইংরেজের প্রতি অনুগত করে রেখে দেওয়ার জন্যই আদতে ভারতীয়দের (একাংশের) মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রবিস্তার প্রয়োজন- "We must at present do our best to form a

---

[31] *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃষ্ঠা- ১০২।

[32] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১।

class who may be interpreters between us and millions, whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and intellect.”[33] যদিও কোম্পানির পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিয়ে বাগ-বিতণ্ডা এত সহজে থামেনি। মেকলের বক্তব্যকেও প্রাচ্যবাদীরা এত সহজে মেনে নেয়নি। বরং কমিটির সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য লিখিতভাবে দাখিল করেছিল। অবশেষে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ মেকলের অভিমতকে গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সম্পূর্ণ অর্থই ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করার কথা ঘোষণা করেন। এবং মেকলে যে তাঁর অভীষ্ট সেই একদল অতি অনুগত দোভাষী-কর্মচারী, ‘ব্রিটিশ-রুচি’-র মানুষ তৈরিতে অনেক দূর অবধি সফল হয়েছিলেন তার সাক্ষী থেকেছে এদেশের ইতিহাস। মেকলের বয়ানের শাসকসুলভ ‘ঔদ্ধত্য’ আদপেই ইংরেজি শিখতে অতি তৎপর বাঙালিকে তেমন বিচলিত করেনি। বরং প্রাচ্যের সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে শাসকের অবজ্ঞা-অভক্তি যে বহুলাংশে ছড়িয়ে গিয়েছিল শাসিতের চৈতন্যে, সে স্বীকারোক্তি শিবনাথ শাস্ত্রীই করে গেছেন,

> বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দু কলেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে,- এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া

---

[33]প্রাগুক্ত।

> Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ, বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।...নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষগুরু মেকলে। তিনজনই তাহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন;- প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোঁক বঙ্গসমাজে বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।[34]

বস্তুত বাঙালি ধনী-উচ্চবর্গ মেকলের নীতি প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই ইংরেজি শিক্ষানীতির সমর্থক ছিল। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্তের পর কলকাতা ও তার বাইরে – ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, হিন্দু ফ্রী স্কুল, হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইনস্টিটিউশন, টাকী স্কুল, মাহেশপুর ইংরেজি পাঠশালা, মুর্শিদাবাদ ইংলণ্ডীয় পাঠশালা, শান্তিপুর একাডেমি প্রভৃতি প্রচুর স্কুল তৈরি হয়েছিল। এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কলকাতা শহরে বেসরকারী উদ্যোগেই প্রায় ৬০টিরও বেশি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সরকারী তরফে ও উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী এডুকেশন সেক্রেটারী ফ্রেদ.জে.মোর্টের স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে, মেডিকেল কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। বলা হয়, "All candidates will be expected to possess a competent knowledge of English, so as to be able to read, write and enunciate with fluency and facility. They must be able to analyse a passage in Milton's paradise lost, Robertson's Histories of works of a similar classical standard."[35] এবং কলেজ ছাত্রদের ইংরেজিচর্চার সমান্তরালেই যে বেড়ে চলেছিল বাংলা বিষয়ে অনিচ্ছা ও আড়ষ্টতা, সে প্রমাণও মিলছিল ভূরিভূরি। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে

---

[34] *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃষ্ঠা- ১০২।

[35] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*,পৃষ্ঠা- ১৬৩।

বাংলা ভাষার পরীক্ষা নেওয়ার পর রামকল সেন হিন্দু কলেজের ইংরেজি ভাষায় অতি দক্ষ ছাত্রবৃন্দের ছাত্রদের বাংলা চর্চার অনীহা বিষয়ে বলেন- "They appear to understand English better than their own language, to which they attach little or no interest in comparison with English."[36] নব্য যুবাদের বাংলা জ্ঞানের বহর সম্পর্কে *সংবাদ ভাস্কর*-এ যেমন বক্রোক্তি বেরোয়, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী– "আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম পাদস্পর্শ করেন এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলি যাহা লেখেন তাহা যেন কাকা বকের নখ চিহ্ন সাজাইয়া যান, যে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং অনেক চিন্তায় মর্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকের গলদঘর্ম হন।"[37] এই খেদোক্তি শুনতে শুনতে, আমাদের নির্বাচিত বেশ কিছু ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংরেজিতে লেখার কারণও আমরা কিন্তু বেশ বুঝতে পারি। বস্তুত গৌরী বিশ্বনাথন উপনিবেশের এই একপেশে শিক্ষানীতির রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করছেন তাঁর *Mask of Conquest: Literary Study and British Rule in India*[38] বইটিতে । তিনি দেখাচ্ছেন, ঔপনিবেশিক স্কুল-কলেজের পাঠ্যপদ্ধতিতে, ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে কীভাবে নৈতিক উৎকর্ষের ধারণাকে ওতপ্রোত করে তোলা হয়।[39]

---

[36] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ১৬৩।

[37] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ১৬৩।

[38] Gauri Viswanathan, *Masks Of Conquest: literary Study and British Rule in India* (New Delhi: Oxford University Press, YMCA Library Building, 2000).

[39] তিনি লিখছেন, "The questions in the government institutions shied away from direct reference to religion, but they were no less oriented toward making Indian youth concsious of the benefits of British rule, as with these topics; "The Effects upon India

ফলত ছাত্রদের কাছে ইংরেজি চর্চা নিছক নতুন ভাষা শিক্ষা থাকে না, এর ভেতর দিয়ে তারা শাসক ও শাসকের ভাষা দুটিরই শ্রেষ্ঠত্বকে আত্মস্থ করে নিতে শুরু করে। এবং শক্তিশালী ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা যে অনিবার্য ভবিতব্যমাত্র, সুদক্ষ ও নীতিপরায়ণ শাসকের আশ্রয়ই যে পরাধীন ভারতবাসীর পুনরুত্থানের এক ও একমাত্র উপায়, সে বিষয়ে তাঁদের বিশেষ দ্বিধা থাকেনা। পরীক্ষার প্রশ্নের প্রকৃতিও এমনভাবে সাজানো হয় যাতে ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজ শাসনের মহিমা সম্পর্কে ছাত্রদের মান্যতা আদায় করে নেওয়া যায়।

উপনিবেশের সার্বিক ইতিহাস অবশ্য শুধু এই অধীনতার নিরিখে পাঠ করে ফেলা যায়না, সেখানে অধীনতার সঙ্গে থাকে বিরোধিতার নানা আভাস। এবং আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে উচ্চবর্গীয় হিন্দু/ব্রাহ্ম শ্রেণি তাঁদের অবস্থানকেও দেখা-বোঝা দরকার এই দ্বন্দ্বিকতার সাপেক্ষে। কারণ উপনিবেশিক শাসনকে যেমন তাঁরা বৈষয়িক গরজ মেটাতে একসময় সাদরে আহ্বান করেছিলেন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নানা বিসম নিয়মনীতি যখন সেই বৈষয়িক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে বা আত্মসম্মানকে নানা ভাবে আহত করেছে, তখন তাঁদের

---

of the New Communication with Europe by means of Stream." "The Advantages India derives in regard to commerce, security of property, and the diffusion of knowledge, from in connexion with England," and "The Diffusion of Knowledge through the Medium of the English Language in India."

The answers that students wrote to these questions cannot be taken, of course, as indicative of their actual responses to the content of instruction. The nature of institutionalized education, with the pressure to compete for promotion and awards and prizes, is obviously too complex to permit us to read student essays categorically as personally felt, intelectually commited responses. selections from student essays are not reproduced below as proof of either success or failure of the British ideology, but to indicate the degree of correspondence between the objectives of instruction and the internalization of what students clearly sensed as desirable response to the content of instruction." (পৃষ্ঠা- ১৩৬)

শাসক বিষয়ক ভাবনাতেও নানা ধাক্কা লেগেছে। এবং ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠা নানা বিশ্বাসেও বদল এসেছে। উপনিবেশিত বাঙালির মননকে বুঝতে শাসকের সঙ্গে সম্পর্কের এই বদলায়মান সমীকরণটিকে উপেক্ষা করলে আবশ্যই চলবে না। এবং সম্পর্কের এই প্রেক্ষিত বদল এবং সেই সূত্রে অনিবার্যভাবে জন্ম নেওয়া শাসিতের আত্মপ্রতিরোধের প্রসঙ্গটিকে বুঝতে আমরা এইবার চোখ রাখব এই আলোচনার পরের অংশে।

(৫)

এই অধ্যায়ে আমরা বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা করার সময়েই দেখেছিলাম, ঔপনিবেশিক আবহে কীভাবে শাসকের উন্নতির সঙ্গে উপনিবেশিতের অবনতি এক দ্বান্দ্বিক সমাপতন লাভ করতে শুরু করেছিল। বস্তুত বাংলায় এই শোষণ তথা বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতকেই- কোম্পানির নানা জোরজুলুম, খাজনা বৃদ্ধি, ভূমিব্যবস্থা, জমিদার ও মহাজনী অত্যাচারের বিপক্ষে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যার মাত্রা আরও বেড়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল মূলত বাংলার কৃষক-কারিগর এবং বিভিন্ন জনজাতিরা। এই বিক্ষোভে, আমাদের আলোচনার উদ্দিষ্ট যে ইংরেজি শিক্ষিত ‘নব্য’ বাঙালি, যে শ্রেণি নির্মিতই হয়েছিল মূলত ব্রিটিশদের স্বার্থে, তাদের ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমিত ছিল রাজানুগত্য প্রদর্শনে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, *বেঙ্গল স্পেক্টেটর*-এর পাতায় যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, “এতৎ সভার মত এই যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত

হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবে না, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।”[40] সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয় যে, “এই সভার সভ্যেরা রাজদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করে ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করবেন।”[41] ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করে কলকাতায় ফিরলে, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওই বছরই ৭ই মার্চ তাঁদেরকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ সহ ১৫৫৭ জন। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের উত্তপ্ত আবহেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষেই উচ্চকিত কলম ধরেছেন, কোম্পানির শাসনের দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে বিদ্রোহকে নিন্দা করে, সরকারকে যাবতীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো হুমকি দিয়ে *সংবাদ ভাস্কর*-এর সম্পাদকীয় ছাপা হয়, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন –“আগ্রা, দিল্লী, কানপুর অযোধ্যা লাহোরাদি প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদিগের আড্ডায় আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট সিপাহি ধর অধ্বরাবন্দ করিয়াছেন,

---

[40] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২২৪।

[41] প্রাগুক্ত।

আর বিদ্রোহি সিপাহি সকল শোন্ শোন্ তোদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর ক্ষমা করুন।”[42]

তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, ভারতীয় জমিতে ব্রিটিশদের মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার পর বাংলার জমিদাররা যখন পর্যুদস্ত হতে শুরু করেছে নীলকর সাহেবদের কাছে, যখন উপনিবেশের অসম বাণিজ্যরীতিতে, বিদেশীয় লগ্নির সামনে দেশীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে বা যখন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ক্রমশ উচ্চ চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছে, তখন থেকেই ব্রিটিশ বিষয়ে নিখাদ মুগ্ধতা টাল খেতে শুরু করেছে তাদের। ঔপনিবেশিক শাসনের মোড়কে শোষণের ছবিটা যত স্পষ্ট হয়েছে, এদেশীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের বিসমতার বাস্তবটিও ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। উপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের পারস্পরিক জাতি-বৈর সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই সচেতন ও সরব হয়েছেন। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-তে, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি লেখায়, সাহেব ও বাঙালির বদলায়মান সমীকরণটিকে চিহ্নিত করে বলা হয়, “সূক্ষ্মদর্শী দেখিবেন যে ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হয়ে উঠিতেছে। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালিকে পদানত রাখা, বাঙ্গালির ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান। কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদানত রাখা, আর কাহার অন্যের পদানত থাকতে ইচ্ছা করে/ চোখ পাকান, অন্তর টীপনি, উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যেরূপ বাঙ্গালিকে অনায়াসে করায়াত্ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায় না, কাজেই ইংরাজদিগের বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে।”[43] বস্তুত ঔপনিবেশিক শোষণ আর বৈষম্যের ছবিগুলি যতই ধরা পড়তে শুরু করেছে আহত-অপমানিত উপনিবেশিত মননে ‘আত্মচেতনা’ ততই স্পষ্ট হয়েছে। এবং ‘ন্যায়ের ধ্বজাধারী’ ব্রিটিশ ‘প্রভু’-র নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের

---

[42] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২৪৭।

[43] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২২৭।

প্রতি ক্ষুব্ধ বিস্ময় জেগে উঠেছে। ১৫ই জুলাই, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-তে যেমন সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইংরেজদের অন্যায্য ব্যবহার সম্পর্কে লেখা হয়,

> সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় যদিও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস কমিশনারগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন তবু আমরা তাঁহাকে এখন পর্যন্ত হারাই নাই। তিনি যাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে যে সমুদায় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অকাট। সদ্বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিবেন। কমিশনারগণ তাঁহাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন বা না করুন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে মুক্ত করিবে। ওদিকে ইংরেজ জাতি, যাঁহার আপনাদের মহত্ত্ব দেশ বিদেশে রচনা করিয়া বেড়াইতেছেন, সুসভ্য জাতির নিকট চির কলঙ্ক পাশে আবদ্ধ হইবেন।[44]

আমরা বুঝতে পারি, কিছুক্ষণ আগেই গৌরী বিশ্বনাথনের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে আমরা উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শাসিতের মনে শাসকের নৈতিক উৎকর্ষ বিষয়ে সম্মান তথা সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার যে দিকটি দেখেছিলাম; আদতচিত্র কিন্তু অনেক সময়েই তার থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। বই-এ পড়া ‘সভ্যতা’-র পাঠের সঙ্গে ‘সুসভ্য জাতির’ বাস্তব হাবভাবের গরমিল নব্য বাঙালিকে ক্রমশ হতাশ করে। এবং ন্যায়ের মানদণ্ডে যে শাসক আর শাসিতের সহাবস্থান সম্ভব নয়, সে বিষয়টিকেও তাঁরা রীতিমতো অনুধাবন করতে শুরু করেন। *সুলভ সমাচার* যেমন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সরকারের আচরণগত বৈষম্যের বিষয়ে লেখে-

[44] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২৩২।

> সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ সামান্য অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন, ইংরাজ সিবিলিয়ানেরা ইহার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিয়া উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। এই সকল অবিচারেই ইংরাজদিগের প্রতি সাধারণের অভক্তি হয়। সুরেন্দ্রবাবুকে সামান্য দণ্ড দিলে আমরা দুঃখিত হইতাম না। একেবারে কর্ম্মচ্যুত করা লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে, সুরেন্দ্রবাবু সুবিচারের জন্য বিলাত গিয়েছেন, তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সাতসমুদ্রে জল খাওয়াই সার হইল, এখন যদি ব্যরিস্টার হইতে পারেন তবে বিলেত যাওয়া সার্থক হইবে।[45]

এবং এই বৈষম্যনীতির সূত্র ধরেই বাঙালির সাহেব-অনুকরণের আতিশয্যের বহরকেও রীতিমতো ভর্ৎসনা করে বলা হয়- "যাঁহারা সাহেবের পোষাক পরিয়া সাহেবদের সঙ্গে সমান হইতে চান, তাঁহারা ইহা শিক্ষা করুন যে সুরেন্দ্রবাবু সাহেব সাজিয়াও বাঙালির ন্যায় দণ্ড পাইলেন। তবে দেশশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া শোলার টুপি মাতায় দিয়া লাভ কি?"[46] (*সুলভ সমাচার*, ৩০শে বৈশাখ, ১২৮১ সাল) বস্তুত শাসক বিষয়ে এহেন বিরূপতাই ক্রমশ এই নব্য বাঙালিকে নিজেদের অস্তিত্ব ও অবস্থানের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের নানাবিধ বৈষম্যগুলি তাঁদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করে। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে পাতা ভরাতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৭ই পৌষ, *সমাচার সুধাবর্ষণ*-এ যেমন (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের পুনরুত্থানের মাধমে বাঙালিকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কথা লেখা হয়-

---

[45] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)* , পৃষ্ঠা- ২৩২।

[46] প্রাগুক্ত।

উঠ হিন্দু বীরগণ
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ
যায় রাক্ষসে লইয়া
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া
কেহ দ্রব্য বহুমূল্য!
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসলা অতুল্য।।[47]

উপনিবেশিত বাংলার দুঃসহ অর্থনৈতিক পরিণতি, বাংলার ধন বিদেশীদের কাছে হস্তান্তর এবং এবং বাঙালিদের ক্রমেই ইংরেজদের ‘মুটে চাকর’-এ পরিণত হওয়া সম্পর্কে *সংবাদ প্রভাকর* ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখে,

> বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহণে বিদেশবাসিনী হইতেছেন। এ দেশের লোকে লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে যে লোক ইতস্ততঃ চীনাকোট, চাঁদনীর জুতা, শীল, আংটি, গার্ড, চেইন ও বাঁকা সিঁতি দর্শন করিয়া অহঙ্কার করে সেটি কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। দেশের ধন বিদেশে যাইতেছে, দেশের লোক ফকীর হইতেছে, এই দুর্ভাগ্য সকলে অনুভব করিতেছেন না, অনুভব দূরে থাকুক, স্বপ্নেও বোধ হয় সেটি কেহ চিন্তাও করেন না। তাঁহাদিগের দেশ যে দিন দিন অন্তঃশূন্য হইয়া যাইতেছে ইহা ভাবনা করিবার অবসর তাঁহারা ক্ষণমাত্রও প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের ধনে বিদেশের লোক বড় মানুষ হইতেছে...বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন। মুটেরা তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত মহামূল্য রত্নজাত মাথায় করিয়া বিদেশীর বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা সহাস্য বদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী রত্নের তেরিজ জমাখরচাদি শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে।[48]

---

[47] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২৩৫।

[48] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ(১৮১৮-১৮৭৮)*, পৃষ্ঠা- ২৩৪-৩৫।

শুধু অর্থনৈতিক জুলুম বা শোষণ নয়, ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা-পরিকাঠামোর অপ্রতুলতাও বাঙালিকে বিশেষ ভাবিত করে তোলে।[49] শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বৈষম্য বিষয়ে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে *সোমপ্রকাশ* বলছে-

> ১৮৬০-৬১ অব্দে এই বঙ্গদেশে গভর্মেণ্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা কার্য্যে কেবল লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে দশ আনা পড়ে না। ইংলণ্ডের লোকেরা এত যে সভ্য, সেখানেও গভর্মেণ্টকে প্রতি ছত্রে এক টাকা বার দিতে হয়। বঙ্গদেশীয় গভর্মেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে এত কৃপণতা করিতেছে কেন? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রজারা বিদ্বান হইলে গভর্মেণ্ট তাহাতে লাভ জ্ঞান করেন না?[50]

শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা নিয়েও *সোমপ্রকাশ* কলম ধরে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে, "এ দেশীয় মুন্সেফদিগের ন্যায় এদেশীয় শিক্ষকেরা পর্য্যাপ্ত বেতন পান না। অথচ তাঁহাদিগের খাটুনি ও পরিশ্রমের ত্রুটি নাই। ইহা কি বেতন বৃদ্ধির শ্রেণি বিভাগ না থাকিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না, ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে একারণ যেমন বলবান, এদেশীয় অন্যত্র সুবিধা হইলে কেন শিক্ষকতা স্বীকারে সমর্থ হন না।"[51] অর্থাৎ মার্কস যেরকম দেখিয়েছিলেন, সব থিসিসেরই একটি অ্যান্টি-থিসিস থাকে, সেরকমই ব্রিটিশ আনুগত্যেরই সমান্তরালে তৈরি হচ্ছিল

---

[49] আমদের আলোচিত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতেও, ব্রিটিশ শাসনের নানাবিধ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভের কথা বারেবারে উঠে আসে। বস্তুত বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে, সেদেশের শিক্ষা-অর্থনীতি-সমাজব্যবস্থার নানা প্রকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত তথা বাংলার অর্থনীতি থেকে শিক্ষা সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থার বাস্তবটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়গুলিতে বিশদে আলোচনা করব।

[50] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮), পৃষ্ঠা- ২৩৮।*

[51] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮),* পৃষ্ঠা- ১৭৪।

উপনিবেশিত উচ্চবর্গের আত্মপ্রতিরোধ, আত্মনির্মাণের তাগিদ- জাতীয়তাবোধ। প্রসঙ্গত ‘জাতীয়তাবাদ’ এর উৎস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসন বলেছিলেন, ‘নেশন’ অর্থাৎ জাতি হল আদতে এক ‘কল্পিত সমাজ’ (Imagined community)।[52] একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ডের মানুষ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা ভিন্নতর হলেও তাদের মধ্যে কিছু সাযুজ্য ও সমন্বয়ের রেখা টানা থাকে যা থেকে ‘নির্মিত’ হয় এক যৌথতার বোধ। এক বাঁধনের সূত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজের নানা প্রয়োজনে এই ‘কল্পনা’ জরুরি হয়ে ওঠে। আবার তা প্রসারিতও হয় ধনতন্ত্রসৃষ্ট নানা প্রচারতন্ত্র ও যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার জাতীয়তাবাদের প্রধান তিনটি[53] রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু উনিশ-বিশ শতকের এশিয়া বা আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে যে জাতীয়তাবোধ বা উপনিবেশ বিরোধী ‘জাতীয়তাবাদী আন্দোলন’-এর জন্ম হচ্ছিল, তার প্রকৃতি বা প্রবণতা সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা তিনি দেননি। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, উপনিবেশিত মানুষের জাতীয়তাবাদ আসলে তাদের ঔপনিবেশিক ‘প্রভু’-দের জাতীয়তাবাদী অভিব্যক্তিরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। পশ্চিমের জাতীয়তাবাদের মডেলগুলিকে সচেতনভাবে অনুকরণ তথা অনুসরণ

---

[52]“It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion....It is imagined as a community, because regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always concived as a deep horizonta; comradeship. Ultimately is it this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of peopple, not so much to kill, as ullingly to die for limited imaginings”

- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and spread of Nationalism.* (London: Verso, 1983.)

[53]বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডারসন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, রাশিয়া এবং আমেরিকা এই তিন জায়গার ভিত্তিতে, জাতীয়তাবাদের স্ফূরণের তিনটি প্রধান রূপের কথা বলছেন- ক্রেওল (আমেরিকা), ভাষা (ইউরোপের বিভিন্ন দেশ), সরকারী (রাশিয়া)

করে, পছন্দসই একটি কাঠামো বেছে নিয়ে, উপনিবেশের দেশীয় উচ্চবর্গেরা (অর্থাৎ ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছিল) তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদলটিকে গড়ে নিচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ইতিহাস-ভূগোলের বাস্তববাহী উপনিবেশগুলির পক্ষে কি আদপেই ইউরোপীয় কায়দার জাতীয়তাবাদের অবিকল অনুকৃতির পথে হাঁটা সম্ভব ছিল? বা তারা হাঁটতে চেয়েছিল? ইউরোপের শিল্প-নির্ভর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রেষারেষির মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদের উত্থান, তার চরিত্রকে কেমনভাবে মেলানো যাবে উপনিবেশগুলির সম্পূর্ণ পৃথক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে? এই জরুরি প্রশ্নগুলিই তুলছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, অ্যাণ্ডারসন আসলে তাঁর আদ্যন্ত ইউরোপমুখী তত্ত্বে আত্তীকৃত করে নিতে চাইছেন উপনিবেশের 'কল্পনা'-র স্বাধীনতাটুকুকেও। বস্তুত বহির্বিশ্বে সাম্রাজ্য বিস্তার তথা আধিপত্য কায়েমের সময় থেকেই ইউরোপ তার উপনিবেশগুলিকে দেখতে চেয়েছিল ইউরোপীয় আত্মের এক নির্বাক-নিষ্ক্রিয় 'অপর' পক্ষ হিসেবে। এই সর্বগ্রাসী আবহে দাঁড়িয়ে, অ্যাণ্ডারসনের ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণেও তাই উপনিবেশের জাতীয়তাবাদ হয়ে ওঠে ইউরোপেরই প্রক্ষেপ, প্রতিবিম্বমাত্র –

> If nationalism in the rest of the world has to choose their imagined community from certain 'modular' forms already made available to them by Europe and the Americas, what do they have left to imagine? History, it would seem, has decreed that we in postcolonialworld shall only be perpetual consumers of modernity. Europe and Americas, the only true subjects of history, have thought out on our behalf not only the script of colonial engagement and exploitation, but also that of our anticolonial resistance and

postcolonial misery. Even our imagination must remain forever colonised.[54]

ইউরোপের এই 'একপেশে' পাঠের বাইরে বেরিয়ে না এলে, উপনিবেশের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পগুলিকে আদৌ বোঝা যাবেনা বলে তিনি মনে করেন। কারণ উপনিবেশিতদের জাতীয়তাবাদ শুরুই হয়েছিল ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে, তাঁর পরিভাষায়, "anticolonial natioanalism।[55] ফলত সেই 'বিরোধ'-কে বাদ দিয়ে শুধু 'অনুকরণ'-এর তত্ত্ব দিয়ে কিছুতেই উপনিবেশী জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাবেনা। এবং এই জাতীয়তাবাদ শুধু রাজনৈতিক অভিব্যক্তি নয় বরং তার ব্যাপ্তি সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-ধর্ম প্রভৃতি জীবনচর্যার নানা স্তরে। উপনিবেশের মানুষ (বা বলা ভালো এলিটগোষ্ঠী) পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা গ্রহণের পাশাপাশি উদ্যোগী ছিল নিজেদের অস্তিত্বের এক পৃথকীকরণে। আর এই দুই বিপ্রতীপ ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই উপনিবেশের anticolonial nationalism-এর বিকাশ ও বিস্তার। তাঁর ব্যাখায়, উপনিবেশিতদের জাতীয়তাবাদী অভিব্যক্তিকে অনুধাবন করতে হবে এক বিভাজনের মানদণ্ডে – বহির্ভূমি (Outer Domain) ও অন্তর্ভূমি (Inner Domain)। বহির্ভূমি তৈরি হয় জাগতিক (Material) নানা ক্রিয়ার সমন্বয়ে – রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এর অন্তর্গত। আর অন্তর্ভূমিতে থাকে নানা অধি-জাগতিক

---

[54]Partha, Chatterjee, *The Nation and Its Fragments* (Princeton: Princeton University Press, 1993).

[55]পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিতে, "I object because I cannot reconcile it with the evidence on aniticolonial colonialism. The most powerful as well as the most creative results of the nationalist imagination in Asia and Africa are posited not on an identity but rather on a difference with the "modular" forms of the national society propagated by the modern West. How can we ignore this without reducing the experience of anticolonial nationalism to a caricature of itself?" (পৃষ্ঠা -৫)

(Spiritual) ভাবনা। যেমন ধর্ম, সামাজিক নীতিবোধ, আচার-সংস্কৃতি ইত্যাদি। উপনিবেশী মানুষ তার বহির্ভূমিতে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণকে স্বাগত জানায় দ্বিধাহীনভাবে কিন্তু অন্তর্ভূমিতে নিজেদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যকে গর্বের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। এবং সেই অন্তরজগতে সে তার শাসকবর্গের কোনোরকম 'অনুপ্রবেশ' মেনে নেয়না, কারণ সেখানে সে নিজেকে সার্বভৌম মনে করতে চায়। এখানেই উপনিবেশের জাতীয়তাবাদের এবং তার 'কল্পিত সমাজ'-এর বিশিষ্টতা–

> In fact, here nationalism launches its most powerful, creative, and historically significant project: to fashion a 'modern' national culture that is nevertheless not Western. If the nation is an imagined community, then this is where it is brought into being. In this, its true and essential domain, the nation is already sovereign, even when the state is in hands of the colonial power. The dynamics of this historical project is completely missed in conventional histories in which the story of nationalism begins with the contest for political power.[56]

অর্থাৎ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসক যতই চেষ্টা করুক শাসিতের উপর সার্বিক সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে যাতে করে সে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে প্রশ্নাতীত করে তুলতে পারে। পরাধীন জাতির চেতনার দ্বার তাতে সবটা রুদ্ধ হয়না। তার মনন কেবলমাত্র অবিমিশ্র অণুকরণের আধারে গড়ে ওঠেনা একদিকে পাশ্চ্যাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধতা অথচ তার অবিকল অনুকরণে দ্বিধাগ্রস্ততা আবার অন্যদিকে নিজস্ব বিশিষ্টতার অন্বেষণ। ইংরেজদের বিষয়ে যাবতীয় 'সংশয়হীনতা' সত্ত্বেও তাদের পদাঙ্ক সম্পূর্ণ অনুসরণে সংশয় জেগে ওঠে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেমন তাঁর "শিক্ষাদর্পণ ও

---

[56]প্রাগুক্ত।

সংবাদসার” প্রবন্ধে লেখেন- “যেমন গ্রীকেরাও কখন আপনাদিগের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই- রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরা যাহা করে নাই এবং করিতে ইচ্ছুক নহেন- আমাদিগের সেইরূপ করিয়া চলা উচিত। সাহেবদিগের স্থানে শিক্ষালাভ করায় হানি নাই- অনেক উপকারই আছে- কিন্তু সাহেবী বহি পড়ীয়া একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপর, নীচাশয়, আত্মগৌরবহীন ব্যক্তির কার্য্য।”[57] এভাবেই গ্রহণ-বর্জনের দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ আর পরস্পরবিরোধী আবেগদের যুগপৎ উপস্থিতির মধ্যে দোলায়মান থাকে পরাধীন জাতির ‘আত্ম’- হোমি ভাবা যাকে বলছেন ‘ambivalence’ । উপনিবেশিত মননে তার ঔপনিবেশিক শাসককে অনুকরণ করতে চাওয়ার এই বিশেষ দিকটিকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, “Colonial mimicry is the desire for a reformed, recognisable Other, as a subject of a difference that is almost the same, but not quite. Which is to say, that the discourse of mimicry; in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess, its difference.[58] আর এই ‘slippage’, ‘excess’ আর ‘difference’ এর তাড়নাতেই, যে মধুসূদন ছেলেবেলা থেকে বিভোর ছিলেন বিলেত যাওয়ার স্বপ্নে, সাহেবী আদবকায়দা রপ্ত করতে, তিনিও বিলেতের মাটিতে নানা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে উপলব্ধি করেন জাতিগত বিশিষ্টতাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদকে –

> আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটা হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি

---

[57] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮),* পৃষ্ঠা- ২৪৫।

[58] Homi. K Bhabha, “Of Mimicry and Man: THe ambivalence of colonial discoutse”, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), পৃষ্ঠা- ৮৯.

> আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা... বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ বাঙ্গালি নহি আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।[59]

যে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি নভেল লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করতে চেয়েছেন একসময়ে, তিনিই আহ্বান জানিয়েছেন বাঙালিকে তার নিজের ইতিহাস রচনায়। বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রকাশ করেছেন *বঙ্গদর্শন*। ইংরেজি শিক্ষার তৎপরতার পাশাপাশিই জোর দেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষা চর্চার দিকে। ১২৭১ সালের ১২ই ভাদ্র, *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় যেমন লেখা হয়-

> ভাষার উন্নতিই মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে ধর্ম, ধর্মনীতি, স্বদেশানুরাগ, প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভাষায় যে এতগুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা আপাত ফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব সন্তানদিগকে এককালে ইংরাজীতে হাতেখড়ি দিয়া থাকেন। এটী বাঙ্গালাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়। এই বিড়ম্বনা দোষেই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগ শূন্য ছিলেম।[60]

উপনিবেশিত চৈতন্যে এহেন নানা পরস্পর বিরোধী ভাবের মাঝে অন্তহীন টানাপোড়েন, গ্রহণ-বর্জনের দ্বান্দ্বিকতা, ভিন্নমুখী নানা ভাবের অসহজ আর আড়ষ্ট অবস্থানের কথা মাথা রেখেই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাঠ করতে চাইব উপনিবেশিত বাঙালির বিলেত তথা ইউরোপ

---

[59] মধুসূদন দত্ত, "ঢাকায় বক্তৃতার অংশ" *মধুসূদন রচনাবলী,* ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.) (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৫), পৃষ্ঠা- ৭৬২।

[60] *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ* (১৮১৮-১৮৭৮),পৃষ্ঠা- ১৬৭।

ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলিকে। দেখতে চাইব, ভ্রমণ কথনগুলিতে ইংরেজি শিক্ষিত ‘নব্য’ বাঙালির অস্তিত্বে অধীনতা আর স্বতন্ত্রতার ‘দ্বিমুখী’ (ambivalent) এই রূপটি কীভাবে ধরা পড়েছিল? যে বাঙালি ইউরোপকে দেখতে শিখেছিল ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষার অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপই যাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তথা পরকাষ্ঠা। প্রাথমিকভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে যাঁরা রীতিমতো দৈবী আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন এবং ব্রিটিশ ‘প্রভু’-র দেখানো মতে ও পথেই যে ‘অভাগা’ ভারতবাসীর মুক্তি সেই বিষয়েও যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলেন। তাঁরাই আবার ক্রমশ সচেষ্ট হয়েছিল নিজেদের আত্ম-অনুসন্ধানে। স্বাধিকার অর্জনে। আবার সেই স্বাধিকার বা স্বতন্ত্রতার বোধও প্রায়শই অজান্তেই আচ্ছন্ন তথা আক্রান্ত হয়েছে ঔপনিবেশিক ‘প্রভু’-র থেকে গৃহীত শিক্ষা-রুচির অনতিক্রম্য অভিঘাত দ্বারা। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের বাংলায় অধীনতা থেকে স্বধীনতা অর্জনের, মুগ্ধতা আর প্রতিরোধের- বিচিত্র বিপরীত নানা ভাবের সমন্বয়ে যে বহুবর্ণময় ইতিহাস সেই ইতিহাসের সমান্তরালেই আমরা বিশ্লেষণ করতে চাইব বাঙালির বিলেত ভ্রমণের উপস্থাপনরীতির নানা কলাকৌশল ও দিক-বদলের চিহ্ন-লক্ষণগুলিকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রসঙ্গ: ইউরোপ ভ্রমণ

প্রেক্ষিত ও যাত্রাপথ

(১)

We all have stories of travel and they are of more than personal consequence.[61]

এবং আমরাও অবশ্যই পরাধীন ভারতে, উপনিবেশিত বাঙালির বিদেশ ভ্রমণ তথা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার আখ্যানগুলিকে নিছক ব্যক্তিক অভিব্যক্তি হিসেবে দেখতে চাই না। বিশেষত এই পর্বে যখন আমরা, 'বাঙালি' এবং 'উপনিবেশ' এই দুই-এর পারস্পরিক 'ঐতিহাসিক' সূত্রটির সঙ্গে ওতপ্রোত যে ভূখণ্ড, সেই ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলির উপর চোখ রাখব তখন ঔপনিবেশিক-উপনিবেশিতের মাঝে যে অসম আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পর্ক, শাসক বিষয়ে শাসিতের বিবিধ সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক চাপানোতর সেই বাস্তবকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারব না। বরং এই দিকগুলিকে বিশেষভাবে দাগিয়ে দিয়েই, পরাধীন বাঙালির বিলেত তথা ইউরোপযাত্রার বৃত্তান্তগুলি পড়তে চাইব। এবং এই চিহ্নিত প্রসঙ্গগুলিকে মাথায় রেখে, ভ্রমণ কথনগুলির নানা বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের জরুরি সূত্র হিসেবে, আরও একবার মনে

---

[61]Tim Youngs, "Introduction: Defining the terms" *The Cambridge Introduction to Travel Writing* (Nottingham Trent University, 2013), পৃষ্ঠা- ১.

করিয়ে দেব, ভারত তথা প্রাচ্য সম্পর্কে মেকলের সেই অতিচর্চিত উক্তির কথা। প্রাচ্যের একটি ভাষা না জানা সত্ত্বেও যখন তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন- "a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia"[62] ঔপনিবেশিক ঔদ্ধত্যের এই নির্জলা প্রকাশ যে কীভাবে ইংরেজি শিখতে তৎপর তৎকালীন বঙ্গসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল বা কীভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি একদল ইংরেজ-অনুগত, দোভাষী-কর্মচারী তথা 'ব্রিটিশ-রুচি'র ভারতীয় জন্ম দিয়েছিল সেই বিষয়ে "পটভূমি" অধ্যায়েই আমরা বিশদে আলোচনা করেছি।

সরাসরি ভ্রমণ প্রসঙ্গে যাওয়ার বদলে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করলাম। কারণ, এই আলোচনার মূল আবর্তনে আছেন যে ভ্রমণকারীরা, তাঁরাও আদতে প্রায় প্রত্যেকেই কমবেশি ঐ শ্রেণিরই প্রতিভূ বা তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্ম। বস্তুত আলোচনার শুরুতেই "প্রস্তাব" অংশে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, এই আলোচনায় আমরা 'উপনিবেশিত পর্ব' বলতে বিশেষ জোর দিতে চাইছি শাসিতের মননগত উপনিবেশায়নের উপর। তাই সালতারিখের হিসেবে ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রকাশিত প্রথম বিলেত সফর-বৃত্তান্ত মির্জা শেখ ইতেসামুদ্দিনের লেখা *বিলেয়েত-নামা* হলেও আমাদের নির্বাচিত কথনগুলি লেখা হচ্ছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেকলে পরিকল্পিত শিক্ষনীতি এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার অভিঘাতে পুষ্ট 'নব্য' বাঙালিদের দ্বারা। এবং এই পর্বের, প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্তটি হল ইংরেজিতে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের, *Three Years in Europe*।[63]

---

[62]উদ্ধৃতিটি শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃষ্ঠা- ১০২ থেকে গৃহীত

[63]রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন প্রভৃতিদের চিঠির ভাষাও ছিল ইংরেজি। রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে, কেশবচন্দ্র সেন বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতাও ইংরেজিতেই লেখা। বস্তুত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির বাংলার বদলে ইংরেজি ভাষায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার বিষয় নিয়ে আমরা "পটভূমি" পর্বেই আলোচনা করেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছিলাম, কীভাবে একই সময়ে অনেকের মধ্যেই আবার মাতৃভাষায় লেখা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল। বাংলায় লেখার প্রবণতা বাড়ছিল। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের লেখা বই-এর আলোচনা করতে গিয়ে লেখককে বাঙালি হিসেবে বাংলায় লেখার 'নৈতিক' দায়িত্ব সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন

এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের পর ইংল্যান্ডের যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য যখন অনেকটাই কমে যায়, পর্যটনও ক্রমশ সহজতর হয়, সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি কমে আসে, তখন উচ্চশিক্ষার্থে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে বা ইউরোপ তথা ইংল্যান্ড ভ্রমণের আকর্ষণে যাত্রী সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। সাহেবদের দেশ বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল মেটাতে বা স্বাধীন দেশের হাল-চাল সম্পর্কে পরাধীন জনগণকে ওয়াকিবহাল্ করে তুলতে উনিশ শতকের ক্রমপরিস্ফুট গদ্যসাহিত্যের জগতে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার ধারা রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলিতে নিয়মিতভাবে ভ্রমণ বিভাগের প্রকাশই এই জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। এবং বলাবাহুল্য এইসব বৃত্তান্ত লিখিয়েদের কেউই ইতেসামুদ্দিনের মতো, নিছক অজানা-অদেখা দেশ-সংস্কৃতি দেখার কৌতূহল নিয়ে বিলেত পাড়ি দেন না। বরং ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজব্যবস্থার বিবিধ পাঠের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাঁদের এক নিবিড় পরিচিতি গড়ে ওঠে ছোট থেকেই। বালক মধুসূদনের যেমন মনে হয়, অ্যাল্বিনো তীরেই বুঝি তাঁর আসল 'বাড়ি'- "And, oh! I sigh for albino's stand/ As if she were my native-land."[64] অথবা ইংল্যান্ডগামী জাহাজ দেখার রোমাঞ্চ জানিয়ে, বন্ধু গৌরচন্দ্র বসাক্‌কে তিনি লেখেন- "I come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for England's glorious shore. The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England!"[65] এবং এহেন ইউরোপপ্রীতিকে কিন্তু কেবল চিরকালীন পাশ্চাত্যঘেঁষা মধুসূদনের অত্যুক্তি বা নিতান্ত ব্যক্তিঅনুভব ভাবলে ভুল

করে দেন। বস্তুত গদ্যের ভাষা হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছিল। ফলত বাংলায় ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লেখার ধারাও ক্রমে বাড়ছিল।

[64]"POEMS 8", *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃষ্ঠা- ৪১৮।

[65]১৬ নং চিঠি, *মধুসূদন রচনাবলী*, পৃষ্ঠা- ৫০১।

হবে। কারণ প্রায় অভিন্ন অনুভূতির নমুনা মিলবে তৎকালীন বহু নব্য যুবা তথা আমাদের আলোচ্য ভ্রমণকারীদের লেখাতেও। শিক্ষাশেষে দেশে ফেরবার সময়, অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন লেখেন- "ইউরোপকে আমি না দেখতেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে- অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।"[66] দেবেশচন্দ্রের লেখাতেও ইউরোপের প্রতি এই আজন্মলালিত নৈকট্যের বোধ প্রায় অবিকল হয়ে ওঠে- "এই দেশকে একদিনের জন্যও নূতন বা অপরিচিত মনে হল না।"[67] কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইউরোপের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির এই অতি পরিচিতি গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক পাঠক্রমের সুবাদে। বস্তুত আগের অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছিলাম, শাসনযন্ত্রকে দৃঢ় করতে মেকলে কীভাবে শাসক ও শাসিতের মাঝে একদল ইংরেজি ধারায় শিক্ষিত দেশীয় মধ্যবর্তী শ্রেণি তৈরির কথা বলেছিলেন। যারা হবে, রক্তমাংসে ভারতীয় কিন্তু রুচিগতভাবে ইংরেজ। এবং এদেশে আইন-শাসনের প্রকরণগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শাসককে বিশেষ সহায়তা করবে। সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক পাঠক্রম কীভাবে শাসকের যোগ্যতা বিষয়ে, ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের সভ্যতা বা শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে শাসিতের মনে একধরনের সম্ভ্রম তথা সম্মোহন রচনা করে দিয়েছিল, সে কথা আমরা *Mask of Conquest: Literary Study and British Rule in India* বইটির সূত্র ধরে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের আলোচিত ভ্রমণকারীরাও কিন্তু মূলত এই শিক্ষাব্যবস্থারই ছাত্র। ফলত ইউরোপ সম্পর্কে তাঁদের যে দুর্বার আকর্ষণ, যে নিবিড় নৈকট্যের বোধ তাও পাঠক্রম সম্পৃক্ত ঐ বিশেষ মূল্যবোধ দ্বারাই জারিত। যে মূল্যবোধের বশে ইউরোপ হয়ে উঠেছিল তাঁদের কাছে শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্যের চূড়ান্ত

---

[66]অন্নদাশঙ্কর রায়, *পথে প্রবাসে*, অবনীন্দ্রনাথ বেরা (সম্পা.) (কলকাতা: বাণীশিল্প, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা- ১০০।

[67]দেবেশচন্দ্র দাস, *ইয়োরোপা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২), পৃষ্ঠা- ১৭।

নিদর্শন, ইংল্যান্ড হয়ে উঠেছিল সমাজ-সভ্যতার, জাতি-রাষ্ট্রের আদর্শ-মডেল। জেগে উঠেছিল, তৎকালীন সামাজিক ও শাস্ত্রীয় যাবতীয় বাঁধানিষেধ পেরিয়ে, সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকি সামলে সে দেশে পা রাখার অদম্য বাসনা। এবং তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, 'স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি' হিসেবে- এই ইউরোপ তথা ইংল্যান্ড ভ্রমণ হল সংস্কারাচ্ছন্ন স্থবিরতা থেকে আধুনিক গতিময় উন্নত জীবনে প্রবেশের, পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা আস্বাদনের চাবিকাঠি। এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার উদ্দেশ্যই যেন হয়ে ওঠে সেই শিক্ষা-অভিজ্ঞতার সুফলকে পরাধীন দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বস্তুত ইউরোপ বিষয়ক ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি, বিশেষত ১৯ শতকের কথনগুলিতে ভ্রমণকারীরা ভ্রমণের এই শিক্ষাধর্মিতার দিকটিকে যথাসম্ভব তুলে আনতে চান। কালাপানি পেরিয়ে, সামাজিকভাবে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় উপেক্ষা করে এই ভ্রমণ যেন নিছক শখের ভ্রমণ নয়, বরং তা শিক্ষামূলক ও 'মহৎ' আদর্শপ্রণোদিত, কথনের পরতে পরতে এমনই দাবি করা হয়। সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার মতো 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ' কাজে সামিল হওয়ার যৌক্তিকতাকে প্রাঞ্জল করতে, কথনগুলিতে প্রায়ই ভ্রমণকারীরা তাঁদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য তথা মহত্ত্ব বিষয়ে সচেতন ও সরব থাকেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন যাত্রা শুরুতেই বলেন–

> বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলে যুবকদের জাতিচ্যুত করার অনিষ্টকর প্রথা একমাত্র অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত বঙ্গদেশেই আছে। আমরা এক শতাব্দীকাল ইংরেজের শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের মত ক্ষয়প্রাপ্ত জাতির জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ যে কত বেশি দরকার এই প্রাথমিক সত্যটি আমরা না শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে এই চরম অনুকূল অবস্থাতেও আমাদের প্রগতিপথের এই মন্থরগতির জন্য দেশের ইংরেজ শাসকেরা দুঃখ বোধ না করিয়া পারেন না।

> আমি বৈষয়িক কোন সুবিধালাভের জন্য এখানে আসি নাই। কুসংস্কারের বিপরীত যে স্রোত এখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই স্রোতে আমি একবিন্দু জল যুক্ত করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়।[68]

'ক্ষয়প্রাপ্ত জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য ভ্রমণের দরকার'- অর্থাৎ, ত্রৈলোক্যনাথ বৈষয়িক গরজের উপরে উঠে ভ্রমণের শিক্ষাভিত্তিক নৈতিক উদ্দেশ্যটিকে দাগিয়ে দেন। তিনি বুঝিয়ে দেন, স্বাধীন দেশকে দেখা ও সে দেশ থেকে শেখা পরাধীন পদানত জাতির অবশ্যকর্তব্য। এবং ভ্রমণকারী হিসেবে তিনি যথাসম্ভব সেই 'দায়িত্ব' পালনের চেষ্টা করেছেন। ঠিক একইভাবে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনী দাসের *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* বইটি যখন প্রথম কোনো মহিলার লেখা পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণবিবরণ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন সেই অজ্ঞাতনামা লেখিকার বইটির বিশেষত্ব বোঝাতে প্রকাশক বলেন-

> এই নবীনা গ্রন্থকর্ত্রীর দ্বারা আমরা মহোপকার লাভ করিলাম। তিনি একটি স্বাধীন জাতির ভিতর ও বাহির তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়াছেন- একটি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতার নিদান উপাদানসকল এক একটি করিয়া চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আদ্যোপান্তই উপাদেয়; বিশেষতঃ শেষের অধ্যায়গুলি এতই উপকারী যে সে সকলের মূল্য নাই। তাঁহার "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" যে ভূয়োদর্শন, কঠোর পরিশ্রম ও অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রেমের জাজ্বল্যমান প্রমাণ তাহা পাঠকমাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।[69]

আমরা বুঝতে পারি, ত্রৈলোক্যনাথ যেমন নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে নিছক দেশ বেড়ানো বা বৈষয়িক গরজ বলে ভাবতে চাননি, বরং যাবতীয় পর্যবেক্ষণকে একধরনের 'নৈতিক দায়িত্ব'-

---

[68]ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, *আমার ইউরোপ ভ্রমণ,* পরিমল গোস্বামী (অনূদিত) (কলকাতা: চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড), ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৩৯।

[69]কৃষ্ণভাবিনী দাস, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* সীমন্তী সেন (সম্পা.) (কলকাতা: স্ত্রী, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা- ৩-৪।

এর সুরে বাঁধতে চেয়েছিলেন, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*-র প্রকাশকও, তাঁর প্রকাশিত বইটির শিক্ষামূলক দায়বদ্ধতাটিকে সযত্নে দাগিয়ে দেন। এবং ভারতেরর মতো একটি পরাধীন দেশের দুর্দশা ঘোচানোর আসল দাওয়াই যে ইংরেজদের মতো "স্বাধীন জাতির স্বাধীনতার নিদান উপাদানসকল"-এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত থাকেন। ফলত দেশ ও দশের উন্নতির জন্য জরুরি ইংল্যান্ড বিষয়ক এই বৃত্তান্তকে তাঁর মনে হয় 'স্বজাতিপ্রেমের জাজ্বল্যমান প্রমাণ'। এবং লেখিকা নিজেও পাঠক/পাঠিকার কাছে, তাঁর লেখনীর উদ্দেশ্য তথা সম্ভাব্য তাৎপর্যটিকে স্পষ্ট করে দিতে বলেন-

> আমি গ্রন্থকর্ত্রী নাম পাইবার বা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিবার অভিলাষে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি নাই; অনেক নূতন দ্রব্য দেখিয়াছি এবং তদ্দর্শনে আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, কেবল সেইগুলি অবকাশমতে সরল ভাষায় যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে সমাস, সন্ধি ও অলঙ্কারের আতিশয্য নাই, এবং এমন কোন ভাব নাই যে আপনারা নাটক বা উপন্যাস পড়বার মত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বই শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। ইহাতে কোন মনের উত্তেজক বীরনারী বা বীর পুরুষের আখ্যায়িক নাই, কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবে। এই পুস্তকে কোন অমূলক বিষয়ের বর্ণনা নাই, এবং আপনারা মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ উপকারও পাইতে পারেন, অন্ততঃ পড়িলে কোন ক্ষতি হইবে না।[70]

আমরা খেয়াল করব, ত্রৈলোক্যনাথ ও কৃষ্ণভাবিনী কীভাবে প্রায় অবিকল স্বরে স্বাধীন ও পরাধীন, ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে 'প্রগতি' প্রভৃতি শব্দের অভিন্নতা এবং তার বিপরীতে ক্ষয়প্রাপ্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির চিত্রকল্প প্রভৃতি বিপরীত যুগ্মপদের অবতারণা করছেন। এ প্রসঙ্গে, নিশ্চয় মনে পড়ছে, কিছুক্ষণ আগেই উপনিবেশিত বাঙালির ইউরোপপ্রীতির পিছনে

---

[70] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৫।

আমরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার যে রাজনীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম, তার কথা। কারণ, ভ্রমণকথনে উঠে আসা চিত্রকল্প ব্যবহারের এই প্রকৃতিও আদতে উপনিবেশিত মনন-চেতনের উপর ঔপনিবেশিকের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সেই ইতিহাসটিকেই উন্মুক্ত করে দেয়। যে কথার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তির মধ্যেই পেয়েছিলাম- "হিন্দু কলেজ হইতে নবোর্ত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।" আগেই বলেছি আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিরাও ঐ যুবকদলেরই ঠিক পরের প্রজন্ম। এবং ঔপনিবেশিকতার প্রশিক্ষণে, তাঁরাও 'সর্বান্তকরণে' না হলেও বহুলাংশেই ব্রিটিশ শাসনের ইতিবাচকতাকে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন। ফলত ইতেসামুদ্দিন যেমন নতুন দেশ দেখার নির্ভার বিস্ময় আর অনাবিল কৌতূহল নিয়ে ইংল্যান্ডকে দেখতে পেরেছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসক বিষয়ে পূর্বসঞ্চিত বিবিধ ভাবনার ভারে ভারাক্রান্ত নব্য বাঙালি যাত্রীদের পক্ষে তেমন জড়তাহীনতার অবকাশ আর ছিল না। নিজেকে বিজিত জাতির প্রতিনিধি ভেবে কোনোরকম আত্মসংশয় বা হীনম্মন্যতাতে ইতেসামুদ্দিনকে ভুগতে হয়নি, তাই ইংল্যান্ডের রাজবংশের সঙ্গে ভারতের মোগল রাজত্বের তুলনা টেনে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন- "England used to be an insignificant country, in which seven independent kings ruled side by side. Even with the addition of Ireland and Scotland the kingdom is less than twice the size of Bnegal...In matters of government the king of England is not independant like the great Moghul of India."[71]

"England is not independant like the great Moghul of India"- ইতেসামুদ্দিনের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে আমাদের নির্বাচিত যাত্রীদের যাঁরা ছোট থেকেই ইংল্যান্ড বা ইউরোপের

---

[71]Mirza Sheikh I'tesamuddin, *The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, Originally in Persian, of a Visit to France and Britain*, পৃষ্ঠা- ১০৪-০৫.

সঙ্গে স্বাধীনতাকে সমার্থক ভাবতে শিখেছেন তাঁদের উচ্চারণ আদপেই মিলবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কথনে স্বাধীন-পরাধীন বিষয়ক এই চিত্রকল্পের ব্যবহার পুরোপুরি দিকবদল করে। কৃষ্ণভাবিনী যেমন 'পরাধীন' দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, " দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে,/ জর্ম্মণ, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,/ প্রফুল্লতাময় সতেজ হৃদয়/ হীন অশ্রুজল ধরে না নয়নে।"[72] এবং স্বধীনতা থেকে শিক্ষা থেকে সহবত– 'সভ্য' জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সকল পরিসরেই যে ইংরেজদের প্রশিক্ষণ বা তত্ত্বাবধান অত্যাবশ্যক সে বিষয়েও অনেকেই নিঃসংশয় থাকেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্যে ইংল্যান্ড ভ্রমণকালে, একটি সভায় বলেন-

> My lord, ladies and gentlemen, if you turn your eyes for a moment to yonder East, you will see a great country, rising from the death-like slumber of ages and exerting its best powers to move onward in the path of true enlightenment and reform. That country is India. You behold a spectacle which cannot but excite your pity and compassion. In that country the great work of reform has commenced; in that country there is a struggle going on between old institutions and new ideas, between ancestral notions and prejudices, and modern civilization. The flood of western education has burst upon India, has made its way into the citadels of idolatry and prejudice, and is sweeping away in its resistless current all the accumulated errors and iniquities of centuries....That scene is certainly cheering, but to what is this great work owing? Undoubtedly it is mainly owing to British energy and British enterprise, and the exertions of that paternal Government under whose care Providences, in its inscrutable mercy, has placed my great country. Ever since the British flag was unfurled

[72]ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা, পৃষ্ঠা- ৮২।

> on the soil of India this great work has commenced and it has been carried on most nobly, and in many cases most disinterestedly. Thousands have really been blessed already with true knowledge, and have also been purified and sanctified morally; and the blessings of those thousands and ten of thousands are coming in powerful stream, as it were, from my country to England, in order to honour the British nation.[73]

বস্তুত ন্যায়ের ধ্বজাধারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে অধঃপতিত, নিদ্রিত ভারতবাসীর পুনর্জাগরণের পবিত্র পথ- এই ধারণা, বৃত্তান্তগুলির বিশেষত উনিশ শতকের বেশিরভাগ বৃত্তান্তেরই সাধারণ চরিত্র হয়ে ওঠে। এবং শাসক সম্পর্কে এই সম্মোহনের নমুনা হিসেবেই বারংবার বিপরীত চিত্রকল্পের ব্যবহার চলে। যা শুধু কেশবচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ, কৃষ্ণভাবিনীর লেখায় নয়, দেখা যায় অধিকাংশের রচনাতেই। এমনকি স্বাধীনতার বেশ অনেকটা কাছাকাছি সময়ে দাঁড়িয়েও কিন্তু রামনাথ বিশ্বাসের ইউরোপের পথে পথে চলতে চলতে মনে হয়, "...স্বাধীন দেশের স্বাধীন পথে চলা বড়ই আরামের।"[74] অথবা নিজের জাতিগত পরাধীনতার পরিচয় বিষয়েও সর্বদা সতর্কতা বজায় রাখতে হয়, "অপ্রিয় কাজ করা পর্যটকের পক্ষে উচিৎ নয় উপরন্তু আমি ছিলাম পরাধীন দেশের লোক। পরাধীন দেশের পক্ষে ভবঘুরে বৃত্তি বড়ই অন্যায় কাজ। সেকথাটা জানতাম বলেই বড় বড় কথা কখনও বলতাম না।"[75]

---

[73]Keshubchunder Sen, *Keshubchunder Sen in England Diary, Seremons, Addresses & Epistles* (Kolkata: *Nababidhan Publication Committee,* 1938), পৃষ্ঠা- ১৯৬.

[74] রামনাথ বিশ্বাস, *ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ (*পর্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৯৪১), পৃষ্ঠা- ১৩৭।

[75]প্রাগুক্ত।

(২)

প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রিটিশ শাসনের সার্বিক মঙ্গলময়তা সম্পর্কে অগাধ আস্থা নিয়ে, ইউরোপীয়বীক্ষায় বুঁদ হয়ে থাকা ভ্রমণকারীরা যখন ইউরোপের মাটিতে সত্যিই পা রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন তখন পূর্বসঞ্চিত ভাবনার ভার কি তাঁরা আদৌ সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন? তাঁদের দৃষ্টিতে কি আদৌ ইউরোপের কোনো মৌলিক ছবি ধরা পড়েছিল? নাকি ইংরেজি বইতে পড়া অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারেই ভরাডুবি হয়েছিল ভ্রমণকারীর নিজস্ব পর্যবেক্ষণক্ষমতা। তবে মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের অমোঘতায়, এই নব্য বাঙালির গল্প শুধু অবিমিশ্র পাশ্চাত্যপ্রেমে শেষ হয়ে যায়নি। আগের অধ্যায়ের আলোচনাতেই আমরা দেখেছিলাম, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে, ঔপনিবেশিক পীড়ন যত প্রকট হয়েছে, আইন-শাসনের বৈষম্যনীতিগুলি যত স্পষ্ট হয়েছে, ততই চিড় ধরেছে বিদেশী শাসন সম্পর্কে বাঙালির নিখাদ মুগ্ধতায়। ফলত পাশ্চাত্যের রীতিনীতি গ্রহণ বা পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ে গড়-মুগ্ধতার পাশাপাশিই তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন বিদেশী শাসকের থেকে নিজের অস্তিত্বের পৃথকীকরণে। এবং ঘটনাচক্রে বিদেশ যাত্রার বৃত্তান্ত লেখার ধারাটিও পুরোদমে গড়ে উঠছে এই সময় থেকেই। এই প্রসঙ্গে একবার চোখ রাখা যেতে পারে, রমেশচন্দ্রের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণবৃত্তান্তটির ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমালোচনাটির উপর। বইটির বিশেষত্ব বোঝাতে, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন-

> এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ইংলণ্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। তথাপি অন্ধ যেমন হস্তের দ্বারা হস্তির আকার অনুভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড

> সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান। ইংরাজি গ্রন্থ বা পত্রাদি ইংরাজের প্রণীত। ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরূপ চিত্রিত। আমাদিগের চক্ষে ইংলণ্ড কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না।"[76]

আমরা খেয়াল করব, বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমণ বিষয়ক এই বইকে বিশেষ কার্যকরী বলে মনে করছেন, কারণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইংরেজ তথা ইংল্যান্ড বিষয়ে বাঙালির একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। এবং ইংরেজি বই মারফত অর্জিত জ্ঞানকে যে নিজস্ব চর্মচক্ষু দ্বারা ঝালিয়ে নেওয়ার বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে তাঁর আদত পাঠককে তিনি বারেবারে সচেতন করে দিচ্ছেন পুরো সমালোচনা জুড়েই। এবং যেভাবে তিনি পরাধীন বাঙালিকে নিজের হাতে নিজের ইতিহাস লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রায় সেই স্বরেই তিনি এই তিন পাতার গ্রন্থ সমালোচনাতেও শাসক সম্পর্কে শাসিতের এক স্বকীয় দৃষ্টিকোণ ও উচ্চারণ গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছেন- "...অতএব বাঙ্গালীর হস্তলিখিত একখাণই ইংলণ্ডের চিত্র দেখিবার আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পূরাইয়াছে, এজন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ করি।" আমরা বুঝতে পারি, তিনি পাশ্চাত্যনির্ভরতার পাশাপাশি বাঙালির জাতিগত নিজস্বতা কায়েমের বিষয়টিকেও সমান জরুরি বলে মনে করছেন। প্রসঙ্গত *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*-র প্রকাশকমশাইও কিন্তু বিদেশভ্রমণের নানা সুফলের পাশাপাশি একটি কুফল বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলেন- "কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সেই অমৃত-বীজ আনিবার পক্ষে একটি ভয়ানক বিপদ আছে। পাছে ভারতসন্তান অমূল্য ভারতীয় হৃদয় হারাইয়া সুধাভ্রমে গরল সংগ্রহ করিয়া আনেন, এই ভয় হয়। এ ভয়ও অমূলক নহে,

---

[76]বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "নূতন গ্রন্থের সমালোচনা", *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪০৫), পৃষ্ঠা- ৭৯৬-৭৯৯।

কেননা দেখিতেছি যে বাহ্যজগতের প্রলোভন বড়ই দুর্জ্জয়।"[77] বস্তুত ইংরেজ বা ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকলেও ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রবণতাকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করা হয়। সাহেবদের অনুকরণ করে ইঙ্গবঙ্গ সাজার প্রতি বিদ্রূপ অনেক কথনেরই আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। সতের বছর বয়সে প্রথমবার ইউরোপ গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ যেমন এই বিষয়টি বিস্তারিত করেন তাঁর "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র"-তে-

> আর-একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙ্গালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার-ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ানও করে না। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করেন। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন।...
>
> মা, এবার মলে সাহব হব;
> রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
> সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব
> (আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ঘোরাব।[78]

বস্তুত তাঁর পঞ্চম পত্রটির পুরোটি জুড়েই এই ইঙ্গবঙ্গ নামক 'হাঁসজারু'-দের হাভভাব, কথাবার্তা, ভারত বিষয়ে চরম অশ্রদ্ধা, লম্বা-চওড়া বানানো কথা আর আপ্রাণ সাহেবীপনার চেষ্টা সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গবর্ষণ চলে। এই প্রসঙ্গে, জামাইয়ের বিদেশ যাত্রাকালে রাজনারাবয়ণ বসুর লেখা শুভেচ্ছাবার্তাটির কথাও মনে করা যেতে পারে। যেখানে, ইংল্যান্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান-স্বাধীনতা-বাণিজ্যের প্রভূত প্রশংসার পরেও 'সাহেব-সাজা' বাঙালিতে পরিণত না হওয়ার উপদেশ দেওয়া থাকে-

---

[77]প্রাগুক্ত।

[78]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (পঞ্চম পত্র), রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৯৩), পৃষ্ঠা-৮১৪।

I've freedom I esteem though thy excess
I check oft. Go, but still as our remain.
Be not like apes who change their manners, dress
And language, of their trip becoming vain.
they England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.[79]

বস্তুত আমরা কিছুক্ষণ আগে যে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাঙালির পাশ্চাত্য থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিগ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব পরিসর তৈরির প্রবণতার কথা বলছিলাম, যে সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোনাচর ব্যাখ্যা করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গতে আর একবার ফিরে যাব। সে সমালোচনায়, তিনি ইংরেজ বিষয়ে বাঙালির হীনম্মন্যতা সম্পর্কে খেদোক্তি করেছিলেন-"আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদের কিছুই প্রশংসনীয় নহে।...একথা সত্য কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে...ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে।[80] অর্থাৎ, ইংলণ্ড বিষয়ে পড়া বা লেখার উদ্দেশ্য নিছক উন্নত জাতি বিষয়ে বা তার দেশের চাকচিক্য বিষয়ে প্রশংসাবাণী শোনা বা শোনানো নয়, বরং দুর্বল জাতি হিসেবে বাঙালির উচিৎ প্রয়োজনীয় গুণগুলিকে রপ্ত করা, কিন্তু কখনোই জাত্যভিমানকে ক্ষুণ্ণ করা নয়। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি রমেশচন্দ্রের লেখার ভাষা হিসেবে ইংরেজির চয়ন বা স্বদেশ স্বজাতি সম্পর্কে তাঁর 'সকরুণ সহানুভূতিকে' ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েননি। তিনি লেখেন-

[79]রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬), পৃষ্ঠা- ১০৩।

[80]"নূতন গ্রন্থের সমালোচনা", পৃষ্ঠা- ৭৯৭।

> লেখক স্বদেশবিদ্বেষী বা ইংরেজপ্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশবৎসল, স্বদেশবাৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতা গুলি লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যেরূপ স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়?[81]

অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের ওপর ভরসার সমান্তরালেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা- এই দুই বিপ্রতীপ ভাবের বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই উপনিবেশাশ্রিত এলিট সমাজ তার জাতীয়তাবাদ তথা জাতিসত্তা নির্মাণের প্রকল্পটিকে গড়ে তুলতে চায়। এই প্রসঙ্গে অবধারিতভাবেই আমাদের মনে আসে আগের অধ্যায়ে আলোচিত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিশ্লেষিত, উপনিবেশিত মননে বহির্ভূমি (Outer Domain) ও অন্তর্ভূমির (Inner Domain) বিভাজনের সাপেক্ষে গড়ে ওঠা anticolonial natioanalism-এর কথা। যেখানে উপনিবেশিত সমাজ অনুকরণ আর স্বকীয়তার দ্বান্দ্বিকতায় এক আধুনিক অথচ অ-ইউরোপীয় সত্তা নির্মাণ করতে চায়। তাই প্রকাশকমশাই যখন সতর্ক করেন, ভারতসন্তান যেন 'ভারতীয় হৃদয়' না হারিয়ে ফেলে বা রাজনারায়ণ বসু নিজের জামাইকে অন্ধভাবে সাহেবদের নকল করার ব্যাপারে সাবধানবাণী শোনান আমরা বুঝতে পারি তাঁরা আসলে অনুকরণ আর স্বকীয়তার টানাপোড়েনের এই টেনশনেই আক্রান্ত হচ্ছেন। এবং মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, বিদেশের অভিজ্ঞতা যেন কোনোভাবেই স্বদেশ বিস্মৃতির কারণ না হয় । অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তগুলির বিশদ পাঠ নিলেও আমরা দেখব, তাদের কথনগুলিতে কীভাবে এই গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব প্রায়শই এক বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে ওঠে। একদিকে তাঁরা ইংরেজদের জ্ঞানস্পৃহা, রাজনীতি বিষয়ে

[81] প্রাগুক্ত।

সচেতনতা, বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতা, নিয়মনিষ্ঠা, শিক্ষাব্যবস্থা, নারীশিক্ষা, শারীরিক বলবীর্যের বিশেষ প্রশংসা করছেন। তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক, শৌখিন তথা সুশৃঙ্খল গার্হস্থ্যচিত্র, নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশাকে ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় মনে করছেন। অন্যদিকে প্রায় প্রত্যেকে ইংরেজদের অতিরিক্ত অর্থপ্রীতি, ফ্যাশন সর্বস্বতা, মদ্যপান বা বাহ্যিক আড়ম্বরের তুলনায় ভারতীয় জীবনধারাই শ্রেয় ও শান্তিময় বলে অনুভব করেছেন। ইংল্যান্ডের মাত্রাতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তুলনায় ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের যৌথপরিবার বা কৌমজীবন তাঁদের অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক বলে মনে হয়েছে। ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল, অনুসরণ-পরিহারের এই দ্বান্দ্বিকতার সূত্র ধরেই আমরা এবার উনিশ ও বিশ শতকের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির বিষয় নির্বাচন এবং নির্বাচিত বিষয়গুলির অভিপ্রায় ও অভিমুখগুলিকে পড়ার চেষ্টা করব।

(৩)

ঔপনিবেশিক আমলের, ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ বেড়ানোর কথনগুলির দিকে চোখ রাখলে প্রায়শই একধরনের আপাত বিষয়শৃঙ্খলা চোখে পড়ে। যাত্রার পূর্বপ্রস্তুতি, জাহাজ তথা জলপথের নানা অভিজ্ঞতা, এশিয়া ও ইউরোপের নানা অংশ ছুঁয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছানো, সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জাতির সমাজ-আচার-ব্যবহার, রাজনীতি-অর্থনীতির বিবিধ ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ এবং তারই সমান্তরালে ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক পাঠগ্রহণ, কন্টিনেন্ট ভ্রমণ এবং প্রত্যাবর্তন- অনেক কথনেরই গঠনকাঠামো বা বর্ণনাক্রম এই সাধারণ সূত্র মেনে চলে। এবং কিছু উৎকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া বেশিরভাগেরই ভাবনাগত সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। অবশ্য বিশ শতকে বিশেষত প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে যখন ইউরোপীয় মহিমা বা ইংল্যান্ডের অটুট-অপরাজেয় ভাবমূর্তি বিষয়ে পূর্ববর্তী মোহ অনেকটাই ধাক্কা খায়। এবং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম্ভাবনা সম্পর্কে যখন একধরনের আশা-প্রত্যাশার জন্ম নেয় তখন কথনগুলির দৃষ্টিকোণেও আমরা নানা বাঁকবদল খেয়াল করি। ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির বিষয় নির্বাচনের নানা লক্ষণ এবং ভাবনাগত দিকবদলকে এইবার আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করব।

উচ্চ বা মধ্যবিত্ত বাঙালি বৈষয়িক তাগিদ বা সামাজিক সম্ভ্রমের কথা ভেবে ছেলেদের যতই ইংরেজি শেখাক না কেন, ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়ে জাত-ধর্ম খোয়ানোর ব্যাপারে অনেক অভিভাবকেরই তীব্র আপত্তি ছিল। উনিশ শতকের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যেহেতু সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার বিষয়টি নেহাৎ সহজ ছিল না, তাই যাত্রাপূর্বের সমাজ তথা আত্মীয়-পরিজনের সম্মতি আদায়ের নানা চিত্তাকর্ষক আখ্যান বা সমাজচ্যুত, পরিবার পরিত্যাজ্য হওয়ার করুণ অভিজ্ঞতা অনেক কথনেরই সূচনাবিন্দু হয়ে ওঠে। বিজয়চন্দ্র মাহাতবের কথনে যেমন যাত্রা শুরুর ‘আয়োজন’ পর্বের এই বিবিধ প্রতিকূলতার এক জীবন্ত ছবি উঠে আসে-

> আমাদের বর্দ্ধমানের জনসাধারণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি য়ুরোপ-ভ্রমণের কল্পনা করিয়াছি, তখন এই সংবাদে চারিদিকে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ...দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ সহরের ছোট বড় সকলেই অবগত হইলেন- সংবাদটি তাঁহাদের মধ্যে এক বিশেষ আন্দোলন তুলিয়া দিল। অধিকাংশ লোকই আমার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন- প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, আমি অতি গর্হিত সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার পর আমার নিকট যে কত পত্র আসিয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, সকল পত্রই এই ভ্রমণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক আবেদন নিবেদনও আমাকে শুনিতে হইয়াছিল; সকলগুলিরই সার মর্ম্ম এই যে, আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিতে যাইতেছি- সুধু অন্যায় নহে, আমার এই কার্য্যকে অনেকে গুরুতর পাপকার্য্য বলিয়া অভিহিত

> করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। যূরোপ-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার প্রতিকূল মতের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। [82]

বস্তুত একদিকে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে সামাজিক-পারিবারিক বাঁধা-নিষেধ, জাতিচ্যুত হওয়ার বিপত্তি অন্যদিকে কালাপানি পেরোনোর উত্তেজনা- স্বপ্নপুরী বিলেতে পা দেওয়ার অদম্য বাসনা। এই দুই বিপ্রতীপ ভাবের অসহজতার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল ইউরোপকে ঘিরে তৎকালীন চিন্তাপ্রবাহ। ইংল্যান্ডের মাটি ছোঁওয়ার প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও তাই ত্রৈলোক্যনাথ লেখেন নিজের আশঙ্কার কথা-

> আমি যে ইংরেজদের স্বপরিবেশের মধ্যে আসিয়া দেখিতে পাইব, এবং যে সব গুণের জন্য বর্তমানে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট আসিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইলাম, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিতেছি যে এইক্ষণে সম্ভবত আমি আমার স্বদেশে জাতিচ্যুত হইতেছি। যে পুরাতন পল্লীগ্রামে (২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে) আমাদের বংশ চরিশত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি (১২৫৪ সালে, ইং ১৮৪৭), যেখানে আমার শৈশব কাটিয়াছে, সে স্থানকে আমি আর আমার বলিয়া মনে করিতে পারিব না...পরিবারের জ্যেষ্ঠগণ, যাঁহাদের কোলেপিঠে মানুষ হইলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করিবেন।[83]

কৃষ্ণভাবিনীর মতো মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রে আবার বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা রাখাই ছিল প্রায় সামাজিক বিপ্লবে শামিল হওয়ার সমান। "আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়ীতে

---

[82]জলধর সেন, "আয়োজন", *আমার য়ূরোপ-ভ্রমণ,* বর্ধমান রাজ বিজয় চাঁদ মাহাতবের "Impressions" অবলম্বনে রচিত (কলকাতা: গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড সন্স, ফাল্গুন, ১৩২১)।

[83]*ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃষ্ঠা- ২৩।

উঠিলাম"- কৃষ্ণভাবিনীর এই উচ্চারণই বুঝিয়ে দেয়, বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে আসা এবং তার উপর বিলেত পাড়ি দেওয়ার মতো প্রায় অভাবনীয় কাজের মধ্যে কীভাবে মিশে থাকে সামাজিক চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের 'দ্বৈত' তাৎপর্য। বস্তুত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে যাত্রাপথের বর্ণনা। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই যেহেতু বোম্বাই থেকে যাত্রা শুরু করতেন, কলকাতা থেকে রেলে চড়ে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে যাত্রা, আঞ্চলিক নানা বৈচিত্রের সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ তৈরি করে দিত। প্রথমবার বাড়ি তথা বাংলা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে, কলকাতা থেকে বোম্বাই- এই দীর্ঘ রেলযাত্রায় নানাবিধ যাত্রীদের দেখতে দেখতে কৃষ্ণভাবিনীর যেমন মনে হয়-

> এক ভারতবর্ষের ভিতর এত প্রভেদ আছে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মনে হইল যে যদি একজন বাঙ্গালী, একজন মার্হাট্টী ও একজন পশ্চিমবাসী লোক কোন বিদেশে যায়, তাহা হইলে কেহই ভাবিতে পারিবে না যে ইহারা তিন জন একদেশের লোক। প্রথম কারণ তিন জনকে দেখিতে তিন রকম, দ্বিতীয় কারণ, তিন জনে তিন ভাষায় কথা কহে, তৃতীয়তঃ তিন জনের তিন প্রকার আচার ব্যবহার; ইহাতে কি প্রকারে অন্যে ভাবিতে পারে যে ইহারা তিনজনেই এক ভারতের সন্তান?[84]

আমরা বুঝতে পারি, কৃষ্ণভাবিনীর মতো রক্ষণশীল বাড়ির পর্দানশীন নারীর কাছে এই ভ্রমণ শুধু বিলেত বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ নয়, ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও তাদের পরিচয়ের বহুমুখিনতা সম্পর্কেও সচেতনতা তৈরির পাঠ হয়ে ওঠে।

বস্তুত প্রথমদিককার প্রায় সকল ভ্রমণকারীই জাহাজে চড়ে দীর্ঘজলযাত্রার এক বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিতার শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উপনিবেশিত

---

[84] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৯।

বাঙালির যে সম্ভ্রম, এবং ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের পুণ্য অভিঘাত সম্পর্কে যে আস্থা- জাহাজ যেন তারই প্রতীক হয়ে ওঠে, ভ্রমণকারীদের চোখে। ত্রৈলোক্যনাথ যেমন নিজের রচনার ভূমিকা অংশেই বলেন-

> ১৮৮৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখ 'নেপাল' নামক জাহজখানা বম্বে হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। সেদিনের সেই বসন্ত সন্ধ্যায় 'নেপাল' বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গিতে ভারত সমুদ্র পাড়ি দিয়া এডেন বন্দরের দিকে চলিতেছিল, এবং সেদিন জাহাজখানা যতগুলি হিন্দুর মিলিত হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল এমন আর কখনও কোন ডাকবাহী জাহাজ করে নাই। তাহার গর্ব অহেতুক ছিল না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিমাণ সার্থক করিয়া তুলিতে ইংল্যাণ্ডের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহা সে পালন করিয়াছে এই বাষ্পপোতের সাহায্যেই। সে তাহার সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া বহু ভারত-সন্তানকে জাতিভেদের বাধা ভাঙিয়া সংস্কার ও আচার সমূহের ঊর্দ্ধে উঠিতে সাহায্য করিয়াছে।...সবাই চলিয়াছেন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দেশে, যদিও প্রত্যেকের লক্ষ্য পৃথক।[85]

এবং জাহাজে উঠেই, জাহাজের সাজসজ্জা, কর্মচারীদের দক্ষতা ও নিয়মশৃঙ্খলা দেখে 'ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তাদের' সুযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি আবার নিশ্চিত হয়ে যান-

> আমাদের জাহাজের বার্জ-বোটসমূহে একটি স্টীমলঞ্চ আসিয়া ভিড়িয়াছে। তাহা হইতে কয়লা ও জল যথারীতি 'নেপাল'-এ তোলা হইল। যথাসময়ে নোঙ্গরের কাছে কর্মীরা যে যাহার স্থান গ্রহণ করিল। ক্যাপ্টেন জাহাজের ব্রিজে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন- 'হীভ আপ' উঠাও। সব কাজ নীরবে সমাধা হইল। একটি মুহূর্ত বাজে নষ্ট হইল না। জাহাজের এই কর্মশৃঙ্খলা, এই ডিসিপ্লিন দেখিয়া আমাদের অবাক লাগে। প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সবই তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গেল। এই শিক্ষার জন্যই

[85] ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৩।

> ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা পর্বত সমান উঁচু হইলেও কোথাও লেশমাত্র ভুলভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে না।[86]

প্রায় হুবহু সুরেই, জগদীশচন্দ্র বসু লেখেন-“জাহাজে চড়ীয়াই ইংরাজের শৃঙ্খলা ও কার্য্যকুশলতার শত পরিচয় পাইয়াছিলাম। একটি ছোটখাট রাজপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত জাহাজ শত শত প্রাণী বক্ষে করিয়া, দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়া অতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, দেখিলে শতমুখে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। সাত শত লোক জাহাজে বাস করিতেছে, অথচ ঠিক সময়ে স্নান আহারাদি সমুদয় চলিতেছে।”[87] অবশ্য ব্রিটিশ শিষ্টাচারে মুগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি, ইংরেজ প্রভুদের কাছে জো-হুজুরীতে অভ্যস্ত বাঙালিরা জাহাজে সাহেব চাকর দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়। এই বিষয়ে, সতের বছর বয়সে প্রথম বিলেত যাত্রাকালে বাঙালি যাত্রীদের হতভম্ব আড়ষ্ট ভাব দেখে, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আমাদের মনে পড়তে পারে-

> জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের “সার” “সার” বলে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধোবাধো করত।- জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ওরকম সংকোচ বোধ হত-, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যেকাজ করতে যান-, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে।[88]

---

[86]ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৯।

[87]জগদীশচন্দ্র বসু, “লণ্ডনের গল্প”, *আচার্য জগদীশ্চন্দ্র, লেডী অবলা বসু রচনাবলী* (কলকাতা: বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন, ১৪১৬*)*, পৃষ্ঠা- ১৪৯।

[88]“য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র” (পঞ্চম পত্র), পৃষ্ঠা- ৮১০।

অবশ্য সাহেব চাকরদের হুকুম প্রদানের বা সহযাত্রী সাহেবদের সঙ্গে ওঠা-বসার প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর দীর্ঘ যাত্রাপথে জাহাজ কিন্তু প্রায়শই উপনিবেশিত মননে গ্রথিত যে 'পরাধীন প্রাচ্য' আর 'স্বাধীন পাশ্চাত্য'-এর বোধ তার এক মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে কাজ করছে। যেখানে ভারতীয়রা 'ইংরেজ'/ সাহেব/ ইউরোপীয়-দের এক নতুন চরিত্র আবিষ্কার করছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লেখেন-

> ভাবিয়াছিলাম যে, ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবদের সাথে বড় কথা কহিব না; কিন্তু করি কি? একাকী থাকিয়া মন খারাপ হইয়া উঠিল; সাহেবদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। সাহেব ও বিবিরাও আমার সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না দেখিলাম। তাঁহারা ভারতবর্ষেই দেশীয় বিদ্বেষী, জাহাজে উঠিলে আর সমানভাবে কথা কহিতে লজ্জাবোধ করেন না। ইহা কি মাটীরই গুণ, না, অন্য কোন কারণ আছে?[89]

বস্তুত ঔপনিবেশিক সম্পর্কের অসম অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে একাসনে বসে খাওয়া-দাওয়া বা গল্পগুজব করার অভিজ্ঞতা রীতিমতো অভিভূত করতে থাকে শাসিত চৈতন্য এবং তার অভ্যস্ত অবমাননার স্মৃতিকে। স্বর্ণকুমারী দেবী ইউরোপগামী ডুনরো জাহাজে চেপে মাদ্রাজ যাওয়ার সময়, জাহাজের নানান অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যান দিতে দিতে এই সমানুভূতির বোধটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন,

> আমি জাহাজের অন্য সমস্ত আয়াসের কথা বলিয়াছি কিন্তু ইহার সর্বোচ্চ সর্ব্বপ্রধান আয়েসের কথা এখনও বলা হয় নাই। জাহাজে শ্বেত-কৃষ্ণের, জেতৃ-বিজেতৃর বিজাতীয় উচ্চনীচ বিদ্বেষ ভাব অনুভব করা যায় না, অন্ততঃ আমি ত করি নাই। এই বিশাল সমুদ্রে

---

[89]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, "বিলাতের চিঠি", *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*, রথীন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.) (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১), পৃষ্ঠা- ৭০৩।

> ভাসমান ক্ষুদ্র জাহাজখানিতে ক্ষণকালের জন্য যে কয়েকটি ক্ষুদ্র জীব অদৃষ্টের অপূর্ব্ব যোজনায় একত্রে ভাসিয়াছে, তাহারা সকলেই মনুষ্য, প্রকৃতভাবে সহযাত্রী। একজন অন্যের সুবিধার অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলে। মনুষত্বের একতার এই স্বাদটুকু এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু, উপভোগ্য, আরাম। এখানে দাসদাসীর নিকটেও তুমি যেমন সম্মানীয় একজন ইংরাজও তেমনি, কিছুই ইতর বিশেষ নাই।
> এমন কি জাহাজে বসিয়া ইংরাজের বুদ্ধি কৌশলের তরিফ করিয়া তুমিও গর্ব্ব অনুভব কর; কেননা এখানে কেবল সে ইংরাজ, তুমি বাঙ্গালী নহ, উভয়েই সমান মনুষ্য, মনুষ্যের যাহা খ্যাতি তাহা তাহার হইলে তোমারো বটে।[90]

বস্তুত "উভয়েই সমান মনুষ্য, মনুষ্যের যাহা খ্যাতি তাহা তাহার হইলে তোমারো বটে।[91]"- উপনিবেশিত সমাজের দৈনন্দিন যাপনে অনুপস্থিত এই 'বোধ'-এর স্বাদ, বাঙালি যাত্রীদের শুধু সমানুভূতির সুখই দেয় না, সময়বিশেষে বিরোধিতার সাহসও জোগায়। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন, সাহেবদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বিরুদ্ধতার বেশ কিছু নমুনা পেশ করেন। কলকাতার দোকানদারদের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদই হোক[92], ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বিতর্কই হোক[93] বা ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়েই হোক[94]- স্পষ্টবাদী সমুচিত জবাব দিতে তিনি পিছপা হননা।

---

[90]স্বর্ণকুমারী দেবী, "সমুদ্রে", *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ,* অভিজিৎ সেন ও উজ্জ্বল রায় (সম্পা.) (কলকাতা: স্ত্রী, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা- ৩৮।

[91]প্রাগুক্ত।

[92]"সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "These are worse than the Calcutta shop-keepers. They (Calcutta shop-keepers) come down only from Rs. 50/- to 3/- and not from Rs. 100/- to 2/-" আমি তাহাতে উত্তর দিলাম, But they are better than the English shop-keepers, for they would ask for Rs. 100/- and would stick to it, though the real price is 2/-"

[93]"একদিন এক সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মটা যে কিছুই না, কেবল গোটাকতক ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম- একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন; তিনি বলিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মই সত্য; কারণ, পৃথিবীর সকল সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতিই খৃষ্টান। যদি খৃষ্টধর্ম্ম সত্য না হইত, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য হইত, তাহা হইলে সব সভ্য জাতি (অর্থাৎ ইয়ুরোপ) খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্ম হইত। অথবা ব্রাহ্মরা খুব পরাক্রান্ত হইত। আমি বলিলাম, "গ্রীক-রোমীয় মুসলমান জাতিও এক সময়ে পরাক্রান্ত ছিল, অতএব, তাহাদের সকলের ধর্ম্মই যে আদ্যন্ত সত্য ছিল তাহা প্রমাণ হয়

আমরা বুঝতে পারি, উপনিবেশিত অধীনতার যে অভ্যস্ত বাস্তব তাকে কিছুটা হলেও যেন অতিক্রমণের সুযোগ করে দেয় এই দিনকয়েকের জাহাজী জীবন।

প্রসঙ্গত যাত্রাপথেই, প্রথম ভ্রমণকারীরা নিজেদের অবস্থান তথা পরিচয়ের একাধিক তলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান- ভারতীয়, বাঙালি, হিন্দু, প্রাচ্যবাসী। বস্তুত এই ‘প্রাচ্যবাসী’ পরিচয়টি একদিকে যেমন পাশ্চাত্যের সাপেক্ষে নানা নেতিবাচক চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। তেমনিই আবার ভ্রমণকালে অনেকসময়েই, উপনিবেশিত জাতির আত্মনির্মাণের তথা আত্মপ্রতিরোধে বিশেষ জরুরি হয়ে ওঠে। এড্ওয়ার্ড সঈদ যদিও ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের- জোন্স, কোলব্রুক, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-কাব্য-পুরাণ

না। পার্থিব বাহুবলের সহিত নৈসর্গিক ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। এক ধর্ম্ম অন্য উচ্চতর ধর্ম্মকে স্থান দিবে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মাবলম্বী যে পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে বাহুবলে পরাক্রান্ত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।” (পৃষ্ঠা- ৭০৩)

[94]“আর একদিন একজন সাহেব আমায় বিশ্বাস করাইবার জন্য খুব যত্নশীল হইলেন যে, “ইলবার্ট বিলে হিন্দুরা বড় মূর্খতা ও ধৃষ্টতা করিয়াছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন?” তিনি বলিলেন, “আমরা ইংরাজ জাতি বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন। বাঙ্গালীদের কি অধিকার যে আমাদের দোষাদোষ বিচার করে?” আমি বলিলাম, “ইংরেজের কি অধিকার যে বাঙ্গালীকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে? পরাক্রান্ত মনুষ্য দুর্ব্বলকে অযথা পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য কি আরও উচ্চতর আইন ও আদালত থাকা উচিত নহে?” তিনি বলিলেন, ‘তোমরা তিন চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমাদের দেশের রীতি-নীতি কিছুই জানিতে পার না, আমাদের উপর বিচার করিবে কিরূপে?” আমি উত্তর করিলাম- “আর তোমরা আমাদের রীতি-নীতি বোধ হয় বিলাত হইতেই দৈব শক্তিতে জানিতে পার এবং তাহার জন্যই তোমরা আমাদের বিচার করিতে পার।” তিনি বলিলেন, “Two blacks make no white” (অর্থাৎ দুই মন্দতে মন্দ বাড়িতেই পারে, কমিতে পারে না)। আমি বলিলাম- “But two equal forces balance each other” তোমরা যদি জান, আমরা মনে করিলে তোমাদের উপর অবিচার করিতে পারি, তাহা হইলে তোমরাও আমাদের উপর অবিচার করিতে সাহসী হইতে না।” আর একজন সাহেব বলিলেন, “তুমি তাহা হইলে patriot?” আমি বলিলাম- “আমি অত উচ্চ নামের যোগ্য নহি।” তিনি বলিলেন, “আমি ইচ্ছা করি, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, আর অন্য জাতি আসিয়া বাঙ্গালীকে ছিন্নভিন্ন করে, তাহারা যেরূপ ইংরেজ-বিদ্বেষী সেইরূপ ফল পায়।” আমি বলিলাম,- “আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি যে, ইংরাজরা একবার ভারত হইতে চলিয়া গেলে...সাহেবরা কিরূপে অনাহারে মরে?” এটি তাঁহার শ্রুতিসুখকর না হওয়ায় তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। আমি অবশ্য তাঁহারই জন্য ইহা বলিয়াছিলাম।” (পৃষ্ঠা- ৭০৪-৭০৫)

জ্ঞানচর্চার ধারাকে ঔপনিবেশিক আত্তীকরণেরর প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখছেন- “Orient is an idea that has a history and tradition of thought, imagery and vocabulary that have given it reality and presence in and for the west.”[95] তবে ভারত তথা বাংলার এলিটগোষ্ঠীর দিকে তাকালে বোঝা যায় এক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা নেহাৎ মূক-বধিরের ছিলনা। বরং প্রাচ্যবাদীদের প্রকল্পের নানা প্রক্ষিপ্ত উপকরণ দিয়েই তাঁরা নিজেদের জাতীয় ইতিহাসকে সাজিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ফলে বর্তমান পরাধীনতার গ্লানি ভুলতে তাঁরা প্রায়ই অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের আখ্যানকে সামনে নিয়ে আসেন যা আসলে অনেকাংশেই উপনিবেশিত জাতির আত্মপ্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে চায়। তাই ইউরোপের মানুষের প্রাচ্য সম্পর্কে নানা ‘উদ্ভট’ ধারণার মুখোমুখি হয়ে, ত্রৈলোক্যনাথ যখন রীতিমতো তাদের সঙ্গে কৌতুক করেন, তা যেন ইউরোপের প্রাচ্যজ্ঞানের সারবত্তাহীনতাকেই ধরিয়ে দেয়।

---

[95]Edward. W. Said, “Introduction”, *Orientalism: Western concepts of Orient* (Penguin Books) 1985.

গন্তব্যের পথে পথে

(১)

গন্তব্যে পৌঁছে, যাত্রীদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইলে প্রথমেই শুরু করতে হয় দীর্ঘ যাত্রাপথে নানান স্পর্শবিন্দু ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে বিলেতের মাটিতে পা রাখার অপেক্ষা ও অপেক্ষা শেষের উত্তেজনার কথা দিয়ে। যে বর্ণনা প্রায় প্রতিটি বৃত্তান্তের লেটমোটিফ হয়ে ওঠে। বস্তুত আমরা উপনিবেশিত বাঙালির চেতনার ঐতিহাসিকতাকে ধরতে পারি এই অদম্য 'উত্তেজনা'-র মধ্যে দিয়ে। আগেই বলেছি, স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমের মধ্যে দিয়ে আমাদের অধিকাংশ ভ্রমণকারী ইউরোপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন গভীরভাবে এবং বাস্তবে ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দেওয়ার বহু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁদের 'মানস' ভ্রমণের পর্ব। ফলত লণ্ডনকে এই দেখা যেন নতুনকে দেখা নয়, বরং দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মোলাকাত হয়ে ওঠে। আবেগাপ্লুত ত্রৈলোক্যনাথ যেমন বলে ওঠেন-

> অপরাহ্ন একটার সময় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করিলাম। সেই সময়ে বহুরকম ভাবাবেগ আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে ইংল্যাণ্ডের কথা শিশুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এবং সেই ইংরেজ জাতি, যাহার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ে

আমরা মিলিত হইয়াছি, আমি এখন সেই ইংল্যান্ড এবং সেই ইংরেজদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।”[96]

জাহাজে সাহেব যাত্রীদের সঙ্গে ভারত বিষয়ে নানা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ‘হৃদয়’-ও কিন্তু একইভাবে স্পন্দিত হতে থাকে আনন্দে-অবিশ্বাসে-

আমি লণ্ডনে। বৃটেনের রাজধানী;- সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত ইংরাজের কেন্দ্র,- সভ্যতার, বাণিজ্যের উন্নতির, বিজ্ঞানের বিলাসভূমি;- জগতের হাস্যময়, উল্লাস-ধ্বনিময়, আলোকিত মন্দির; ক্ষমতার, বীরত্বের, সম্পদের, গৌরবের জীবন্ত নিদর্শন; বৃটিশের জাজ্বল্যমান গরিমা,- আজ লণ্ডনে আমি। যে লণ্ডনের কথা কত পড়িয়াছি;- নানা জাতির ক্রমান্বয়ে এই স্থানের প্রভুত্ব, সেক্সনের, রোমীয়ের, জর্ম্মানের আনুক্রমিক এই স্থানে রাজত্ব; উইলিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত বৃটনেশ্বরের এই স্থানে বাস; যাহা স্পেন্সারাদি কবিকুলের ধাত্রী-সেই লণ্ডনে আমি! কত সব ভূত-কালে ইতিহাস-কথিত কথা মনে আসিল। সত্যই আনন্দ হইল, বিস্ময় হইল, ভক্তি হইল; বর্ত্তমানে প্রায় অবিশ্বাস হইল; ভাবিলাম- আমি সত্যই কি লণ্ডনে?[97]

বস্তুত বিশ শতকের অনেক কথনে জাহাজ বা যাত্রাপথের নানা ধাপ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে পা রাখার বর্ণনা দৈর্ঘ্যগতভাবে ক্রমে সংক্ষিপ্ত হলেও ইউরোপ বা ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখার উত্তেজনার পারদ কিন্তু সেখানেও কমে না। কমে না ‘শিশুকাল হইতে পুস্তকে’ পড়া ইংল্যান্ড বিষয়ে রোম্যান্টিক মুগ্ধতাও। এবং সেদেশে পৌঁছে সেদেশের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থানগুলিও তাঁরা প্রায় একইরকমের উত্তেজনা আর আগ্রহের সঙ্গে দেখেন।

---

[96]ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৮।

[97]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭১০।

ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রেখে ভারতবাসী তথা বাঙালিদের ঔপনিবেশিক আবহের সম্পর্কের হিসেবনিকেশগুলি স্পষ্টতর হতে থাক। যে ফারাক বাঙালি শনাক্ত করতে শুরু করেছিল জাহাজযাত্রা থেকেই। ভারতে চাকরিরত-শাসনরত ইংরেজ আর ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ইংরেজ যেন দুটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পরিণত হয়। আবার ইংরেজ সমাজের নানা ভাগাভাগি ধনী-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজের পারস্পরিক ভেদগুলি ক্রমে স্পষ্ট হয়। ফলত ভারতের মাটিতে যে ইংরেজ শব্দ তথা পরিচয়টি ছিল 'ক্ষমতা'-র সূচক ইংল্যান্ডে এসে তা হয়ে ওঠে একটি স্তরায়িত ধারণা। ইংরেজ জাতি সম্পর্কে ভাল-মন্দের নানাত্বে ভরা এক অসমসত্ত্ব ধারণা গড়ে উঠতে থাকে তাঁদের। একদিকে সাধারণ ইংরেজের জ্ঞানস্পৃহা, রাজনৈতিক সচেতনতা বেশিরভাগ ভ্রমণকারীদের মুগ্ধ করে। বিশেষত তথাকথিত নীচু শ্রেণির লোকেদের ভিতরেও রাজনৈতিক আলোচনা বা সংবাদপত্র পাঠের প্রবণতা, আমাদের উচ্চ বা মধ্যবিত্ত ভ্রমণকারীদের যথেষ্ট বিস্মিত করে। দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন-

> বিলাত ভারতবর্ষ নহে। (তুমি হয় ত বলিতে 'কি নূতন কথাটা!!) এখানে লোকে দিনে ঘুমায় না, (যদিও আমি মধ্যে মধ্যে দিনে ঘুমাইয়া থাকি) তাহারা দেশের খবর 'টবর' লইয়া থাকে। সামান্য কৃষকও রাস্তায় খবরের কাগজ হাতে করিয়া যায়। গড়োয়ান কোন জায়গায় গাড়ী থামিলেই, একটু সুবিধা পাইয়া, পকেট হইতে খবরের কাগজ বাহির করিয়া পড়ে। চাকরানী, ছেলেটীকে কোলে করিয়া না গেলেও, ছোট ছেলের গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে খবরের কাগজ পড়ীতে পড়ীতে যায় এবং রাজনীতির কঠিন প্রশ্ন লইয়া তর্ক বিতর্কও লাগাইয়া দেয়।[98]

একই বিস্ময় আমরা দেখতে পাই কৃষ্ণভাবিনীর কথনেও-

---

[98]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,, পৃষ্ঠা- ৭২৬।

> আমাদের দেশে যে প্রকার লোক সংবাদপত্র কাহাকে বলে জানে না, এখানে সে শ্রেণির লোকেরা অতি আগ্রহের সহিত খবরের কাগজ পড়ে এবং উহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করে। এখানকার দোকানদারেরা- মুদী, কসাই, আলুওয়ালা ইত্যাদি- সকলেই খবরের কাগজ পড়ে; গাড়োয়ানেরা গাড়ী চালাইতে চালাইতে স্বদেশে বা বিদেশে কোথায় কি ঘটিতেছে, কোন প্রকার যুদ্ধ, বিগ্রহাদি হইতেছে কি না জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা সহকারে সংবাদপত্র পাঠ করে।[99]

বস্তুত সাধারণের এই সচেতনতা, জ্ঞানার্জনের চেষ্টাকেই ত্রৈলোক্যনাথের ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের উন্নতির মূল ভিত্তি বলে মনে হয় । তিনি লেখেন -

> অগণিত দর্শক আসিতেছেন প্রতিদিন। ইহা হইতে একটি জিনিস স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় উন্নতির মূলে যে রহস্যময় কারণটি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি। ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎসা এবং যাহা কিছু আরও ভাল, তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি।[100]

পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজের উন্নতির কারণ অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ, ভ্রমণকারীদের পর্যবেক্ষণের পরিসরে বিশেষ জায়গা করে নেয়। তাই জাহাজে চড়েই ইংরেজ জাতির কর্মকুশলতার যে পরিচয় তাঁরা পেয়েছিলেন সেই ধারা বহাল থাকে, ইংল্যান্ডের মাটিতে নেমেও। ইংল্যান্ডের পথে-ঘাটে সর্বত্র নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার রেওয়াজ দেখে যেমন জগদীশচন্দ্র প্রশংসা করে লেখেন-

---

[99] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃষ্ঠা- ১১৭।

[100] ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৬৮।

> জাহাজ হইতে নামিয়া ষ্টেশনে উঠিয়া দেখিলাম, অন্য এক পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমাদের দেশের ষ্টেশনের মত এখানে গোলমাল চীৎকার কিছুই নাই। এখানেও নিঃশব্দে কলের মত কাজ চলিতেছে।...লণ্ডন সহরে সমুদয় কার্য্যেই এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলাম, রাস্তায় অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন, বাইসিকল, ছোট ছেলেদের পিরাম্বুলেটার, এবং বৈদ্যুতিক গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। প্রথমে এত জনতা দেখিয়া গাড়ীতে উঠিতে আমার ভয় হইত। সর্ব্বদাই মনে হইত কখন কোন দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু সকলেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন বলিয়া, দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটে। গাড়ী চালাইবার যে নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।[101]

প্রায় একইরকমের প্রশংসার সুর শোনা যায় দুর্গাবতীর লেখাতেও-

> রাস্তায় সব সময় বেশী ভীড় থাকা সত্ত্বেও লোকের গায়ে-পড়াপড়ি নেই। কেউ কাউকে ধাক্কা দিয়ে অযথা সময় নষ্ট ক'রে গালিগালাজ করে না। রাস্তার মাঝখানে ফলের খোসা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো প'ড়ে থাকেনা। তার জন্য গাছের গায়ে জালের খাঁচা করা আছে। থিয়েটার, সিনেমার টিকিট-ঘরের সামনে লোকের হুড়াহুড়ি নেই, সবাই নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত লাইন ক'রে পরের পর এগতে থাকে, তার জন্য যতক্ষণ সময় লাগুক, বিরক্তি নেই তা'তে। এই সব ধরণ শেখবার মত।[102]

অনেক ভ্রমণকারীর লেখাতেই আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী হিসেবে সেদেশের পুলিশদের ব্যাপারেও বিশেষ কৌতূহল দেখা যায়। দুর্গাবতীই বলেন-

> এখানকার পুলিস একটা দেখবার জিনিষ। পুলিস হ'তে গেলে ৬ ফুট লম্বা হওয়া চাই। রাস্তাঘাটে কোথাও কোন জায়গা সম্বন্ধে জানবার থাকলে পুলিসের সাহায্যে সম্ভব হ'তে

---

[101]জগদীশচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা- ১৫০।

[102]দুর্গাবতী ঘোষ, *পশ্চিমযাত্রিকী*, অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ি (সম্পা.) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃষ্ঠা- ৫৫।

> পারে। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ীর চলাচল অত্যন্ত বেশী। জানালা দিয়ে দেখেছি কাতারে কাতারে লোক, গাড়ীঘোড়া, ট্রাম, বাস, মোটর চলছে, টুঁ শব্দ নেই। পুলিস এসব বেশ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন করছে।[103]

ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাট, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা পরিসরের পাশাপাশি ভ্রমণকারীরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন ইংল্যান্ডের গার্হস্থ্য জীবনের নানা খুঁটিনাটিও। একটি উন্নত, শক্তিশালী রাষ্ট্র তথা সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব যে অপরিসীম সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই কমবেশি সংশয়হীন থাকেন। তবে, ইংল্যান্ডের ধনী পরিবারের অতিরিক্ত আড়ম্বর বা নিম্নবিত্ত পরিবারের মদ্যপানের অভ্যাস বা আচারব্যবহার নয়, ভ্রমণকারীদের মূলত আকৃষ্ট করে ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের কাজে-কর্মে হাজারো বিশৃঙ্খলা, রুচি আর সৌন্দর্যবোধের অভাবের সাপেক্ষে ইংরেজদের অন্দরসজ্জা থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক প্রীতি-উষ্ণতা সবই ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতে থাকে তাঁদের। শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন ইংরেজদের মতো একটি ‘সভ্য’ জাতির চারিত্রিক শক্তির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেন- “ইংরাজ জাতির উন্নতির ও মহত্ত্বের আর একটি মূল কারণ লক্ষ করিলাম। তাহা ইংরাজের গার্হস্থ্য-নীতি। মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ একটি দেখিবার জিনিস। দশদিন তাহার মধ্যে বাস করিলে মনে এক অভূতপূর্ব শান্তি আনন্দ ও পবিত্রতা অনুভব করা যায়।”[104] দ্বিজেন্দ্রলাল, ইংরেজদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার পরিচয় পান তাদের সুষ্ঠ গৃহসজ্জার ভিতরেও- “““ঘরের মধ্যে যাও, আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখিবে। যথাস্থানে টেবিল, চেয়ার, বাসন, পুস্তক সজ্জিত,- দেখিলে চোখ জুড়ায়

---

[103]দুর্গাবতী, ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৫৩।

[104]শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত* (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯), পৃষ্ঠা- ২৪২।

যায়।”[105] এবং বিলেত প্রত্যাগতরা যে স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজদের গৃহসজ্জা অনুকরণ করেন এবং তা যে বাঞ্ছনীয় সে মতামতও পেশ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল-

> বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর বা খৃষ্টানদিগের বাড়ী দেখিবে, পূর্ব্বপুরুষ প্রথাবলম্বী বাঙ্গালীদের বাটী অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন, তাহাদের বেশভূষা পরিষ্কার এবং স্বল্প-বেতনভোগীরও বাসস্থান স্বচ্ছন্দতাময় ও সুশৃঙ্খল। তাহার কারণ, তাহারা ইংরাজের আবাস-প্রথা দেখিয়া নিজেরাও সেই প্রথাবলম্বী হইতে চায়, পূর্ব্বাবস্থায় আর সন্তুষ্ট থাকে না। আরাম বুঝিলে আরামের উপাদান পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না।[106]

বস্তুত পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য বা গৃহচিত্রের বিষয়টি প্রায় সব ভ্রমণ কথনেরই অংশ হয়ে উঠলেও নারীদের লেখা বৃত্তান্তগুলিতে এই পর্যবেক্ষণ এক বিশেষ মাত্রা পায়। কৃষ্ণভাবিনী দাস বা দুর্গাবতী ঘোষের লেখায় নারী সংক্রান্ত নানা বিষয়ের নিরীক্ষণ, ইংল্যান্ড ও ভারতীয় নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের ব্যাপারে তুলনা-আলোচনা-সমালোচনার এক বিস্তৃত পাঠ তৈরি হয়। কৃষ্ণভাবিনী ইংল্যান্ডের পারিবারিক জীবনের নান্দনিকতায় মুগ্ধ হয়ে লেখেন-

> ...ইহাদের পারিবারিক জীবন অতি আনন্দময় ও চমৎকার।...একটি সুন্দর, মনোনীত ও পরিষ্কার গৃহ- চারিদিকে জানালা দরজা সব বন্ধ- ঘরের ভিতরে জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে বসিয়া, পতিপরায়ণা, মনোরমা ও সুসজ্জিতা স্ত্রীর সহিত মধুর আলাপ- উত্তম লালিত পালিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সন্তানদের ঈষদারক্ত বদনের প্রফুল্ল হাসি- ঘরের প্রচুর আসবাব- আবশ্যক ও আরামদায়ক দ্রব্যসকলের সম্ভার- গৃহের সমস্ত জিনিস উত্তমরূপে সাজান- এগুলিই এ প্রকার বিষাদজনক শীত ঋতুর অধিবাসী ইংরাজেরা পরম সুখ ও আরামের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে।[107]

---

[105]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭১৫।

[106]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭১৭।

[107] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৯৯-১০০।

আমরা বেশ বুঝতে পারি, ভারতের যৌথ পরিবারে যেখানে দিনের আলোয় বা সকলের সামনে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে সময় কাটানো বা গল্পগুজব প্রায় অসম্ভব এক ধারণা- সেই ব্যবস্থার ভুক্তভোগী কৃষ্ণভাবিনীর কাছে ইংল্যান্ডের নিবিড় ও নিভৃত পারিবারিক চিত্রটি স্বভাবতই স্বপ্নালু মনে হয়। বস্তুত অতীব রক্ষণশীল পরিবার থেকে আসা কৃষ্ণভাবিনীর লেখায় ইংল্যান্ডের দাম্পত্য জীবনের নানা খুঁটিনাটি, বিশেষত নারী-পুরুষের মেলামেশার স্বাধীনতা বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক নির্ভরতার ছবি বিশদে উঠে আসে-

> বাস্তবিক ইংরাজদের দাম্পত্যজীবন আমার নিকট অতি সুখময় ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সুখের সময় দুজনের সমানরূপে সুখভোগ করে, এবং দুঃখের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে ক্লেশ সহ্য করে। এদেশে স্বামী বেড়াইতে বা কোন আমোদের স্থানে গেলে স্ত্রীকে কখন পশ্চাতে ফেলিয়া যান না। স্বামী ধনোর্পার্জ্জন করিয়া কেবল নিজের সুখ হইলে সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্ত্রীকেও যথাসাধ্য সুখী করিতে চেষ্টা পান। প্রতি রবিবারে স্ত্রীপুরুষ প্রায় একসঙ্গে গিঈজ্জায় যায়, আও প্রার্থনা করে, একসঙ্গে ধর্ম্মপুস্তক পড়ে ও পরামর্শ লন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভু না ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয় সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। এজন্য ইংরাজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া অন্য কোন বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এক কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত; ইঁহারা স্বামীদের অনেক সৎকর্ম্মে পরামর্শ দেন এবং স্বামীও আহ্লাদ ও আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।[108]

---

[108] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৯৫।

পরাধীনতায় আবদ্ধ পর্দানশীন ভারতীয় জীবনের তুলনায় নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশার স্বাধীন জীবনচিত্র ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে তাঁকে, তিনি লেখেন, "এদেশে এত প্রকার, আমোদজনক দৃশ্য আছে, কিন্তু আমি সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোক ও পুরুষের সভা, স্ত্রীলোক ও পুরুষের এক সঙ্গে খেলা, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকেদের শ্রেণিবদ্ধ হইয়া স্কুলে যাওয়া- এই সকল দেখিতে অধিক ভালোবাসি। সকলেই কেমন ভাইভগিনীর ন্যায় একত্রে বেড়াইতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, ইহা দেখিলে কোন্ ভারতরমণীর মন আহ্লাদে না পরিপ্লুত হয়?"। এবং

নারী-পুরুষের সহজ অনাড়ষ্ট এই মেলামেশির দৃশ্য স্বভাবতই তাঁকে মনে করিয়ে দেয় এই বিষয়ে ভারতীয় সমাজের বৈপরীত্যের কথা, দেশের গৃহবন্দী নারীসমাজের বদ্ধ জীবনের কথা,

"আবার ইহাদের সুখ দেখিয়া আমাদের দুঃখ ভুলিবার পরিবর্ত্তে উহা দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। এখানে চারিদিকে ইংরাজমহিলাদের মুখে যত স্বাধীনতার ছবি নিরীক্ষণ করি, তত সেই অধীনতাপীড়িত ভারত-ললনাদের বিনম্র বদনের মলিন ক্লান্তি ধীরে ধীরে আমার অন্তরে জাগরূক হয়।"[109] ইংল্যান্ডের নারীশিক্ষার স্বাধীনতা সম্পর্কেও সযত্ন দৃষ্টি দেয় নারী কথনগুলি। সেদেশের মেয়েদের বিদ্যা চর্চার যথাযথ পরিকাঠামো বিষয়ে কৃষ্ণভাবিনী বলেন-

> ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকেদের শিক্ষার জন্য বিলক্ষণ সুবিধা আছে। কোন নগরে বালিকাদের ভাল ভাল স্কুল ও কলেজের অভাব নাই; লণ্ডনে প্রায় প্রতি পাড়াতেই দুই তিনটা করিয়া ছোটছোট বালিকাবিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদের মত বালিকাদের দলে দলে স্কুলে যাইতে এবং যুবকদের মত যুবতীদের কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতে দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। এখানে স্ত্রীলোকেরাও ছয় সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ী পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে

---

[109] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ১৫২।

> পড়িয়া থাকে। অনেকে আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকে না, শিক্ষিত ইংরাজ পুরুষদের মত জীবনের শেষপর্য্যন্ত বিদ্যাচর্চ্চায় নিমগ্ন থাকে।[110]

দুর্গাবতী ঘোষ আবার বিলেতের মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে নিজের আলোচনার কেন্দ্রে রাখেন ভারতীয় মেয়েদের। তিনি বলেন,

> বিলেত-ফেরত অনেক পরিচিত ছেলে ও মেয়ের কাছে অনেক সময় শুনতুম বিলেতের মেয়েরা যেমন খাটতে পারে, আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন পারে না। তাদের এ বিষয়ে বাহাদুরি খুব। শুনে পর্য্যন্ত এই সব মেয়ের কাজ করার ধরণ দেখে শেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। এখানে এসে দেখলুম এরা খুবই খাটতে পারে সে কথা সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের মতন ক'রে কাজ করতে হ'লে কিছুতেই পেরে উঠত না।[111]

বস্তুত তিনি ইংরেজ নারীর জীবনের নানা সুযোগ-সুবিধার সাপেক্ষে ভারতীয় নারীর সাংসারিক নানা প্রতিকূলতা, প্রযুক্তি-পরিকাঠামোর অভাব এবং সর্বোপরি সংসারের পুরুষ সদস্যদের আত্মপরায়ণতার দিকটি সযত্নে বিশ্লেষণ করে দেখান। আমরা বুঝতে পারি, ভ্রমণকারীরা কেউই ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা, প্রসাধনের অতিরেককে সমর্থন করেন না। ইংরেজ মহিলার তুলনার ভারতীয় মহিলাদের বিনয়বোধ ও দয়াধর্মও অধিক বলে মনে করেন তাঁরা। দুই দেশের মহিলাদের স্বভাবের তুলনা টেনে কৃষ্ণভাবিনী বলেন-

> ইংরাজ মহিলারা বিনয়বতী ও আতিথেয়ী নয়। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় ইহারা শিষ্টাচার পূর্ব্বক আলাপ করিতে জানে না এবং কোন অভ্যাগত ব্যক্তি বাড়ীতে

---

[110] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃষ্ঠা- ৭৪-৭৫।

[111]দুর্গাবতী, ঘোষ পৃষ্ঠা- ৫৫-৫৬।

> আসিলে ভারতমহিলাদের মত ইহারা নিজের আহার ত্যাগ বা অগ্রাহ্য করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতে অগ্রসর হয় না। শুনিয়াছি অনেক স্থানে কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে ইহারা প্রথমে নিজেদের জন্য ভাল জিনিসগুলি রাখে আর অবশিষ্টগুলি তাহাদের খাইতে দেয়। এইরূপ কথা অত্যুক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত কেহই দেখিতে পাইবে না এবং এরূপ কথাও কখন শুনা যায় না। অনেক কঠিন গুণ না থাকিলেও ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়া, মায়া স্নেহ, মমতা, ইত্যাদি কোমল গুণে অলঙ্কৃতা; এ সকল সদগুণে আমরা কোন জাতির নিকট হার মানি ন ।[112]

এবং তাঁর মনে হয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার এবং বহুলাংশে পুরুষ সমাজের অসহযোগিতার কারণে ভারতীয় মহিলাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার সঠিক বিকাশ হয়না, "হিন্দুরমণীদের বিলক্ষণ তেজ ও সাহস ছিল, এখনও আছে, কিন্তু কেবল স্বাধীনতা ও শিক্ষার অভাবে আমরা উহার পরিচয় দিতে পারি না। পুরুষদের তাচ্ছিল্য ও সামাজিক কুসংস্কারই হিন্দুস্ত্রীদের হীনাবস্থা ও সকল অমঙ্গলের কারণ।" বস্তুত ইউরোপের নারীসমাজ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যে দিকটি বিশেষভাবে চোখে আসে তা হল ইংরেজ নারীর জীবনের নানা সুখ-সুবিধা দেখে আকৃষ্ট হলেও ভ্রমণকারীরা কেউই কিন্তু অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে 'নকল' মেমসাহেব সাজার পক্ষপাতী থাকেন না, বরং বিদেশী আর দেশী গুণের সঠিক সমন্বয়ের উপর জোর দেন। পুণ্যলতা চক্রবর্তী 'আধুনিক' নারীর আদর্শ মডেলের প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন বলেন-

> বংলাদেশে যঁরা একাজে (নারী শিক্ষা ও তাদের সামাজিক উন্নতি) অগ্রণী ছিলেন তাঁদের কয়েকজনকে ভাল করে জানতাম। তাঁরা সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা, এবং অনেকে 'বিলাৎফেরত'

---

[112] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৭৮।

> মহিলা। বিলাতি কায়দাকানুন সবই তাঁদের জানা ছিল, কিন্তু সে সব ছিল তাঁদের নিতান্তই বাহিরের জিনিস- মনেপ্রাণে তাঁরা বাঙালীই ছিলেন। বিলাতের মেয়েদের কতগুলি সদ্‌গুণ তাঁদের ভাল লেগেছিল, সেগুলিই তাঁরা নিজেদের এবং দেশের মেয়েদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে সরলা রায় বলতেন,- 'আমি চাই যে আমাদের মেয়েরা ঘরে-বাইরে সমান কাজের মেয়ে হবে- তারা "স্মার্ট" হবে, "মডার্ণ" হবে, কিন্তু বাঙালী মেয়েই থাকবে। নকল মেমসাহেব তারা হবে না।' নকল মেমসাহেবদের কৃত্রিম মিহি সুর, বিকৃত উচ্চারণ আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির এমন চমৎকার নকল করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে এখনও মনে করলেই হাসি পায়।[113]

অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ব্যাখ্যায় উনিশ শতকের এলিট বাঙালির কাঙ্ক্ষিত যে 'অ-ইউরোপীয় আধুনিক ভারতীয় সত্তা'-র কথা বলেছিলেন, এঁরাও আদতে ঠিক তেমনই স্বদেশী ও বিদেশী ভাবের 'সুচিন্তিত' সংশ্লেষে ঘরে-বাইরে সমান সপ্রতিভ এক 'আধুনিক' নারীর চিত্র কল্পনা করেছিলেন। যিনি পাশ্চাত্যের নারীদের কিছু গুণ রপ্ত করবেন ঠিকই কিন্তু স্বভাবে পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানা বজায় রাখবেন।

ইংরেজদের আচার-আচরণের বেশ কিছু দিক ভ্রমণকারীদের রীতিমতো হতাশও করে। সেদেশের ফ্যাশনপ্রীতি, অর্থপ্রীতি, অহঙ্কারী স্বভাব, মদ্যপ্রীতি ইত্যাদি। বিশেষ করে শেষোক্ত বিষয়টি অনেক যাত্রীর কথনেই বিস্তারিতভাবে উঠে আসে এবং ইংরেজ জাতির অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরেজদের পান দোষ বিষয়ে নিন্দা করে লেখেন,

> অধিক রাত্রে লণ্ডনের রাস্তা যে কি এক মূর্তি ধরে! যাকে দেখি সেই নেশাতে টং। রাত্রি ১১ টার পর যদি কোনো দূর স্থান হইতে রেলগাড়িতে বাড়িতে আসিতে হইত, দেখিতে পাইতাম, স্টেশনে যে টিকিট বিক্রয় করিতেছে সে নেশাতে চুর; স্টেশনের যে লোক

---

[113]পুণ্যলতা চক্রবর্তী, "ভবিষ্যতের সূচনা", *একাল যখন শুরু হল*, জয়িতা বাগচী (সম্পা.) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃষ্ঠা- ৫৬।

> (পোর্টার) গাড়ির দরজা খুলিতে আসিল সে মাতাল, ভালো করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না; যারা একসঙ্গে এক কামরাতে আসিয়া বসিল, তাহারা পুরুষ মেয়ে নেশাতে চুর। নামিয়া ট্রামে বসিলাম, আরোহীদিগের মধ্যে কে কাহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে। যাহার সঙ্গে কথা কহি, তাহার মুখেই মদের গন্ধ। দেখিতাম, আর মনে ভাবিতাম, এত বড় জাতিটার যদি এই পান দোষটা না থাকিত, তাহা হইলে আরও কত কাজ করিতে পারিত![114]

এমন সমালোচনা বিস্তারিতভাবে উঠে আসে আরও অনেকের লেখাতেই। ছোট থেকে ইংল্যান্ড তথা ইংরেজদের বিষয়ে সুপরিচিত ভ্রমণকারীদের কাছে ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের মনে ভারত বিষয়ে নানা অজ্ঞতা বা প্রায় ধারণাহীনতাকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও বিশেষ সুখকর হয়না। ভারতে ইংল্যান্ড শাসন যে বিধাতার পবিত্র অভিপ্রায়, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত এবং ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞীর আদর্শ-অনুগত প্রজা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে তৎপর ত্রৈলোক্যনাথ ভারত সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজের অজ্ঞানতা এবং আজগুবি ধারণা দেখে রীতিমতো বিব্রত হন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই হয়; পেয়িং গেস্ট হিসেবে যে বাড়িতে ওঠেন, সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে তিনি জানতে পারেন তাঁদের মনে ভারতবর্ষীয় অতিথিকে ঘিরে তৈরি হওয়া ‘ভয়’-এর কথা-

> সেদিন মেজো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেই দিন মেজো ও ছোটো মেয়ে, তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওঁরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা

---

[114]শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা- ২১০।

> কয়েছিলেন তবুও দু দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো-ভয় হয়েছিল যে কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন।[115]

ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি পড়বার সময় আমরা দেখতে পাই ইংরেজ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আপাত চাকচিক্যের মাঝে দারিদ্য, শ্রমিক শ্রেণির বিক্ষোভ ইংল্যান্ড তথা ইংরেজ জাতি সম্পর্কে গড়ে তোলা এযাবৎ ভাবনাকে কীভাবে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে বিলেতবাসের অভিজ্ঞতা যে তাঁর ইংরেজ সমাজ সম্পর্কে অনেক ধারণাই বদলে দিয়েছে, সে কথা জানিয়ে কৃষ্ণভাবিনী যেমন লেখেন-

> আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় একটা পুরাণ কথা আছে, ‘যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বর ঘরুণী’;- বাস্তবিক এ কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি। কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে ঘর না করিলে তাহার উপরভিতর ভালমন্দ কখন সম্যকরূপে বুঝা যায় না। মানবচরিত্র সকলস্থানেই এরূপ বিচিত্র যে, লোকে সর্ব্বদাই অপরিচিত বা পরের কাছে যেন একটা মুখোস পরিয়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া থাকে। ঐ মুখোস খুলিয়া প্রতি ব্যক্তি বা জাতির আসল মুখ দেখিবার ইচ্ছা হইলে, ঠাকুরের আসল মুখ দর্শনের ন্যায়- শুধু প্রণামি দিয়া ঐ আশা পূরাইবে যো নাই; উহার জন্য তাহাদিগের সহিত ঘর করিয়া রাতদিন তাহাদের কাছে থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা সময়ে মুখোস ভেদ করিয়া আসল মুখের সহিত প্রকৃতরূপে পরিচিত হইতে পারি। সেইরূপ কোন দেশের অবস্থা ভাল করিয়া জানিতে বাসনা হইলে, তাহার অধিবাসীর সহিত সকল বিষয়ে মিশিয়া একত্র বাস না করিলে উহার বাহির ভিতর পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করা একেবারে অসম্ভব।[116]

---

[115]“য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র” (দশম পত্র), পৃষ্ঠা- ৮২৯।

[116]কৃষ্ণভাবিনী দাস, “ইংরেজ সমাজ”, *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (মূল প্রবন্ধটি ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), পৃষ্ঠা- ২৫।

বস্তুত ভাবনার এই পুনর্মূল্যায়ন যেন ভ্রমণ নামক অভিব্যক্তির কার্যকারিতাকেই আরও একবার ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করে ভ্রমণকারীদের। এবং শাসক জাতি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা করার এই সম্যক ক্ষমতা শাসিতের অবস্থানের একধরনের ক্ষমতায়ন তৈরি করে দেয়। ভারতীয় জীবনযাপন কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ইংরেজদের থেকে উন্নততর; ফলত সময়বিশেষে শাসকের উপরেও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব সেই আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। যেমন ইংরেজ সমাজের মদ্যপ্রীতির বিষয়ে বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, "...কোনো ইংরাজের সহিত আলাপ হইলেই আমি সুরাপানের বিরুদ্ধে ভজাইবার চেষ্টা করিতাম।"[117] এবং সুরাপানের প্রসঙ্গটির সূত্র ধরে তিনি ভারতে ইংরেজ শাসন-শোষণের প্রসঙ্গটিকেও উত্থাপন করে ফেলেন,

> চারিদিকেই ইংরাজজাতির পানাসক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতাম। কোথাও পথের পার্শ্বে দেখি, পর্বতকার আমাদের দেশের ধান্যের স্তূপ রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ধান্যরাশি হইতে মদ প্রস্তুত হইয়া পচা ধান্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখিয়া মনে ভাবিলাম, "ও মা! অন্নাভাবে আমাদের দেশের শত সহস্র দরিদ্র লোক মরিতেছে, আর তাদের মুখের অন্ন আনিয়া এই ব্যবহারে লাগাইতেছে।"[118]

ত্রৈলোক্যনাথ আবার ইংল্যান্ডকে কীভাবে ভারতবাসী সাহায্য করতে পারে সেই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শাসিতের দুর্বল বা অক্ষম তক্‌মাকে ঝেড়ে ফেলে শাসকের সঙ্গে সমান তলে দাঁড়ানোর আপাত অবাস্তবটিকে সম্ভব করে ফেলেন। তিনি বলেন–

[117]শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা- ২১১।

[118]শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা- ২১০-২১১।

> আমরা ইংল্যাণ্ডের লোকদের সে দেশে বাসের ব্যয় কমাইয়া দিয়া বস্তুতঃ সাহায্য করিতে পারি। বিরাট ভারতভূমিতে নানা খাদ্যবস্তু রহিয়াছে। তাহা উচ্চ হিমালয়ের হুনিয়ারা, নীলগিরি অরণ্যের বাদাগারেরা অথবা মহীশূরের মালভূমিবাসী কুরুম্বারা যেভাবে খাইয়া বাঁচে, ইংলণ্ডের দরিদ্র লোকেরাও তেমনি বাঁচিতে পারে। চাউল, গম, ডাল এবং আলুর মত পুষ্টিকর আমাদের জোয়ার প্রভৃতি অনেক শস্য আছে। ইহার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিলে ছোটোনাগপুর, মধ্য প্রদেশ, মধ্য ভারত, মহীশূর, আসাম এবং বর্মায় যে সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনাবাদী পড়ীয়া আছে, তাহাতে জোয়ারের (Sorghum vulgare) শ্বেতগুচ্ছ, কোডোর (Paspatum scaobulrtum) সোনার শীষ, চুয়ার (Amarantus biltum) রক্ত শীর্ষ এবং রাগীর (Eleusine coracana) ব্রাউন রঙের নখর মাথা তুলিবে।[119]

প্রসঙ্গত বৃত্তান্তগুলিতে শুধুমাত্র ভারতীয় জীবনধারা বা অবস্থা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সঙ্গেই ইংরেজদের তুলনা হয় না, সেখানে ইংরেজদের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য জাতির তুলনা টানার প্রবণতাও চোখে আসে। যদিও ভ্রমণকারীদের সামগ্রিক ইউরোপ সম্পর্কে আগ্রহ থাকলেও ঔপনিবেশিক প্রভু হিসেবে ইংল্যান্ডই- তাঁদের চেতনা এবং ভ্রমণপর্বের কেন্দ্রে থাকে, বিশেষত উনিশ শতকের কথনগুলিতে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের মনোভঙ্গী বা ইংল্যান্ডের সঙ্গে দেশগুলির প্রতিতুলনা অনেকসময়েই শাসকের প্রতি বিরোধিতার আভাস বহন করে। ইংরেজ ও ফরাসিদের স্বভাবের ফারাক বোঝাতে শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন তাঁর জাহাজে থাকাকালীন একটি অভিজ্ঞতা শোনান,

> জাহাজে থাকিতে দুইটী ঘটনা দ্বারা আমি ইংরাজ ও ফরাসী চরিত্র উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। প্রথম ঘটনাটি এই। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ যাইতেছিলেন। তিনি একদিন আহারে বসিয়া অপরাপর ইংরাজের নিকট এদেশীয়দিগকে খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরাজদের মুখে যাহা

---

[119] ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৫।

> শুনিয়াছিলেন ও নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তখন কিছু বলিলাম না। পরে আহারান্তে উপরকার ডেকে তিনি যখন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি, তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া ভদ্রভাবে বলিলাম, “আপনি টেবিলে যে সকল কথা বলিতেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি ছয়মাস বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশি দেখেন নাই, যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।” এই কথা শুনিয়াই মানুষটা মুখ ফিরাইয়া লইল, বলিল, “দরকার নেই, আমি কিছু শুনিতে চাই না।“ সেইদিন অবধি আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক স্টীমারে এক ক্লাসে আছি, এক সঙ্গে খাই, তবু যেন কত দূরে আছি; আলাপ পরিচয় সম্ভাষণ নাই।
>
> দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। জাহাজ যখন গিয়া ফ্রান্সের মার্সেলস বন্দরে দাঁড়াইল, তখন আমরা স্থির করিলাম যে একবার শহরটা দেখিতে যাইব।...একজন ভদ্রলোকবন্ধুকে তুলিয়া দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?”
>
> আমি। হাঁ
>
> প্রশ্ন। আপনার পথে ক্লেশ হয় নাই তো?
>
> আমি। না, আমরা বেশ আসিয়াছি।
>
> তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক খাই না শুনিয়া সেটি লুকাইলেন। শেষে বলিলেন, “আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভালো ইন্টারপ্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠোকাইবে।“ এই বলিয়া যাইবার সময় একজন চেনা ইন্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া আমার কাছে দিয়া গেলেন। ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ![120]

ইংরেজদের স্বভাব বিষয়ে, সমালোচনার প্রবণতা দেখা যায় অন্যান্যদের লেখাতেও। দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন,

> ইংরাজ জাতি বড় অহঙ্কারী। তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র দ্বীপকে অমরাবতী ও পৃথিবীর ভাবী কেন্দ্র মনে করে। সত্য তাহাদের গৌরবের বিষয় আছে। তাহাদের বাণিজ্য, বিস্তীর্ণ আধিপত্য, তাহাদের সৈন্যের বাহুবল, বীরত্ব ও সাহস গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আর,

[120]শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা- ২০৭-২০৮।

তাহাদিগের সাহিত্য একটী অমূল্য রত্ন। অমর সেক্ষপিয়র, মিল্টন, শেলি ও বায়রণ, পীট্ ও বার্ক, স্কট্ ও জর্জ্জ ইলিয়ট, বেকন ও নিউটন, ফ্যারাডে ও টিণ্ডাল, বেন্থাম ও মিল, ডারুইন ও স্পেন্সার,- প্রত্যেকেই জগতের সাহিত্যে একটি একটি উজ্জ্বল রত্ন। এ সকল রত্ন লইয়া কে গৌরব না করিয়া থাকিতে পারে? তথাপি তাহারা তাহাদের যতদূর অহঙ্কার করিবার অধিকার তাহা অতিক্রম করে। জার্ম্মানীও গেটে, সিলার, হুম, বোল্ট ও সহস্র মণীষীর নাম করিতে পারে। ফ্রান্সও রুসো, মলেয়ার, লাপ্লাস, লাভয়িজিয়র প্রভৃতি লইয়া অহঙ্কার করিতে পারে। কিন্তু ইংরাজের বিশ্বাস যে, জগতে একা সে-ই পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান।[121]

ভ্রমণকারীদের পরাধীন সত্তায় আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুলের বিষয়ে সমর্থন বা উৎসাহও অনেক কথনেই উঠে আসে। শাসিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আয়ার্ল্যাণ্ডের পরাধীনতার সঙ্গে অনেকসময়েই একাত্ম বোধ করেন যাত্রীরা। রমেশচন্দ্র যেমন লেখেন,

আয়ার্লণ্ড
মনোহর দ্বীপ তব দেখি হীনদশা।
ভাবনা উদয় হয় মনেতে সহসা।।
বিষাদে বিপদে তুমি মগ্ন হে যেমন।
বহুদূরে আছে এক প্রদেশ তেমন।।
অনন্ত সাগর পারে ভারত প্রদেশ।
দারিদ্র দুঃখিনী মাতা নাহি সুখলেশ।।
উজ্জ্বল এরিন হায়! দ্বীপ মনোহর।
চির দুঃখে দগ্ধ হবে তব কলেবর?
পুরাতনী স্বাধীনতা গৌরব আলয়।
পুনঃ তব সুখরবি হবে নয়া উদয়?
চারিদিকে বীচিমালা করে মহাধ্বনি।
শ্রমকের জন্ম-ভূমি বীর-প্রসবিনী।।

---

[121]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭২৬-৭২৭।

> ত্বরিতে হইবে তব দুঃখরাশি ক্ষয়।
> ত্বরিতে হইবে তব সৌভাগ্য-উদয়।
> পুরাকালে ছিল যথা হইবা তেমন।
> শাস্ত্রের উজ্জ্বল নিধি বিদ্যার ভবন।।
> বীরদর্প স্বাধীনতা গৌরব-আলয়!
> প্রেমের নিবাস স্থান অনন্ত অক্ষয়।।[122]

ত্রৈলোক্যনাথের লেখাতেও আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্তমান রাজনীতির নানা হাল্‌চাল্‌ পর্যবেক্ষণের মাঝেই উঁকি দিতে থাকে ভারতের ভবিষ্যতচিন্তা। তিনি লেখেন, "আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহা ভারতবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করিতেছে । কারণ তাহারা জানে এমন দিন আসিতেছে এবং সে দিন যত দূরেই থাক; ইংলণ্ডকে আরও বৃহৎ হোম রুল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং সেটি ভারতের জন্যে হোম রুল।" যদিও হোমরুল প্রাপ্তির এই আশা যে ঠিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্যোতনা বহন করে না, বরং তা যে শাসিতের সুপ্ত চেতনার বিক্ষিপ্ত ঝলক্‌মাত্র সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর বক্তব্যের পরবর্তী অংশেই। তিনি বলেন "ইংল্যণ্ডের প্রভাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কোনো ভারতীয়ের কাম্য নহে।"[123] একই গতে প্রবাহিত হয় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবনাও। আইরিশদের লড়াইকে প্রশংসা করলেও, দুর্বল ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়াকেই নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হয় তাঁর-

> (আইরিশদের) তাহাদের বাহুবল আছে। তাহারা ইংরাজের মতই সভ্য। কেন তাহারা ইংরাজ রাজত্বের অবিচার নীরবে সহিবে?

---

[122]রমেশচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা- ৭১-৭২।

[123]প্রাগুক্ত।

> হতভাগ্য ভারত!...ইংরাজ শাসন ভিন্ন তোমার কি গতি আছে? ইংরাজ ভিন্ন তোমার কে সহায়?...ইংরাজের সহিত এক হইয়া যাওয়াই, তোমার একমাত্র মুক্তির উপায়।[124]

বিবেকানন্দ অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তি দিয়ে দুই পরাধীন জাতির মননের অভিন্নতাকে পড়তে চান- "আমাদের বাঙালী আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকবকি করছে। বক্তৃতায় এ দু-জাত বেজায় পটু। কাজের– এক পয়সাও নয়, বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে মরছে!"[125] তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুই পরাধীন জাতির এই পারস্পরিক তুলনার মধ্যে একধরনের চোরা সহানুভূতি উঁকি মারে। বস্তুত বৃত্তান্তগুলিতে প্রায়ই চোখে পড়ে, শাসক-শাসিতের জটিল ক্ষমতাসম্বন্ধ নেই বলেই নিজেদের পরাধীনতার অস্বস্তি সম্পর্কে ভ্রমণকারীরা অনেক খোলা মনে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। আবার ইউরোপের অন্যান্য 'স্বাধীন' জাতিগুলির সাপেক্ষে ইংরেজদের তুলনা-সমালোচনা করার সুযোগও তাঁরা ছাড়েন না, বরং তা যেন শাসিত হিসেবে নিজেদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। যেমন কৃষ্ণভাবিনী বলেন-

> ইহারা মনে করে সমস্ত ভূমণ্ডল ইহাদের পদানত ও পৃথিবীর সকল জাতিই ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহারা সমস্ত সভ্য জাতির অগ্রগণ্য এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ইত্যাদিতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাই ইংরাজদের দৃঢ় বিশ্বাস। কোন অপর জাতি ইহাদের হইতে কোন বিষয়ে প্রভিন্ন হইলে ইংরাজেরা তাহাদের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশ সভ্যতায় ইংলণ্ড হইতে কোনক্রমেই হীন নয় এবং ফরাসীরা বা জর্মণের বিদ্যা, বুদ্ধি, তেজ, পরাক্রম ইত্যাদিতে ইংরাজদের অপেক্ষা কখনই নিকৃষ্ট নয়, বরং অনেক বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তথাপি গর্ব্বিত ইংরাজেরা ঐ সকল জাতির ভিন্ন রীতি, নীতি ও চালচলনে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে।[126]

---

[124]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭২৮।

[125]স্বামী বিবেকানন্দ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* (কলকাতা: উদ্বোধন কার্য্যালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬), পৃষ্ঠা- ৩৭

[126]*ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৫০

তবে, অধীনতা আর বিরোধিতার এই দোলাচল ছাপিয়ে স্বাধিকার বা স্বাধীনতা বিষয়ে চিন্তাগত আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি প্রস্ফুটিত হতে থাকে বিশ শতকের কথনগুলিতে, যে বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ধাপে আলোচনা করব।

(২)

এবার একবার চোখ রাখা যাক বৃত্তান্তগুলির ভাষাশৈলীর দিকে। বস্তুত প্রথম পর্বের কথনগুলিতে বিলেত ভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে পরাধীন-পদানত দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার যে আগ্রহ ছিল, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কথনপ্রকৃতিকে যথাসম্ভব সহজ ও বাহুল্যবর্জিত রাখার প্রবণতা দেখা যায়। তাই কৃষ্ণভাবিনী যখন নিজের বইটিকে 'স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ' সে বিষয়ে দেশবাসীর জ্ঞানবর্ধনকারী হিসেবে অভিহিত করেন, তখন এহেন 'কার্যকরী' বই-এর 'সঠিক' উদ্দেশ্যপূরণে, পাঠকের উপকারার্থে, বইটির ভাষাও যে তদ্‌পযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় সে কথাও বই-এর শুরুতেই প্রকাশক উল্লেখ করে দেন- "এই গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও মিষ্ট হইয়াছে। আমার মতে এইরূপ আড়ম্বরশূন্য ও উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিদে ভাষায় পুস্তক লেখাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"[127] লেখিকাও বলেন- "...আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, কেবল সেইগুলি অবকাশমতে সরল ভাষায়

---

[127] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৩।

যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে সমাস, সন্ধি ও অলঙ্কারের আতিশয্য নাই, এবং এমন কোন ভাব নাই যে আপনারা নাটক বা উপন্যাস পড়বার মত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বই শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।”[128] বস্তুত শুধু কৃষ্ণভাবিনী নন, প্রাথমিক পর্যায়ে, রমেশচন্দ্র থেকে শুরু করে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অধিকাংশেরই কথনভঙ্গিমাতেই ভাষিক ব্যঞ্জনা বা বর্ণনার নাটকীয়তা নয় বরং তথ্যগত পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপরেই জোর থাকে বেশি। ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দ্রষ্টব্য স্থানে থেকে শুরু করে সেখানকার মানুষজন, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, দৈনন্দিন জীবন, আচার-বিধি, খাদ্যাভ্যাস সবেরই বিশদ বিবরণ পেশ করেন তাঁরা। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার কথা থাকলেও সার্বিক বিচারে প্রায় প্রত্যেকেরই বর্ণনাভঙ্গিমা নৈর্ব্যক্তিক। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথের “ইউরোপপ্রবাসীর পত্র”, “ইউরোপযাত্রীর ডায়ারী” বা দ্বিজেন্দ্রলালের “বিলাতের চিঠি”, বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* বা *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। কিন্তু সাধারণভাবে বেশিরভাগ কথনই যেন দেশের জনসাধারণের ইংল্যান্ড বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করতে চায়। বা বলা যায় গাইডবুকের মতোই ভবিষ্যত যাত্রীদের যাত্রাপথকে কিছুটা সহজ করে দিতে চায়। কৃষ্ণভাবিনী যেমন বলেন- “আজ কাল ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতেছে। আর অনেক ভারতীয় যুবক ইংলণ্ডে আসিবার পূর্ব্বে এদেশের বিষয় জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হন, অতএব অনেকে এই পুস্তক হইতে দুই একটা আবশ্যক বিষয় জানিতেও পারিবেন।”[129] ত্রৈলোক্যনাথও নিজের কথনে পরবর্তী যাত্রী/শিক্ষার্থী ছাত্র বা ভ্রমণকারীদের জন্য যথাসাধ্য খুঁটিনাটি তুলে ধরে বলেন- “একজন ভারতীয় ছাত্র ইংল্যাণ্ডে ৩০ শিলিঙে খাওয়া ও থাকার খরচা চালাইতে পারে, কিন্তু কাপড়চোপড় ধোয়া, রেলভ্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ে

---

[128] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃষ্ঠা- ৫।

[129] প্রাগুক্ত।

আরো ৩০ শিলিঙ খরচ বাদ দিয়া চলিতে পারেনা। এ সব খরচ আগে অনুমান করা না থাকিলেও, তাহাকে করিতেই হইবে। মধ্যবয়সী কোনও ভদ্রলোক এখানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসিলে তাঁহার সপ্তাহে ৫ পাউণ্ডের কমে চলিবে না।”[130] সরাসরি, তথ্যনির্ভর এই কথনকাঠামোয় অবশ্য বেশ কিছুটা পরিবর্তনের দেখা মেলে বিশ শতকের বৃত্তান্তগুলিতে। বিদেশ যাওয়া ও বৃত্তান্ত লেখার বহর যত বাড়তে থাকে সংরূপ সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্তও বদলাতে শুরু করে। যাত্রাপথ যত সহজ ও সুলভ হয়, বিলেত ফেরতদের লেখা পড়ে, কথা শুনে, বিলেত সম্পর্কে ধারণার ধোঁয়াশা যত কাটে, জাহাজ, জলপথ বা বিশেষ দ্রষ্টব্যের তালিকা পেশের চাহিদা তত কমে। দেশবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধির ‘গুরুদায়িত্ব’ থেকেও লেখকদের কিছুটা ছাড় মেলে। তাই বিশ শতকে দাঁড়িয়ে, অন্নদাশঙ্কর রায় বা দেবেশচন্দ্র দাসদের নিছক গাইডবুকমাফিক তথ্য পেশ করতে হয় না। বরং তাঁরা জোর দেন বর্ণনা তথা ভাষার শৈল্পিকতার উপর। নিছক নৈর্ব্যক্তিকতার বদলে ফুটিয়ে তুলতে চান ব্যক্তি-অনুভব আর অভিজ্ঞতার ঘটনাময় আখ্যানকে। তাই কৃষ্ণভাবিনীর বই-এর সম্পাদক যে “আড়ম্বরশূন্য ও উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিদে” ভাষায় লেখা বইকে ‘বাঞ্ছনীয়’ বলে মনে করেছিলেন, ঠিক তার উল্টো পথে হেঁটে, দেবেশচন্দ্র দাসের লেখা *ইউরোপা*-র প্রশংসা করে, বইটির ভূমিকায় রাজশেখর বসু লেখেন-

> বইখানি মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। ইউরোপের মঠ, দুর্গ সেতু প্রাসাদ চিত্রশালাদির বর্ণনা এর মুখ্য বিষয় নয়। ইউরোপ কত উঁচুতে আর আমরা কত নীচে পড়ে আছি এ রকম বিলাপও এতে নেই। লেখক প্রতিদিন কি করেছেন, কেদার-বদরী-যাত্রীর মতন কোন্ কোন্ চটিতে বিশ্রাম করেছেন আর কতবার খিচুড়ী খেয়েছেন – এ রকম বিশ্বস্ত খবরও

---

[130]ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা– ৫০।

> এতে নেই। লেখকের কৃতিত্ব এই- তিনি ইউরোপের যে বৈচিত্র্য দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন তার রস লেখার প্রভাবে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। ইউরোপীয় প্রকৃতির যে রূপ লেখক বাহ্য ও অন্তর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তা শুধু নিসর্গশোভা নয়, ঐতিহ্য মানবপ্রকৃতি জাতীয় সাধনা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেণের মতন তিনি পাঠকের টিকি ধরে বিশ দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনেন নি।[131]

আমরা টের পাই, পূর্ববর্তী ঘরানা সম্পর্কে পাঠক/সমালোচকদের মনে তৈরি হওয়া একধরনের পুনরাবৃত্তিজাত ক্লান্তির। সেইসঙ্গে 'মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত'-এর থেকে আরও একটু বাড়তি কিছুর খোঁজ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে-প্রবাসে-র* ভূমিকা লিখতে বসে, প্রমথ চৌধুরী যেমন বলেন- "শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।"[132] অর্থাৎ বৃত্তান্ত রচনার ধারা যত প্রতষ্ঠিত হয়, তথ্যের চর্বিতচর্বণের বদলে, কথনের উপভোগ্যতার উপর, কথনের নান্দনিকতার উপর নজর পড়তে থাকে।

(৩)

নিজের একাধিকবার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে অবলা বসু লিখেছিলেন- "আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানাভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার

---

[131] রাজশেখর বসুর লেখা *ইয়োরোপা-র* ভুমিকা।

[132]অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা- ২।

বয়সেই ইয়োরোপের কত পরিবর্তন দেখিলাম।"[133] বস্তুত আমাদের আলোচনার পরিসর জুড়ে যে সময়কাল রয়েছে সেই উনিশ-বিশ শতক এক দ্রুত এবং ঘটনাবহুল ইতিহাসের সাক্ষী । এবং এই সময় পরিসরের মধ্যে অনেকেই যেহেতু একাধিকবার ইউরোপ বা ইংল্যান্ড যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের ইউরোপ বা ইংল্যান্ড সম্পর্কে ধারণা তথা অভিজ্ঞতারও কোনো একমুখীন বা স্থিতধী আদল তৈরি হয়নি। বরং তা বারংবার পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে। চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা একটি চিঠিতে যেমন রবীন্দ্রনাথ, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে নিজের প্রথম বিদেশ যাত্রার সময় লেখা চিঠিগুলির বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর বর্তমান ভাবনার বদলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইউরোপের বদলায়মান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে বলেন-

> ইংরেজদের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ের ইতিহাস-শতরঞ্চের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চাল চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।[134]

বস্তুত শুধু ইউরোপীয় অবস্থা বা ইতিহাসের পরিবর্তিত রূপই নয়। ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমীকরণ যত পাল্টেছে- রাজনৈতিক স্বার্থসংঘাত আর আর্থিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য যত বেড়েছে, পারস্পরিক বৈরিতাও তত বৃদ্ধি

---

[133]অবলা বসু, "জয়যাত্রা", *আচার্য জগদীশচন্দ্র, লেডী অবলা বসু রচনাবলী*, পৃষ্ঠা- ২০৩।

[134]"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা চিঠি), পৃষ্ঠা- ৭৯০।

পেয়েছ। খুব স্বভাবতই বৃত্তান্তগুলিতেও ইউরোপ তথা ইংল্যান্ড সম্পর্কে ধারণার মোড় বদল শুরু হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তথা বাঙালিদের বিলেত বিষয়ে ভাবনাগত এই ভাঙা-গড়াকে প্রাঞ্জল করে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে (দশ বছরের ব্যবধানে) নিজের দ্বিতীয়বারের ইংল্যান্ড ভ্রমণ অভিজ্ঞতার শুরুতেই বিপিনচন্দ্র পাল লেখেন-

> এ আমার প্রথম বিলাত-প্রবাস নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, আর একবার এদেশে দুই বৎসরকাল কাটাইয়া গিয়াছি। কিন্তু সেকালে আর একালে বিস্তর প্রভেদ। আমার ভিতরে কত প্রভেদ, এদের বাহিরেই বা কত প্রভেদ! একদিন, সে নিতান্ত বহুদিনের কথাও নয়- ইংরেজ-নবিশ ভারতবাসীর নিকট বিলাত পুণ্যভূমি ছিল। আমরা তখন নিজেদের সাহেব ক'রে তুলিবার জন্য ও ভারতকে বিলাতে পরিণত করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন বিলাতের সবই আমাদের চক্ষে ভাল ছিল, আমাদের সকলই মন্দ ছিল। ইংরেজের সমকক্ষ হইবার আশায় তখন আমরা বাঙলা বুলি ভুলিয়া ইংরেজি – শিখিতে লাগিলাম, কুশাসন, গালিচা, শতরঞ্চ ছাড়ীয়া টেবিল-চেয়ার ধরিলাম; ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া হ্যাট কোট পরিলাম; গৃহিণীকে গাউন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম; সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজ সাজিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। পোষাকে ও বুলিতে, চাল ও চলনে যে কালো সাদা হয় না, জীত বিজেতা হয় না, দাস প্রভু হয় না, এজ্ঞান তখনো জন্মায় নাই। যখন ইংরেজের কৃপায় সে জ্ঞান জন্মাইল, তখন আমরা একেবারে উলটা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলাম। এক সময় যেমন বিলাতের সবই ভাল ও স্বদেশের সবই মন্দ ছিল, এখন তেমনি স্বদেশের সবই ভাল, আর বিলেতের সবই মন্দ হইয়া উঠিল।[135]

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথও চারুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বলেন- "কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গদের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব।" বাস্তবিকই, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপস্থাপনায়, প্রথম পর্বের ভ্রমণ থেকে দ্বিতীয় পর্বের ভ্রমণের কথনগুলির উচ্চারণ বেশি স্পষ্ট হতে শুরু করে। শুরুর দিকের বৃত্তান্তগুলি যেমন ব্রিটিশ প্রভুর অনুগত

[135]বিপিনচন্দ্র পাল, "বিলাত প্রবাসীর পত্র: ভারত ও বিলাত", পৃষ্ঠা- ২৬৬।

প্রজা হিসেবে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত থাকে, বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি যত মজবুত হয়, স্বাধীনতা যত নিকটবর্তী হয় ভ্রমণকারীরা নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানের বিষয়ে তত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। এবং উনিশ শতকের বৃত্তান্তগুলিতে ভারত বিষয়ে ইংল্যান্ডের মানুষের চরম অজ্ঞানতা বা 'আজগুবি' নানা ধারণা শুনে ভ্রমণকারীরা যেমন রীতিমতো হতাশ ও বিরক্ত হন, সে ছবি অনেকটাই বদলায় বিশ শতকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায়। বিশ্বদরবারে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের পরিচিতি ভারতীয় ভ্রমণকারীদের আত্মবিশ্বাসকে যথেষ্ট জাগিয়ে তোলে। দুর্গাবতী ঘোষ যেমন, ইতালীর এক হোটেলের অভিজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন-

> নানা কথার পর আবার সেই গান্ধীর কথাই উঠল এবং হোটেলওয়ালী শেষে প্রশ্ন ক'রে বসল,- গান্ধী তোমাদের স্বদেশজাত জিনিষ ব্যবহার করতে বলেন ও বিদেশী জিনিষ কিনতে বারণ করেন, এতে আর এমন কি দোষ হয়েছে যে সেজন্য তাঁকে ও তাঁর ভক্তদের ব্রিটিষ গভর্মেণ্ট্ আটক করেছেন? এ কাজ তো ভাল কাজ, নিজের দেশের উন্নতি তো সবাই চায়। তোমাদের গভর্মেণ্টের ক্ষতিটা কি এতে?" তাঁকে আমরা বললুম, বিলাতের এক পাউণ্ড্ অর্থাৎ কুড়ী শিলিঙের ভেতর পাঁচ শিলিং এই ভারতবর্ষ থেকেই আয় হয়। আমরা যদি বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করি, তাহ'লে এই পাঁচ শিলিং লোকসান হয়। কাজেই গভর্মেণ্ট্কে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। গভর্মেণ্ট্ তাঁদের নিজের সুবিধা দেখবেন বইকি। একথা শুনে হোটেলওয়ালী বললে, "বুঝেছি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশের লোক নন, তবু আমরা তাঁকে নিয়ত মনে মনে পূজা করি। [136]

বস্তুত তাঁর গোটা *পশ্চিমযাত্রিকী* জুড়েই, বিদেশের পথে পথে নানান সময় বিদেশীদের মুখে গান্ধীজির অনশনের খবর বিষয়ে আগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে কৌতূহল বা

[136]দুর্গাবতী ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৭৫।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার উঠে আসে। এবং প্রথম পর্বের ভ্রমণে উন্নত দেশ ও সে দেশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষালাভের, আত্মোন্নতির যে বার্তা বাহিত হত এই পর্বে তা অনেক সময়েই বিপরীতমুখী হয়ে ওঠে। বস্তুত ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, ইউরোপীয় সাহিত্যিক মহল বা জনসাধারণের মাঝে রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা, বিশেষত যুদ্ধপীড়িত মানুষদের কাছে কীভাবে প্রাচ্যের কবির কাব্যবার্তাই শান্তির প্রলেপ পৌঁছে দিয়েছিল, তা কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সিংহভাগ জুড়ে থাকে। তিনি লেখেন-

> যুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে একটা বিরাট লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেছে- তার স্মৃতি তখনো সমগ্র সভ্য জগতের জাগরূক। আরো একবার প্রাচ্যের মুখে তাকিয়ে পশ্চিম তখন ভাবছে, হয়তো পূর্বদিগন্ত থেকে আলো দেখা দেবে : সেই আলোতে তারা আবার নূতন করে পথ চলতে শুরু করবে। ঠিক এই রকম মুহূর্তে পশ্চিমী জগতে বাবার উপস্থিতি যেন অলৌকিক আশীর্বাদের মনে হয়েছিল প্রতীচ্যবাসীদের কাছে। প্রাচ্যখণ্ড থেকে বাবা যে বাণী বহন করে আনলেন, তা থেকে তারা যেন নূতন আশার ইঙ্গিত দেখতে পেল। বিলেত ও ফ্রান্সের লোকেদের উচ্ছ্বাস একটু কম- কিন্তু এই দুই দেশেও বাবা যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অভ্যর্থনা পেলেন, তা বিস্ময়কর। মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপের লোকেরা তাঁকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করার উপক্রম করেছিল। জনবহুল সভাসমিতিতে ও রেল স্টেশনে লোকের পর লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসত- কেবল বাবার লম্বা জোব্বার এক প্রান্তে মাথা ঠেকাত। এই সময় তাঁর বইয়ের যেমন কাটতি হয়েছিল তেমনটি আর কখনো হয় নি। জার্মানিতে বই বিক্রি হল লক্ষ লক্ষ।[137]

অথবা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ইউরপের নানান স্তরের মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা তথা মুগ্ধতার বিষয়ে তাঁর আরেকটি অভিজ্ঞতার কথাও বলা যায়-

[137]রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কয়েকটি ঘটনা", *পিতৃস্মৃতি* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্, ১৩৮৭), পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪।

> ভারতীয় একজন জঙ্গি অফিসারের মুখেও এইরকম একটা গল্প শুনেছিলাম। মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইয়োরোপের কোথাও রেলগাড়ি চেপে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের ট্রেন থামিয়ে একদল মেয়ে এসে সেই কামরায় উঠল, ঝুড়ি ভরতি করে তারা ফুল ফল উপহার এনেছে। ট্রেন যখন চলতে শুরু করল, তাঁরা চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের এই উপহার টাগোর-এর দেশের লোকেদের জন্য।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল, শুনেছি ফরাসি দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসো সেদিন সন্ধেবেলা কঁতেস দ্য নোয়াইকে ডেকে, তাঁর মুখে গীতাঞ্জলির কিছু কবিতার আবৃত্তি শুনেছিলেন।

আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও যে ইউরোপীয় জনসাধারণের মানসিক মানচিত্রে ভারতবর্ষের কোনো আদতচিত্রই ছিলনা- যার ছবি উঠে এসেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ভ্রমণকালে, সে ছবির এই বিচিত্র বদল যেন উপনিবেশিতের পাল্টা উবাচ হয়ে ওঠে। কুসংস্কারে নিমজ্জিত, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে বিমুখ যে ভারতের বিষয়ে হা-হুতাশ শোনা গিয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথ বা কৃষ্ণভাবিনীর কলমে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগদীশচন্দ্র বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিদগ্ধতা সেই চিত্রপটকেও বেশ কিছুটা বদলায়। অবলা বসুর কথনে যেমন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী মহলে বাঙালি বিজ্ঞানীর 'জয়যাত্রা'-র বৃত্তান্ত সদর্পে উঠে আসে-

> বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম! তাহার মধ্যে সার্ জে. জ. টমসন, অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম।। এতকাল তো ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষীত হইয়াছে, আজ বাঙালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তার পর যে কি হইল সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন

> করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করতে হয় নাই, বরং জয়ই হইয়াছে।...ভারতের জয়পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম।[138]

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে ইউরোপের অক্ষুণ্ণ গৌরব সম্পর্কে আগের মোহ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। এবং উনিশ শতকের কথনগুলিতে বিলেতের আর্থিক বা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির যে ছবি উঠে এসেছিল, বিশ শতকে যুদ্ধধস্ত ইউরোপের বর্ণনা যেন তার প্রায় বিপ্রতীপ চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপে পা দিয়ে রামনাথ বিশ্বাস লেখেন-

> বার্লিনে তখন ধর বললে মারতে আসত। প্যারীতে তখন চলছিল পুরদমে নির্য্যাতন। কে কাকে ধরে কোন দিন জেলে দেয় তার স্থিরতা ছিল না। আর লণ্ডন। সেখানে পুরোদমে চলছিল বেকারদের আর্ত্তনাদ। কিন্তু সেই আর্ত্তনাদের পেছনে ছিল এংলো-জার্মান প্রীতির প্রচ্ছন্ন প্রহসন। বাস্তবিক পক্ষে তখন ইউরোপে শান্তি ছিল না।[139]

শোভনাসুন্দরী দেবী আবার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইংল্যান্ডের হয়ে নানা প্রান্তে যুদ্ধ করার কথা উল্লেখ করে ইংল্যান্ড কীভাবে তার উপনিবেশের কাছে মুখাপেক্ষী সেই বিষয়টি সরাসরি তুলে ধরেন-

> লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান, যাহাদের হাসিতে ঘর আমোদিত হত- আজ তারা কোথায়? পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে ভারতের *Coral Strand* ছেড়ে সাতসমুদ্র তের নদীর পারে যুরোপের মহাসমরের মুখে যাত্রা করিল। তারা কি ভারতের স্বাধীনতার

---

[138]অবলা বসু, "জয়যাত্রা", পৃষ্ঠা- ২০৩।

[139] *ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ,* পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।

জন্য প্রাণ দিতে গেল?...হায়! তাহা নয়- ভারতের স্বধীনতা কোথায়? ইংলণ্ডেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে মহাসমরে জীবন বিসর্জন করতে গিয়েছিল, কি মহান নিঃস্বার্থতা।

আমাদের সে সব যোদ্ধা ভ্রাতৃগণ আজ কোথায়? প্রতিধ্বনিক্রন্দন করেছে- ‘হায়! কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করো ‘ফ্রান্স’ ও ‘ফ্লাণ্ডারের’ যুদ্ধক্ষেত্রকে! জিজ্ঞাসা করো ‘আফ্রিকা’ ও ঈজিপ্টের রণভূমিকে! জিজ্ঞাসা করো ‘প্যালেস্টাইন’ ‘মেমপট’ ও বাগদাদের শ্মশানকে!

মৃত্যুপুরীর বিশাল পথের ছায়ায় ভারতের লক্ষলক্ষ গৃহ আজি একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। পৃথিবীর চার মহাপ্রদেশে বা *Continent*-এ এই ভারত যোদ্ধাদিগের স্তুপীকৃত অস্থিরাশি পড়ে রয়েছে।

প্রাচ্য যোদ্ধৃগণের অস্থি প্রতীচ্য যোদ্ধৃগণের অস্থির সহিত সম্মিলিত হয়ে কী মহা সাম্য কী মৈত্রী ঘোষণা করেছে। এতদিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন হয়েছে- মহাশ্মশানের রণোক্ষেত্রে গোরা-কালা- পীত-তাম্র সর্ব বর্ণের সৈনিক একত্র শায়িত আছে সর্ব বর্ণের লোপ সেই শশ্মানে।[140]

এবং উনিশ বা বিশ শতকের অনেক কথনই যেখানে ইউরোপীয়দের ভারত বিষয়ে অবজ্ঞাকে পরাধীন ভারতের ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়ার রীতি চালু ছিল, সেখানে কিপলিং-এর ভারতবিদ্বেষী কবিতাকে জোরালো ভাষায় ধিক্কার জানান তিনি-

ছি ছি! কিপলিং! ছি ছি!_ তবে কেমন করে তোমার ‘ভারতী’ এখানে গাচ্ছে-
East is east and west is west and ne’er the twain shall meet.
প্রাচ্য সে প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রতীচ্য রবে-
এ দোঁহার সম্মিলন কখন না হবে।[141]

বস্তুত বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ভয়াবহতা ক্রম দৃশ্যমান হওয়ার পর, ইউরোপের সমাজবাদী আদর্শ গ্রহণকারী দেশগুলি সম্পর্কে এক ইতিবাচক আগ্রহ দেখা দিতে শুরু করে।

---

[140]শোভনাসুন্দরী দেবী, “ইয়োরোপে মহাসমরের পরে”, *ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা*, প্রত্যূষকুমার রীত (সম্পা.) (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১২), পৃষ্ঠা- ২১০।

[141] প্রাগুক্ত।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় প্রথম পা রাখার বিস্ময়ে যেমন বলেন– “মস্কৌ রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।”[142] আবার সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা করে এক বৃহত্তর এশীয় জাতীয়তাবাদী বোধ[143] তথা প্রতিরোধ তৈরি করতে চান- “এশিয়ার লোক, এরা এশিয়ার লোকেদের প্রতি নিশ্চয় ভালো ব্যবহার করবে, এরা অন্তত ইয়োরোপীয়দের কাছে মাথা নীচু করবে না। ছোটোবেলায় রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস পড়ে মন ভারি খুশি হত। জাপানীরা ইয়োরোপীয়দের হারিয়ে দিয়েছে, মনে হত বুঝি সেটা আমারই জিত। ইংরেজদের প্রতি মনের বিদ্বেষ আর তাদের তাড়াতে না পারার অসহায়তা এই দুই যেন মনের সব ক্ষোভ মিটীয়ে নিত জাপানীদের জয়লাভে।”[144] এই সরাসরি বিরোধিতা বা স্বাধীনতার উচ্চারণ এর আগের প্রজন্মের কাছে প্রায় অভাবনীয় ছিল। কৃষ্ণভাবিনী যেমন সতর্ক করে দিয়েছিলেন-

> অনেকে “স্বাধীন হইব স্বাধীন হইব”, বলিয়া নাচিয়া বেড়ান এবং লোকেদের মনে মিথ্যা উত্তেজনা দিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের প্রথম বিবেচনা করা উচিত আমরা স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছি কি না ও সেই স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারি কি না, আর বিশেষ আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার শক্তি আছে কি না। কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে কার্য্যসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যে জাতিকে পদচ্যুত করিতে চাহি তাহাদের গুণগুলি আমাদের আছে কিনা, এবং যে বল বিদ্যা ও কৌশলের প্রভাবে তাহারা আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রাজত্ব করিতেছে সে সকল আমাদের অন্তর্গত কিনা তাহাই প্রথমে উত্তমরূপে বিবেচনা করা বিধেয়। যদি সে সমুদয় গুণ আমাদের না থাকে, তাহা হইলে মিথ্যা আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত কুসংস্কার ও অনিষ্টকারী

---

[142] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রাশিয়ার চিঠি”, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী), পৃষ্ঠা- ৫৫৫।

[143] এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[144] সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “কলম্বো-জাপান-প্যারিস-বার্লিন ও মস্কোর পথে”, *ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা*, পৃষ্ঠা- ১২৪।

> পুরাতন রীতির প্রতি আসক্তি ত্যাজিয়া, যাহাতে সেই সদ্‌গুণগুলি লাভ করিতে পারি তাহাই আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিৎ।[145]

আমরা বুঝতে পারি, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই বৃত্তান্তের মনোভঙ্গিমার সঙ্গে সৌমেন্দ্রনাথ বা শোভনাসুন্দরীর মানসিকতার কি বিপুল পরিবর্তন। তবে ইউরোপের সাহিত্য-শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বা গুণমুগ্ধতা কিন্তু ভ্রমণকারীদের কমেনা। বস্তুত ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উজ্জ্বলতার ছবি যতই ম্লান হোক সেদেশের জ্ঞানীগুণীদের কাজের সমাদর কিন্তু অটুট থাকে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন-

> য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য ইতিহাস পড়ে। সেটা হচ্ছে আইডিয়াল য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করলে সেটা প্রত্যক্ষ করার জো নেই। তিন-মাস, ছ-মাস কিংবা ছ-বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র।...প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার-ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এইজন্য ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত কিন্তু আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই-চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি নে। সর্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোলজিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।[146]

আমাদের ভ্রমণকারীদেরও তাই সাহিত্যের সূত্র ধরে ইউরোপের সঙ্গে চিরনৈকট্যের বোধ কখনো শিথিল হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ইউরোপের তীব্র জাতীয়তাবাদী হাওয়া

---

[145] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃষ্ঠা- ১৫৩।

[146] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী”, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী), পৃষ্ঠা- ৮৪৭।

দেবেশচন্দ্রকে ভীত ও চিন্তিত করে তুললেও সাহিত্যের সান্নিধ্যে সেদেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বোধ করতে তাঁর অসুবিধা হয় না-

> এই দেশকে একদিনের জন্যও নূতন বা অপরিচিত মনে হল না। আমার বহুদিনের কল্পনার শ্যামল গ্রামটি- টমাস হার্ডির গ্রাম, চেরী-ম্যাপল্-পপ্লারে সুন্দর লীলাচঞ্চল হাস্যময় মে-উৎসবের গ্রামটির চিত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের গ্রামগুলি যেন মিশে রয়েছে। সাহিত্যের পাতায় এই ইংলণ্ডের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, যেখানে রৌদ্রের দীপ্তি আছে- দাহ নেই, প্রকৃতির উল্লাস আছে- উন্মত্ততা নেই, যেখানে কৃষকবালকের মত গর্সের সৌরভে আমোদিত প্রান্তরে গাছের ছায়ায় শুয়ে সুমধুর আলস্যে গুন্ গুন্ করে গান গাওয়া যাবে:
>
> Lying in the hay all day
>
> I feel as lazy as the hazy summer day-
>
> যেখানে শীতের শেষে বসন্তের চুম্বন-পুলকে প্রকৃতি যখন পরিণত শোভায় মধুর হয়ে উঠেছে, সেই সময় চার্লস ল্যাম্বের মত দিনের প্রসন্ন আলোকের উত্তাপে অনুভব করব- I feel ripening with the orangery.[147]

ইউরোপের মাটিতে পা রেখে স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস বা শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহও যাত্রীদের মনে পুরোমাত্রায় অটুট থাকে। মণীন্দ্রলাল বসু নিজের প্রবাসী জীবন বিষয়ে যেমন লেখেন, "...ইয়োরোপের নানা দেশ শিক্ষার্থীর মত পরিভ্রমণ করিয়াছি। ইয়োরোপে নামিয়া মনে হইল যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাহার বিচিত্র রূপ দেখিলাম আরও পরিচয় করিতে হইবে। বস্তুত ইয়োরোপের বৎসরগুলি আমার শিক্ষার কাল ছিল। শুধু লিঙ্কন্স্ ইনে ইংলিশ পাঠ নয়, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ফরাসী সাহিত্যে প্রবেশ, জার্মান সাহিত্য পরিচয়,

---

[147]দেবেশচন্দ্র দাস, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮।

আর বিশেষ করিয়া ইয়োরোপের নানা যুগের নানা দেশের চিত্রকরগণের অপূর্ব আর্ট নানা চিত্রশালা ঘুরিয়া দেখা।”[148] তবে, ইউরোপের সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক জগতের প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত থাকলেও, উনিশ থেকে বিশ শতকের দ্রুত বদলায়মান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অভিঘাতে বাঙালির শাসিত চৈতন্যের যে নানা রূপ বদল ঘটে, তাতে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ড বিষয়ে সামগ্রিক ধারণার ক্ষেত্রটিও বদলাতে আরম্ভ করে দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ বা কৃষ্ণভাবিনীর পাঠ্যে বিরোধিতার খণ্ড চৈতন্যগুলি ক্রমেই মূর্ত হতে থাকে বিশ শতকের স্বাধীনতা নিকটবর্তী কথনগুলিতে। স্বকীয়তার উচ্চারণ জোরালো হয়। ইউরোপ ভ্রমণের কেন্দ্রভূমি হিসেবেও শুধু ইংল্যান্ড থাকেনা, রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি আগ্রহ ক্রমে বাড়ে। ভ্রমণ পদ্ধতিও পাল্টাতে থাকে। রামনাথ বিশ্বাস বা বিমল মুখার্জীদের মতো ভূপর্যটকেরা সাইকেলে চেপে বা পায়ে হেঁটে ইউরোপের ছোট-বড় নানা প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে এক অজানা ইউরোপের ছবি নিয়ে আসেন আমাদের সামনে। যদিও ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধতার পুরনো চিত্রকল্পগুলি মুছে যায় না; তবে বালক মধুসূদনের যেমন অ্যাল্বিনো তীরকেই মনে হয়েছিল ‘as if she were my native land”, বিশ শতকের উপনিবেশিতের কথনে, শাসিতের কল্পনায় স্বদেশের মানচিত্র যত স্পষ্ট হয়, ‘ঘর’-এর এমন স্থানবিপর্যাস আর হয়না। বরং আমরা বুঝতে পারি, বৃত্তান্তগুলি আদতে ইংরেজ জাতিকে নিজস্ব আবহে প্রত্যক্ষ করার সময় তাদের যাবতীয় ঠিক-ভুল, ভাল-খারাপের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিতে চায়। এবং সেই বিশ্লেষণকে সূত্র করেই গড়ে তুলতে চায় পরাধীন জাতির জন্যে উপযুক্ত তথা আদর্শ এক সমাজ তথা স্বদেশের ভবিষ্যত অবয়ব। এবং স্বদেশের অবয়ব অনুসন্ধানের এই তাগিদেরই আরও এক গুরুত্বপূর্ণ

---

[148]মাধবী দে, *ব্যক্তি ও স্রষ্টা : মণীন্দ্রলাল বসু,* (৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সংবর্ধনা উপলক্ষে মণীন্দ্রলাল বসুর বক্তৃতা, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৩), পৃষ্ঠা- ১৪১।

অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা এবার দেখব এশিয়ার নানা দেশ-অঞ্চল বেড়ানোর অভিজ্ঞতাগুলিকে, পরবর্তী অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়:

প্রসঙ্গ: এশিয়া ভ্রমণ

প্রেক্ষিত ও যাত্রাপথ

(১)

আগেই বলেছি ভ্রমণকথনগুলিকে নিছক ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং উপনিবেশিত কালপর্বের সঙ্গে ভ্রমণের সম্পর্কটিকে বোঝা, এই বিশেষ সময়ের অভিঘাত কীভাবে এবং কতদূর ভ্রমণের প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেদিকে চোখ রাখাই আমাদের আলোচনার মূল আবর্তন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আগের অধ্যায়ে যখন আমরা ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাঙালির সম্বন্ধরেখাটি ছিল সরাসরি; কিন্তু এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলিতে যেখানে গন্তব্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের উপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, সেখানে আমাদের পাঠ তথা বিশ্লেষণের অভিমুখ কীভাবে নির্ধারিত হবে? সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমদের চোখ রাখতে হবে বিশ শতকের ভারত তথা বাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণের উপর। তবে আলোচনা শুরুর আগে আরও দুটি বিষয়ও চিহ্নিত করে দেওয়া দরকার। প্রথমত আগেই বলেছি এশিয়া বলতে আমরা এখানে বুঝব মূলত বিশেষ কয়েকটি দেশের কথা– চীন, জাপান, বর্মা বা অধুনা মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। এবং বিভিন্ন অনুষঙ্গে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যরাজের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথের পারস্য সফরের কথনটির উপরেও চোখ রাখব।

আর দ্বিতীয়ত আমাদের এই পর্বের ভ্রমণে উপলব্ধ কথনগুলি মূলত বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু হবে। অর্থাৎ সময়ের হিসেবে যাদের ইউরোপ ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বের কথনের সঙ্গে একসারিতে রাখা যেতে পারে। বস্তুত ইউরোপযাত্রার দ্বিতীয় এই ধাপে আমরা দেখেছিলাম, ঔপনিবেশিক শাসনের দাঁত-নখ আর বিসম ক্ষমতা সম্পর্কের বাস্তবতা যত স্বচ্ছ হয়েছিল ততই উপনিবেশিতের দ্বিধাহীন আনুগত্যে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছিল। আর সেই সাপেক্ষে, ইউরোপ ভ্রমণের চালচিত্র তথা ভ্রমণকারীদের দেখা-শোনা-বোঝার চরিত্রও তত পাল্টে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের সুবাদে ক্রমশই উপনিবেশিতের এক প্রতিবয়ান তৈরি হয়েছিল- নিজস্ব পরিচয় খোঁজার তাগিদ ক্রমশ বেড়েছিল কথনগুলিতে। আর এই তাগিদেরই আরেক অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা এই পর্বে এশিয়ার নানা দেশ-অঞ্চল বেড়ানোর অভিজ্ঞতাগুলিকে পড়ার চেষ্টা করব।

বিশ শতকের প্রথম দশক, (যখন থেকে এই পর্বের যাত্রাগুলি প্রধানত শুরু হচ্ছে) ভারত তথা বাংলার ইতিহাস যে ঘটনাবহুলতার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই অর্থনৈতিক অধগতি, বৈষম্যমূলক নানা নীতি, অনুন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো, সামাজিক-মানবিক অবমাননার অসংখ্য ঘটনার সূত্র ধরে বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত (আমাদের আলোচ্য শ্রেণি) শ্রেণির মনে ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিষয়ে ক্ষোভ জমা হতে শুরু করে। যে মেকলের অনুগামী বাঙালি একসময় উঠেপড়ে লেগেছিল পাশ্চাত্যবীক্ষায় দীক্ষিত হতে, যাদের কথা বলেই আমরা শুরু করেছিলাম ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত; সেই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির আত্মদর্শনে ক্রমশই বদল আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসন আর তার নৈতিকতা বিষয়ে গচ্ছিত মুগ্ধতা যত ম্লান হয়, জাতিগত স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণের উৎকন্ঠা ততই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শুরু হয়, দেশ তথা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ‘বিশুদ্ধ’ রূপটিকে খুঁজে বের করে আত্মতার এক নিজস্ব পরিসর কায়েমের উদ্যম। যা চরম রূপ নেয়

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল স্তরেই আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার উদ্যোগ দেখা দেয়। এবং উদ্যোগের বীজ শুধু দেশীয় ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমিত থাকে না। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়, বুয়র যুদ্ধে ইংল্যান্ডের পরাজয়, চীনে আমেরিকান দ্রব্যের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দলনের মতো আন্তর্জাতিক স্তরে ঘটে চলা কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনাও এক্ষেত্রে বাঙালির স্বদেশ এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনার কাঠামোকে গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসেচকের কাজ করে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার যেমন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলছেন, “The mood of selfreliance and confidence in the heritage of the East was enormously strengthened by events abroad. The Boer War had tarnished the image of British strength; the unexpected Japanese victory of 1904-5 blew up the myth of European superiority and sent a thrill of pride through the whole of Asia.”[149] বর্হিবিশ্বে ঘটে চলা এই আপাত অসম্ভব ঘটনাগুলি পরাধীন জাতির কাছে স্বভাবতই আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক হয়ে ওঠে। বিশেষত জাপানের এই জয়ে, ইউরোপের অপরাজেয়তা বা প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠতার ধারণাটি সজোরে ধাক্কা খায়। আর ইংরেজ শাসনে-শোষণে নাস্তানাবুদ, আত্মপরিচিতি হাতড়ে বেড়ানো বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণির কাছে জাপান খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু, যার হদিশ মেলে সমসাময়িক নানা ঘটনায়। এই বিষয়ে আরেকবার চোখ রাখা যেতে পারে সুমিত সরকারের লেখাটির উপর। তিনি তৎকালীন সংবাদপত্রে জাপান বিষয়ে লেখালেখির দিকটির উপর জোর দিয়ে বলছেন, “The Bengali newspapers of these years are full of Japan, funds in aid of Japanese sick and wounded were

[149]Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947* (New York: St. Martin's Press), 1989, পৃষ্ঠা- ১.

collected through public entertainments at City College and Overtoun Hall, Sarala Debi thought of organising a-Bengali Red Cross, and there were even cases of children being given nick-names after Japanese leaders ."[150] বস্তুত বিশ শতকের প্রারম্ভে, জাপানের যুদ্ধ জয় বাঙালি মনন তথা বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে যে কি প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছিল, তার এক প্রাঞ্জল ছবি উঠে আসে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও, তিনি লেখেন-

> ঠিক এই সময় একটি ঘটনাতে আমাদের উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। রুশ-জাপানের যুদ্ধের খবর আমরা তখন আগ্রহের সঙ্গে কাগজে পড়ছি আর বড়ো ম্যাপের উপরে পিন দিয়ে তার গতিবিধি চিহ্নিত করে রাখছি। একদিন খবর এল জাপানিরা পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশের নৌবলের যত যুদ্ধজাহাজ ছিল সব বন্দী করেছে। তারপরেই জানতে পারলুম, যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, রুশ সম্পূর্ণ হার স্বীকার করে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করেছে। সেদিন আমাদের কী আনন্দ, কী উচ্ছ্বাস! এশিয়ার একটি নবজাগ্রত ক্ষুদ্র দেশ ইয়োরোপের প্রবল রুশদেশের দম্ভ এমনভাবে চূর্ণ করে দিল, সে কি কম কথা! জাপানের জয় পূর্ব-মহাদেশেরই জয় মনে করে আমাদের বুক ফুলে উঠল।
> আমাদের দেশে বর্তমান শতাব্দীর সূচনা হল স্বাধীনতার উষাস্বপ্নে। রুশের সঙ্গে জাপানের জয় আমাদের মনে প্রথম এনে দিল আত্মবিশ্বাস।[151]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জাপানকে ঘিরে এই উৎসাহের আতিশয্যের মাঝে আসলে প্রচ্ছন্ন থাকে বিজিত মননের অধরা এষণা, আত্মবিশ্বাস অর্জনের রসদ। প্রসঙ্গত যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই, জাপানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বাড়তে শুরু করেছিল নানা সূত্রে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জাপানি দার্শনিক তেনসিন ওকাকুরা সমগ্র এশিয়া জুড়ে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের চিন্তা নিয়ে ভারতে আসেন, ঠাকুরবাড়ির সূত্র ধরে বাঙালি উচ্চমহলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ

---

[150] প্রাগুক্ত।

[151] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭।

পরিচিতি গড়ে ওঠে। এবং এই বছরই তাঁর এশীয় একতার স্বপ্ন নিয়ে রচিত *Ideals Of East*[152] বইটির প্রকাশ বাঙালি যুবকদের বিশেষ অভিভূত করে ও প্রতিবেশী দেশগুলি বিশেষত আধুনিক নানা শিক্ষায় শিক্ষিত, শিল্পোন্নত জাপান বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। জাপানের জয়ের পর যে আগ্রহ আরও ঘনীভূত হয়- আত্মগঠনে তৎপর বাঙালির কাছে জাপান হয়ে ওঠে ইউরোপীয় সভ্যতার এক পাল্টা জবাব। প্রগতির এশীয় মডেল তথা সুযোগ্য বিকল্প। ফলত উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত যাত্রার সমান্তরালে, জাপানে গিয়ে প্রযুক্তি-কারিগরি-শিল্পশিক্ষার ব্যবহারিক পাঠ নিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বনের ঝোঁক তৈরি হয়। প্রসঙ্গত ১৯০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে স্কলারশিপ নিয়ে ভারত থেকে জাপানে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে পড়তে যায় মোট ৩৬ জন ছাত্র। এবং সেই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচিত ভ্রমণকারীদের দুজনও রয়েছেন- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মন্মথনাথ ঘোষ। দুজনেই জাপান যাত্রা শুরু করেন একই জাহাজে, বঙ্গভঙ্গের ঠিক পরের বছরেই। পরাধীন জাতির আত্মপ্রতিরোধের প্রকল্প রূপায়ণে প্রথমেই যে শাসকের দরবারে কেরানীবৃত্তি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার প্রয়োজন (যার প্রভূত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, স্বদেশী আন্দোলনকালে গড়ে ওঠা দেশীয় উদ্যোগগুলির মধ্যে) এবং সেই সুবাদে অত্যাবশ্যক জ্ঞানগুলি আরোহণে বিদেশ যাত্রা যে আপরিহার্য – এই স্পষ্ট অভিপ্রায় সূচিত থাকে রথীন্দ্রনাথ ও মন্মথনাথের কথনের শুরুতেই। রথীন্দ্রনাথ লেখেন,

> একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। বাবা জানতে পেলেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাঙালি ছাত্র পাঠাবার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি শিক্ষার্থীর দল

---

[152] Okakura, Kakuzo, *Ideals of the East: The Spirit of Japanese Art* (Dover Publications, 2005).

> কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে।...১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ষোলোটি প্রাণী জাপানগামী একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর বিদেশে যাচ্ছি, সম্বলের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দেওয়া জাপানী মালবাহী জাহাজের অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের একখানা টিকিট এবং একগুচ্ছ পরিচয়পত্র। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের রণক্ষেত্র থেকে সদ্য-ছাড়া-পাওয়া এই তরুণের দল উদ্দীপনায় ভরপুর। সম্বল তাদের অল্প, কিন্তু তাদের বেপরোয়া উৎসাহ ঠেকাবে কে? অর্থসংগতি তাদের ছিল না বললেই হয়, না ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি আর বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান। অথচ এদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে বিদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করে এরা স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য নূতন করে গড়ে তুলবে।[153]

প্রায় অভিন্ন ভাষায় তাঁর সহযাত্রী মন্মথনাথও নিজের যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, "আমরা ১৬ জন শিক্ষার্থী ১৯০৬ সালের ১লা এপ্রেল কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করি। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্যে যাইতেছি।...কলিকাতা জেটী হইতে জাহাজ যেমনই ছাড়িল, অমনি আমাদের তীরস্থ বন্ধুগণ সকলে একস্বরে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরাও সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক্রিয়া করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।"[154] যাত্রাকালে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণের উল্লেখই বুঝিয়ে দেয় স্বদেশী পর্বের চিন্তা-আদর্শের সঙ্গে এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলির অবস্থান ঠিক কতটা ওতপ্রোত। তবে বিদেশী শাসনের জাঁতাকলে পর্যুদস্ত জাতির কাঙ্ক্ষিত স্বদেশের অবয়ব কল্পনার নিরিখে ভ্রমণকথনগুলিকে পড়তে চাইলে বাঙালি তথা ভারতীয় সত্তা নির্মাণের আরও একটি প্রকরণের উল্লেখও অবশ্যই করা দরকার। তা হল, বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আবহে, পরাধীন জাতির আত্মনির্মাণের ভিত্তিভূমি শুধু দেশের সীমানায় গণ্ডীবদ্ধ থাকেনা বরং এক বিস্তৃত পরিসর লাভ করতে চায়। খুঁজে পেতে চায় এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়- সিলভিয়ান লেভি প্রমুখ ফরাসি

---

[153]রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১০৮।

[154]মন্মথনাথ ঘোষ, *জাপান-প্রবাস* (এস. ব্যানার্জী কর্তৃক এম্পায়ার লাইব্রেরী, ১৯১০), পৃষ্ঠা- ১।

প্রাচ্যবিদের ব্যাখ্যাত 'বৃহত্তর ভারত'-এর সূত্র ধরে এদেশেও এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ-অঞ্চলের উপর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-দর্শনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রসঙ্গত রাধাকুমুদ মুখার্জী ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' বা 'বৃহত্তর ভারত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রাচীন ভারতের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস লেখার সময়, *Indian Shipping: A History of Seaborne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*[155] বইটিতে। তবে প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক আধিপত্যের ইতিহাসচর্চার খাতিরে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে, গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। যে চর্চা কালিদাস নাগ, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভারত ও চিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে লেখালেখি থেকে শুরু করে বিজনরাজ চৌধুরী ও হিমাংশু সরকারের সুমাত্রা ও জাভা বিষয়ে গবেষণা, ফণী বসু ও নীহাররঞ্জন রায়ের সিয়াম ও বর্মা সম্পর্কিত ইতিহাস প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমশই বিস্তার পেতে শুরু করে। এবং ইতিহাসের এই 'নতুন' ছকে, হিন্দু বা বৌদ্ধ সংযোগের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেশী দেশগুলি উপস্থাপিত হতে শুরু করে ভারতের একদা উপনিবেশ– 'প্রাচীন' ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিরই পরিবর্ধিত অংশ হিসেবে। নানা অপারতায় জর্জরিত জাতির মনে এশিয়ার নানা দেশের সংস্কৃতিতে ভারতের প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারণের এই 'ইতিহাসবোধ' বর্তমানের খামতি ছাপিয়ে অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে একধরনের আত্মশ্লাঘার জন্ম দেয়। বস্তুত ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার নানা অঞ্চল ভ্রমণের আগে রবীন্দ্রনাথকে, এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনাও জানানো হয়। সেই বিদায় সংবর্ধনার ভাষণে তিনি বলেন,

---

[155]Radha kumud Mookerji, *Indian Shipping: A History of Seaborne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times* (Munshiram Manoharlal PVT LTD, 2020).

> আজ একটা আকাঙক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে যে ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।...সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কুল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেইসকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।[156]

আমরা বুঝতে পারি, এই গন্তব্যের অভিমুখে আসলে কোনো না দেখা নতুন দেশ বিষয়ে কৌতূহল থাকে না, বরং থাকে 'ভারতের বাইরেও ভারতকে' দেখার বাসনা। বস্তুত এই সফরে রবীন্দ্রনাথের আরেক সহযাত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে মনে হয় – "১৯১৯ সালে যখন ছাত্র হ'য়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করি, তখন, বোম্বাইয়ের আপোল্লো-বন্দরের ঘাট ছাড়বার সময় মনটা একটু ভার-ভার হয়েছিল, চোখের কোলও বোধ হয় একটু ভিজে গিয়েছিল। এবার কিন্তু সে রকম কিছু হ'তে পারে নি; কারণ যে বিদেশ আমরা এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাদের কাছে ততটা নেই- এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একটা ধারণা (যেটা historical sense বা ঐতিহাসিক অনুভূতির ফল) আমরা নিয়ে চ'লেছি। কাজে-কাজেই দূর বিদেশ-প্রবাসের একটা চাপা আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই।"[157] 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' শব্দবন্ধটির প্রয়োগই আমাদের বুঝিয়ে দেয়, দেশগুলি বিষয়ে যে নৈকট্যের বোধ তা নিছক ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে নির্ণীত হয়না, বরং তাকে মান্যতা দেওয়া হয় ইতিহাসের আলোকে। একই অনুভূতি হয় সরলা দেবীর, বর্মা

---

[156] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বৃহত্তর ভারত", রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৭), পৃষ্ঠা- ৬১৪-৬১৫।

[157] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১০), পৃষ্ঠা- ২২।

প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করতে বর্মা যাওয়ার পথে - "এ আর সমুদ্রযাত্রা কি? এ তো ভারতের ওপারে যাওয়া মাত্র, বৃহত্তর ভারতেরই আর এক কোণে।"[158] আমরা দেখি কীভাবে দেশগুলির অবস্থানকেই একপ্রকার উপেক্ষা করে তাদের আত্তীকৃত করে নেওয়া হয় 'বৃহত্তর ভারত' নামক ধারণাটির মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের মধ্যে আবার নিহিত থাকে পারস্যের আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনপ্রক্রিয়ার নানা দিকগুলির প্রতি কৌতূহল। বৃদ্ধ-অশক্ত শরীর নিয়েও দীর্ঘ এই সফরের ঝক্কি নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন- "পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি। তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হল।"[159]

অবশ্য এশিয়া ভ্রমণের যাবতীয় অভিব্যক্তিই যে সবসময় সরাসরি জাতীয়তাবাদী নানা তাগিদেই পরিচালিত হয়েছিল, এমন সরলীকৃত দাবি অবশ্যই আমরা করব না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বাণিজ্যিক কারণেও এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ বাড়তে শুরু করে। যাতায়াত সহজ ও সুলভ হয়। ব্যবসা বা চাকরির খাতিরে অনেক ভারতীয়ই পাড়ি জমানো শুরু করেন এশিয়ার নানা অঞ্চলে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে, কেদারনাথ বন্দ্যপাধ্যায় যেমন বক্সার বিদ্রোহ চলাকালীন চিন পাড়ি দেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরির সূত্রে। আবার মোজি জাপান থেকে ভ্যাগ্যান্বেষী হিসেবে এদেশে আসেন উয়েমেন তাকেদা, যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন হরিপ্রভা। এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্বশুরবাড়ি দেখার উদ্দেশ্যে জাপান যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন *বঙ্গমহিলার*

---

[158]সরলা দেবী চৌধুরানী, "বর্ম্মা-যাত্রা", *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ* (মূল লেখাটি ভারতবর্ষ, কার্তিক, চৈত্র ১৩৩৮-শ্রাবণ ১৩৩৯ এর মধ্যে প্রকাশিত), পৃষ্ঠা- ১৩৬।

[159] "পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৩৫।

জাপান যাত্রা[160]। অন্যদিকে ইন্দুমাধব ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে (সম্ভাব্য) চিন যান দেশ ভ্রমণের উৎসাহে। রাসবিহারী বসুর জাপান যাত্রা রাজনৈতিক পলাতক হিসেবে। আবার রামনাথ বিশ্বাস ভবঘুরে পর্যটকের মতো সাইকেলে চেপে যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে এশিয়ার চিন-জাপান-কোরিয়া-থাইল্যাণ্ডের পথে পথে ঘুরে বেড়ান, পাঠককে শোনান পথ চলার নানা রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার। অর্থাৎ এশিয়া ভ্রমণের মোটিফকে আমরা এক সুরে বা কোনো একক অভিব্যক্তির মধ্যে বাঁধতে চাইলে ভুল হবে। কারণ গন্তব্য আর উদ্দেশ্য দুইয়ের নিরিখেই ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতার অভিমুখ বদলে যায়। তাই আমরা যুগ-অনুভূতির নানা লক্ষণের সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যমুখী ভ্রমণের প্রবণতাগুলিকে পড়তে চাইব, বুঝতে চাইব তাদের বিশিষ্টতাকে।

(২)

ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি পাঠের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম, প্রায় সকল কথনই কমবেশি একধরনের কথনকাঠামোকে অনুসরণ করেছিল, বর্ণনার ক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অভিন্ন (অবশ্যই কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া)। এশিয়া ভ্রমণের জন্যে আমরা মূলত যে কথনগুলিকে বেছে নিয়েছি সেগুলির ভিতরেও কথন বা বর্ণনার গতিপথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক এবং তা বহুলাংশে ইউরোপ বিষয়ক ভ্রমণবৃত্তান্তেরই অনুসারী। অর্থাৎ, যাত্রাপথ, জাহাজজীবন, পথের নানা ছোটবড় স্টপেজ, গন্তব্যে পৌঁছনো এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং প্রত্যাবর্তন– মূলত এই ধারা মেনেই চলে। তবে ইউরোপ যাত্রার ক্ষেত্রে, যাত্রা শুরুর যে দীর্ঘ

---

[160]হরিপ্রভা তাকেদা, *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,* মঞ্জুশ্রী সিংহ (সম্পা.) (ডি.এম. লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯)।

প্রস্তুতি বা দোটানার কথা উঠে আসে এক্ষেত্রে বর্ণনার সেই তীব্রতা ততটা থাকে না। এই না থাকার কারণ কিছুটা সময়গত, যেহেতু সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে সামাজিক চোখরাঙানি বিশ শতকে কিছুটা হলেও শিথিল। এবং এশীয় একতা বা ভারতের সঙ্গে বিভন্ন দেশের প্রাচীন যোগাযোগ বিষয়ে তৎকালীন চর্চার কারণে সাত সমুদ্র তেরো নদী উজিয়ে সুদূর ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার আতঙ্ক বা উত্তেজনার বদলে, এই পর্বের গন্তব্যস্থলগুলি সম্পর্কে একধরনের আত্মীয়তার বোধ কাজ করতে থাকে। বস্তুত কিছুক্ষণ আগেই আমরা আলোচনা করেছি, প্রতিবেশী দেশের উপর ভারতের প্রভাব তথা বৃহত্তর ভারত বিষয়ে চিন্তাচর্চার কথা। দেখেছি কীভাবে সুনীতিকুমার, সরলা দেবী প্রভৃতি অনেকের কাছেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাত্রা হয়ে উঠেছিল “ভারতের ওপারে যাওয়া মাত্র, বৃহত্তর ভারতেরই আর এক কোণে”। প্রসঙ্গত সুনীতিকুমার ইউরোপের সঙ্গে এই যাত্রার চারিত্রিক তফাতটিকেও চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। আবার ইন্দুমাধব যে সময় যাত্রা শুরু করেন, তখনো বৃহত্তর ভারতের ভাবনা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দানা না বাঁধলেও এশীয় একতা বিষয়ক নানা চিন্তাভাবনা বাঙালি উচ্চমহলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। তাই ইন্দুমাধবের কলমেও শুরু থেকে শেষ একধরনের প্রতিবেশিতার বোধ ছড়িয়ে থাকে। জাহাজ থেকে বর্মার তটভূমি দেখে দ্বিধাহীন নৈকট্যের সুরে তিনি বলেন-

> ওই ব্রহ্মদেশ ও এই ইরাবতী নদী ভারতবর্ষেরই পাশে, সংস্কৃত নামে অভিহিত। গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত “সর্ব্বজীবে দয়াধর্ম্ম” এখানেও প্রচলিত। ব্রহ্মবাসীরা আমাদের প্রতিবেশী ও কত নিকট আত্মীয়। তাই বোধ হয় আমাদের আসতে দেখে কতকগুলি সাদা সাদা সুস্থকায় পক্ষী মধুর স্বরে ডাকতে ডাকতে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে আমাদের যেন সম্ভাষণ করতে এলো। অমন সুস্থ শরীর,- এমন উন্মুক্ত স্থানে না থাকলে হয় না। স্বরও কি তেমনি আনন্দব্যঞ্জক! যেন বলছিল, “আয় পথিক! আয় বিদেশী!- আয় তোরা আমাদেরই

> আপনার লোক। এ তোদেরই ঘর-বাড়ি। পথশ্রমে কাতর হয়েছিস্। মুখ হাত পা ধো। পর ভেবে সঙ্কুচিত হোস্ নে।”[161]

দেশগুলি বিষয়ে এই অনাড়ষ্ট আত্মবিশ্বাস মজুদ থাকায়, ত্রৈলোক্যনাথ, কৃষ্ণভাবিনী বা বিশ শতকে বিজয়চন্দ্র মাহাতবের লেখায় পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজেদের সমুদ্রযাত্রার মহৎ উদ্দেশ্য বা বৃহত্তর স্বার্থ বিষয়ে যে দীর্ঘ যুক্তি-দাবি আমরা দেখেছিলাম, এই কথনগুলিতে যাত্রার পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ে সেই গৌরচন্দ্রিকা খুব বেশি দরকার হয়না। আর দ্বিতীয়ত সাহেবদের আদবকায়দা শেখার তোড়জোর যেহেতু এই দেশগুলির জন্যে জরুরি ছিলনা। ফলত ইউরোপ যাত্রাকালে খাদ্যাভ্যাস বা পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতির যে নানা উৎকণ্ঠা ভরা ছবি আমরা দেখেছিলাম, এই পর্বের যাত্রায় তেমন কোনো জিনিস চোখে আসেনা, বরং জাহাজে একধরনের নির্ভার ঘরোয়া পরিবেশ বজায় থাকে। চিন যাত্রাকালে কেদারনাথ বন্দ্যপাধ্যায় যেমন লেখেন,

> আমরা বাঙ্গালী কয়টি যেন ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; সকলেরই বরযাত্রীর বেশ। মিহি আসবাবে দেহ ও ট্রাঙ্ক বোঝাই; কাহারও দু একটা পুরাতন প্যাণ্ট্ থাকিতে পারে। দেখিলে বোধ হয় যেন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্বে, মজলিস-মুগ্ধকর কাপড়-কোঁচানোর ধুম্ পড়িয়া যাইবে এবং খাম্বাজের মহলা চলিবে। সঙ্গে এক জোড়া করিয়া তাস থাকিলেই যাত্রাটা সর্ব-সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইত।[162]

---

[161]ইন্দুমাধব মল্লিক, “চীনভ্রমণ”, *ইন্দুমাধবের চীনভ্রমণ, সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী,* সীমন্তী সেন (সম্পা.) (ছাতিম বুক্স, ২০১০), পৃষ্ঠা- ১৮-১৯।

[162]কেদারনাথ বন্দ্যোপধ্যায়, *আমাদের চিনচর্চা, শতবর্ষ আগের ভ্রমণকথা: চিনযাত্রী,* শংকর (সম্পা.) (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১০), পৃষ্ঠা- ১৮০।

আমরা বুঝতে পারি, সাহেবী ধরাচূড়া পরা বা সাহেবদের সঙ্গে ওঠা-বসার অস্বস্তির বদলে এই পর্বের যাত্রায় বেশ কিছুটা বৈঠকী আড্ডার স্বস্তি জেগে ওঠে। বস্তত এই পর্বের গন্তব্যগুলিতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফর শুরু হয় কলকাতা বন্দর থেকে, ফলত ইউরোপ যাত্রার ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে বোম্বাই পৌঁছানোর যাত্রাপথের রকমারি অভিজ্ঞতা, দেশ ও দেশবাসীর অপরিচিত নানা দিক বিষয়ে বর্ণনা যা অনেক বৃত্তান্তেই বিশদে বলার রেওয়াজ চোখে এসেছিল তার সুযোগ তৈরি হয়না। কিন্তু জাহাজের বর্ণনা- জাহাজ পরিচালনা বিষয়ক নানা ব্যবস্থা, খাওয়াদাওয়া, প্রতিদিনের রুটিন, সহযাত্রী ও পরিচারকদের আচারব্যবহার, সেইসঙ্গে সমুদ্রপথের নানা অভিজ্ঞতা, সমুদ্রপীড়া, সামুদ্রিক ঝড় প্রভৃতি সকল কথনেই একইরকম গুরুত্ব পায়। প্রসঙ্গত ইউরোপ ভ্রমণের পর্বে সেই অর্থে তৃতীয় শ্রেণি বা ডেকপ্যাসেঞ্জারদের ছবি সামনে আসেনি আমাদের; এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তে কিন্তু এই শ্রেণির যাত্রীদের সজীব উপস্থিতি অনেক কথনেরই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণবিন্দু হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, ইউরোপ যাত্রাকালে যাত্রীরা অনেকসময়েই আত্মপ্র তিতে ব্যস্ত থাকেন- সাহেবী আদবকায়দা, সাহেব সহযাত্রীদের সঙ্গে ওঠাবসার হাজারো ঝক্কি সঠিকভাবে রপ্ত করা তাদের সুমদ্রপথের অনেকটা জুড়ে থাকে। কিন্তু এশিয়া ভ্রমণে যেহেতু এইধরনের কোনো বাড়তি শিক্ষার প্রয়োজন থাকেনা, ভারত তথা এশিয়া তথা সারা বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের এক বিচিত্র পর্ব গড়ে ওঠার অবকাশ তৈরি হয় জাহাজে। ইন্দুমাধব, কেদারনাথ, সুনীতিকুমার সকলেরই সমুদ্রপথের বর্ণনার এক সমৃদ্ধ অংশ জুড়ে থাকে এই জাতীয় বর্ণনা। মালয়বাসী তামিল চেট্টী হিন্দু, তামিল মুসলিম, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, গুজরাতী, সিন্ধি ব্যবসায়ী, বহু দিন দেশ ছাড়া ভাগ্যান্বেষী শিখ থেকে শুরু করে চৈনিক, কোরিয়ান, জাপানি, ইংরেজ, ফরাসি, ইতালিবাসী, রাশিয়ান, জার্মান সব ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ করে দেয় জাহাজযাত্রা। ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের মানুষ ও তাঁদের যাপনরীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইন্দুমাধব যেমন রীতিমতো পুলকিত হয়ে উঠে

বলেন, "জনতাপূর্ণ শহরে থাকিতে কোন সঙ্গীর অভাব হয় না, জাহাজেও সেইরূপ বেশ আনন্দেই সময় কাটিত।"[163]

আবার যে সব যাত্রীরা, এশিয়া ও ইউরোপ দুই দিকেই যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের যাত্রাপথের বর্ণনায় ইউরোপীয় জাহাজ বা জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে চিন বা জাপানি জাহাজের স্বভাবগত ভিন্নতার বিষয়টি নজরে আসে। রবীন্দ্রনাথের যেমন জাপানি জাহাজকর্মীদের আন্তরিক কর্মকুশলতার কাছে ইউরোপীয় জাহাজের কর্মনিষ্ঠাকে রীতিমতো যান্ত্রিক মনে হয়। আর ইউরোপের সঙ্গে এই ভিন্নতার সাপেক্ষেই গড়ে ওঠে প্রতিবেশী দেশ ও তাদের মানুষদের সঙ্গে একধরনের নিবিড় সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কারের উদ্যোগ। ফলে, জাহাজে জাপানি কর্মচারীদের স্বভাবপ্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান সমগ্র 'পূর্বদেশ'-কে। তিনি বলেন –

> কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম, জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু, এই জাপানি জাহাজে কাজ দেখিতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে, যেন আপনার বাড়িতে আছি, কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ, ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্মের কোনো খুঁত নেই।[164]

অবশ্য জাহাজ যে শুধু পূর্ব আর পশ্চিমের স্বভাবগত বৈপরীত্যের চিত্রকল্প নির্মাণ করে তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-শ্রেণি-দেশ-জাতির মানুষের সহাবস্থান ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে রীতমতো সমৃদ্ধ করে। এক বৃহত্তর মানবঐক্যের বোধও জাগিয়ে তোলে। ইন্দুমাধব লেখেন,

---

[163]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৫২।

[164]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জাপান-যাত্রী", *রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা- ৪১০।

"নূতন নূতন নানা দেশ, নানা প্রকারের লোকজন দেখিয়া মনে আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তারা আমাদেরই মত আহার বিহার করে দেখিয়া যেন নিকট আত্মীয় বলে মনে হতো।" এবং অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াতে এই সমুদ্রযাত্রা যে জুড়িহীন, সেই বিষয়েও তিনি নিঃসংশয় থাকেন-

> মনের যে অপ্রসার ভাব এবং শরীরের যে অবসন্নতার জন্য সমুদ্রযাত্রা মনস্থ করিয়াছিলাম তাহা দিন দিন অনেক কমিয়া যাইতে লাগিল। অগ্নিমন্দ্য ও অনিদ্রা যাইয়া বেশ ক্ষুধা ও সুনিদ্রা হইতে লাগিল। যে সকল যাত্রীর সহিত অনবরত মিশিতাম, তাঁহারা কত দেশ বেড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কত ধনী সওদাগর ছিলেন। কেহ কেহ বা ভ্রমণকারী কর্ম্মচারী,- বহুদিন ধরিয়া ওই অঞ্চলের সকল দেশ ঘুরিতেছেন। কোন্ জিনিসের কোথায় কত দাম, কোন্ দ্রব্য কোথায় কত সস্তায় উৎপন্ন হইতে পারে, কিরূপ বস্তু কোথায় আবশ্যক, ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আজীবন দেশে দেশে ফিরিতেছেন। অর্থোপার্জ্জন কি সহজে হয়? তাঁহাদের সহিত সদা সর্ব্বদা বসিয়া সেই সকল বিষয়ের ও নানা দেশের কথাবার্ত্তা হইত। তাহার মধ্যে অনেক ধনী চীনে সওদাগর ও অপর ধনী লোকও ছিলেন।

ইন্দুমাধবের কথা পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি সামাজিক নিষেধ ঠেলে বেরিয়ে এসে এই সমুদ্র পথে পাড়ি দেওয়ার অভিনব অভিজ্ঞতা বাঙালির চিন্তাগত মানচিত্রেরও বিস্তার ঘটায়। জাপানি, ইহুদী, পার্শী, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান– সকল স্তরের যাত্রীদের সঙ্গে দিন কাটানোর সুযোগ করে দেয়। এবং এই বিশ্ব-আঙিনার স্বাদ পেয়ে, নিজের বাঙালি বা ভারতীয় সত্তার উর্দ্ধে উঠে, মানবসত্তার এক আদর্শ অবয়বকে কল্পনা করার সাহস সঞ্চয় করা যায়। তাই কোরিয়ার বিবাহ প্রথার সঙ্গে জড়িত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের গল্পের সঙ্গে রামায়ণের ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ঘটনার আশ্চর্য সাদৃশ্য আবিষ্কার করে ইন্দুমাধবের মনে হয়- "সকল দেশেই মানব-

হৃদয়ের চিন্তার গতি বুঝি একই পথে প্রভাবিত।"[165] আমরা খেয়াল করি, সমগ্র কথন জুড়েই মানবসভ্যতার কিছু মূলগত ঐক্যের উপর বারবার বিশেষ জোর দেন ইন্দুমাধব। বলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই সকল নানা দেশের লোকের কার্যকলাপ দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থা বিশেষে আমরা যে কাজ করি, ইহারা সকলে ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। এখন দেখিলাম, লোকে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক একই সুরে হৃদয়ের উচ্ছাস বাহির হয়।"[166]

অবশ্য সকলের অভিজ্ঞতাতেই 'একই সুরে উচ্ছ্বাস বাহির হয়' এমন ভাবলে ভুল হবে। বরং বলা যায়, সমুদ্রপথ আমাদের সামনে কোনো পেলব, মসৃণ, সমসত্ত্ব প্রতিকৃতি তৈরি করেনা; সেখানে প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে ডেক প্যাসেঞ্জার সকলের গল্পই উঠে আসে। প্রথম শ্রেণির সঙ্গে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির অথবা ডেক প্যাসেঞ্জারদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিসমতার বাস্তবও জেগে ওঠে ভ্রমণকারীদের পর্যবেক্ষণে। প্রথমবার বিদেশ যাত্রাকালে, তৃতীয় শ্রেণির যাত্রী হিসেবে জাহাজের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বৈষম্যকে চাক্ষুষ করার কথা জানতে পারি আমরা রথীন্দ্রনাথের কলমে-

> জাহাজে চড়ার দ্বিতীয় দিনে আমরা একটু হাওয়া খাবার জন্য আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছোট্ট একফালি ডেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি উপরতলায় একদল প্রথম শ্রেণির যাত্রী অপরিসীম অবজ্ঞায় নীচতলার জীবগুলিকে নিরীক্ষণ করছে। তাদের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাব ছিল যা আমাদের দুজনের কাছে অসহ্য মনে হল। আমরা তৎক্ষণাৎ ডেক্ ছেড়ে আমাদের অন্ধকূপে ফিরে এলাম। তারপর যে-কটা দিন জাহাজে ছিলাম পারতপক্ষে ডেক্ মাড়াই নি।[167]

---

[165]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৫৮।

[166]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৬৪।

[167]রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১১১।

জাহাজের তৃতীয় শ্রেণির 'নাতি প্রশস্ত' কেবিনের নানাবিধ অব্যবস্থার কথাও লেখেন রথীন্দ্রনাথ, "তৃতীয় শ্রেণির ডেক্-প্যাসেঞ্জার হয়ে সমুদ্র পাড়ী দেওয়া- সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটি নাতি প্রশস্ত ক্যাবিনে মেঝে থেকে ছাদ অবধি পাঁচটি তাক শোবার বেঞ্চি- সেই খোঁয়াড়ের মধ্যে আমরা ছিলাম আটাশ জন যাত্রী। খাওয়া বসা শোওয়া সব একই জায়গায়। খাওয়া ছিল জঘন্য রকমের। ক্যাবিন যেমন নোংরা তেমনি ঘিঞ্জি।"[168] জাহাজে রথীন্দ্রনাথের সহযাত্রী মন্মথ ঘোষ তৃতীয় শ্রেণিতে যাত্রার নানা অসুবিধা ভরা অভিজ্ঞতার কথা লেখেন প্রায় অভিন্ন ভাষায়। আবার একই সঙ্গে, প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণরতা সরলা দেবীর কথা শোনারও সুযোগ হয় আমাদের। তাঁর বর্ণনায় জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণি যেন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই বিশেষ সূচক হয়ে ওঠে, যেখানে তিনি অবস্থানের প্রেক্ষিতে যাত্রীদের বিবিধ হাভভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের সঙ্গে ওঠাবসায় অনভ্যস্ত মা-মেয়ের আড়ষ্টতা থেকে শুরু করে[169] ইংরেজ কাপ্তেন ও কর্মচারী চালিত জাহাজে ভারতীয় ডাক্তারের হীনম্মন্যতা [170] কোনওকিছুই

[168]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১০।

[169]সরলা দেবী লেখেন, "ফিরিঙ্গি মহিলাদ্বয় উচ্চপদস্থ সাহেবদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্থ নয় বোধ হল। তাই তাঁরা স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ সাধ্যাতীত ব্যয় করে ফার্ষ্ট ক্লাসের টীকিট নিলেও, এখানে তাঁদের অনধিকার প্রবেশ, এই রকম একটা ভীত কুণ্ঠিতভাবে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন,- চাকরদের হুকুম করবার সাহসও তাঁদের নেই। রেঙ্গুণে বাড়ী বাড়ী পিয়ানো শিখিয়ে তাঁরা জীবিকা অর্জ্জন করেন। মেয়েটির আঁখিকোঁণে বর্ম্মীরক্তের মিশ্রণ পরিস্ফুট।" (পৃষ্ঠা- ১৩৯)

[170]সরলা দেবী লেখেন, "এর পর আলাপ হল জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে। আমি জাহাজে চড়ে অবধি এঁর খোঁজ করেছিলুম- শুনেছিলুম না কি বাঙ্গালী। কিন্তু কোথায় যে তিনি, কেউ বলতে পারেনি তখন। লোরেটো কন্‌ভেন্টে য়ুরোপীয় নান্‌দের মধ্যে একটী শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গালী নান্ ছিলেন। সব সাদার মধ্যে হঠাৎ একটু শ্যাম কেমন কেমন লাগ্‌ত। জাহাজের অফিসরী বেশভূষা ও নাবিকী টুপি পরিহিত সাদা মুখেদের মধ্যে একটী শ্যামমুখ অফিসর যে মধ্যে মধ্যে চোখে পড়োতেন তাতেও কেমন কেমন ঠেকত- মনে হত, বুঝি তাঁদের একটী পোষ্য-পুত্র। দেখতে খুব ছেলেমানুষ, ভালমানুষ, আর প্রায় সর্ব্বক্ষণ কাসিতে পিঠটা একটু নোয়ান। জানতে পারলুম ইনিই জাহাজের ডাক্তার, একজন উচ্চপদের অফিসার। ক্রমে এঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে শুনলুম, তাঁর পদ

তাঁর চোখ এড়ায় না। এই বিষয়ে আমরা তাঁর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের জাহাজ চড়ার উচ্ছ্বাসের বিস্তৃত বিবরণটির দিকে একবার চোখ রাখব-

> জাহাজ থেকে তীরবর্ত্তী আত্মীয়বন্ধুদের উদ্দেশ করে যাত্রীদের রুমাল ঘোরান অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। রুমাল ঘোরাচ্ছিলেন সেকেণ্ডক্লাসের ডেক থেকে কতকগুলি থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার। বঙ্গীয় যুবক আর দুটী সেকেণ্ডক্লাসের ফিরিঙ্গি মেয়ে- খাঁটি সাহেবসুবোরা নয়। হয়ত বর্ম্মাযাত্রী অ্যাংলো সাহেবদের কলকাতায় আপনার বলতে কেউ ছিল না- আর এই নব্য বঙ্গসন্তানেরা বোধ হয় কোথাও শুনে থাকবেন জাহাজ থেকে রুমাল ঘোরানটা পুরোদস্তুর যাত্রী-কায়দা; তাই অবিশ্রাম বিঘূর্ণন চলতে থাকল। কলকাতার উপকূলের যখন বিন্দুবিসর্গও আর দৃষ্টীগোচর রইল না; তখনই তাঁরা ক্ষান্ত দিয়ে নেপথ্যে অন্তর্দ্ধান হলেন।[171]

আমরা টের পাই, এই নিরীক্ষণ আসলে অনেকটাই যেন ফার্স্টক্লাসের উচ্চতা থেকে সেকেণ্ড বা থার্ডক্লাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া দৃষ্টি। যে অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টিপাতে কুঁকড়ে থাকার গল্প রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছিলাম; ঠাকুর বাড়ির আরেক আত্মীয়ার কথনে ঠিক ততটা তীব্র অবজ্ঞা না থাকলেও অনুকম্পা কিন্তু ভরপুর। এবং তা আরও বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যখন তিনি অন্যান্য ক্লাসের মহিলা যাত্রীদের বর্ণনা দেন -

> এবার ডেকের উপর আবির্ভূত হলেন তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা। মেয়েগুলি খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া পাখীর মত ঘুরঘুর করতে লাগল। একবার ফার্ষ্টক্লাসের ডেকে, একবার

নিয়মানুযায়ী উচ্চ হলেও, বাঙ্গালী বলে, তাঁকে পদানুযায়ী সম্মান ও অধিকার সব স্থলে দেওয়া হয় না। ভোজনগৃহে অফিসারদের যে আলাদা টেবিলের কথা বলেছি, সান্ধ্য ভোজনের সময় তাঁর সেখানে গিয়ে খাবার অধিকার নেই- ছোট অফিসারের মত তাঁর ডিনারটা ক্যাবিনেই খেতে হয়। সেইজন্যে আত্মসম্মানরক্ষার্থ অন্যান্য সময়ও টেবিলে গিয়ে খান না, ক্যাবিনেই খান। এই রকম আরও কতকগুলি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ইতরবিশেষ করা হয়।” (পৃষ্ঠা- ১৩৯-১৪০)

[171]সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৩৭।

> সেকেণ্ডক্লাসের ডেকে বেড়ীয়ে যাচ্ছে, কখনো রেলিং ধরে গঙ্গার উপর ঝুঁকছে, কখনো কখনো এখান ওখান থেকে ডেক চেয়ার টেনে এনে এক জায়গায় জড় করে জটোল্লা করে বসে গল্প করছে। বয়স কারো ষোল সতের বছরের বেশী নয়; আলতামাখা খালি পা, সিঁথেয় ধ্যাবড়া করে সিঁন্দূর মাখা। যদিও একালের ফ্যাশনে ফেরতা দিয়ে শাড়ী পরবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন পরিপাট্য ফুটাতে পারেনি- দেখলেই মনে হয় পাঁড়াগাঁয়ের মেয়ে। পরে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম তারা পাঁড়াগাঁয়ের নয়, কলকাতারই মেয়ে বটে, কিন্তু এমন শ্রেণির, যাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা বা অপর শ্রেণির দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশার প্রথাটা এখনও প্রচলিত নেই। বেচারীদের তাই আজ এত নিঃসঙ্কোচ ফূর্তি। কেউ বাধাও দিচ্ছে না।[172]

বেশ বোঝা যায়, লেখিকার সঙ্গে ‘আলতামাখা খালি পা, সিঁথেয় ধ্যাবড়া করে সিঁন্দূর মাখা’ সেই সহযাত্রীদের মাঝে আসলে রয়েছে এক অনতিক্রম্য শ্রেণিগত দূরত্ব। এবং এই শ্রেণিগত তফাতের কারণে জাহাজযাত্রীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের নানা দিক চোখে পড়ে রাসবিহারী বসুর অভিজ্ঞতায়। রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জাপানে পালানোর সময়, তিনি বহুবার প্রত্যক্ষ করেন শ্রেণিগত এই বৈষম্যকে। শুধু সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা বা কামরার অপ্রশস্ততা নয়, তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়মজনিত কড়াকড়ির সমান্তরালে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের জন্যে নিয়মের শিথিলতার কথা সবিস্তারে লেখেন তিনি। খাবারের রসদ না থাকা সত্ত্বেও যখন তৃতীয় শ্রেণির শিখ যাত্রীদের বন্দরে নামতে দেওয়া হয়না বা যাবতীয় সংক্রামক রোগের পরীক্ষা কেবল কঠোরভাবে তাদের উপরেই করা হয়; প্রয়োজনে নামিয়ে দেওয়াও হয় তখন শ্রেণিবিশেষে নানাবিধ নিয়মের বহর যে প্রায়শই অমানবিকতার নামান্তর, সে কথাও কঠিন ভাষায় জানান তিনি। এবং সেইসঙ্গে প্রথম শ্রেণির ধনী যাত্রীদের জন্যে নিয়মের ছাড় আদতে যে অর্থেরই মহিমামাত্র, তাও বুঝতে

---

[172]প্রাগুক্ত।

ভুল হয়না। সিঙ্গাপুরে, কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে দেখে, ব্যবহারের এই বিভেদ সম্পর্কে তীব্র ভাষায় লেখেন তিনি,

> হায় টাকা তোমার মহিমা অনেক। প্রথম শ্রেণি এবং অপর শ্রেণির লোকেরা সকলের ভিতরেই ভগবান আছেন। অথচ প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হইল না। কারণ কি? কারণ তাহারা বেশী টাকায় টিকিট কিনিয়ছে। যাহারা সবচেয়ে দামী টিকিট কিনিতে পারে, তাহার কখনই খারাপ লোক হইতে পারে না! এ ধারণাটা Capitalism-এর ফল। টাকা থাকিলেই গণ্যমান্য ব্যক্তি, টাকা না থাকিলে যতই বিদ্বান হউক না কেন, সমাজ এবং দুনিয়া তাহাকে মানিতে রাজী নহে।[173]

তবে আগেই বলেছি জাহাজের জীবন কোনো একবর্ণী ক্যানভাস নয়, বরং তা মানবিকতা, সহাবস্থান থেকে শুরু করে জাতিভেদ, শ্রেনীভেদ, বর্ণভেদের মতো নানা বিপ্রতীপতায় ভরা এক বহুবর্ণী কোলাজ হয়ে ওঠে। এককথায় নানা বিপ্রতীপ স্বর ও সুরে ভরা জাহাজযাত্রার অভিজ্ঞতা, যাত্রীদের দেখা-শোনা-বোঝার সীমানাকে ক্রমেই বৃহৎ করতে থাকে। যেমন জাহাজে ভিন্ন ভিন্ন জাত, ধর্ম, ভাষার মানুষের স্বচ্ছন্দ সহাবস্থানের মধ্যে এক মানবিক স্পর্শ খুঁজে পান সুনীতিকুমার, “এতগুলি জা’তের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ মনোভাব, নিজ-নিজ চিন্তা; কিন্তু বেশ মিলে মিশে সবাই চ’লেছে। ভদ্রভাবে থাক্‌বার ইচ্ছে অপরের সঙ্গে বনিয়ে’ চলবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিজের জা’তের prestige নামক গর্ব অথবা ধর্মান্ধতা এসে খর্ব ক’রে না দেয়, তা হলে, ভাষার অভাবেও মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য আটকায় না। এই জাহাজে তাই দেখ্‌ছি।”[174] এবং জাহাজে দেখা সৌহার্দ্যের সূত্র ধরেই, ভারতে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতিগত বিদ্বেষের রাজনীতির প্রসঙ্গও উঠে আসে, “...নানা

---

[173]রাসবিহারী বসু, *রাসবিহারী বসু রচনা সংগ্রহ,* অসিতাভ দাস (সম্পা. ও অনূদিত) (কলকাতা: পত্রলেখা, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা- ৮৭।

[174]সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।

জাতের লোক দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সদ্ভাব রেখে যে চ’লেছে, এটা দেখে, আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ লোকেদের প্ররোচনায় সুসভ্য মুসলমান হিন্দুতে যে প্রায় নরখাদক জা’তের মতনই নরক সৃষ্টি ক’র্‌ছে, সে কথা স্মরণ ক’রে নিজেদের উপরে আর মনোভাব বিশেষের উপরে বিশেষ ক’রে ধিক্কার দিতে হয়।[175] প্রসঙ্গত ভারতের ধর্মীয় বিভাজনের এই প্রসঙ্গটি বিশদে আলোচিত হয় রবীন্দ্রনাথের “পারস্যে”-র বেশ কিছু অংশ জুড়ে। পারস্য, ঈজিপ্ট, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের আধুনিক সমাজ থেকে ধর্মীয় সহনশীলতা, অন্ধবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে তাঁর প্রশংসনীয় মনে হয়। এবং সেই প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে চলে আসে ভারতের ধর্মীয় বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতির কথা, “জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ। ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।”[176] পারস্যে বিশেষ পরীক্ষায় পাশ করে, নিজের শিক্ষা তথা যোগ্যতার যথাযথ প্রমাণ দিয়ে ধর্মের কাজে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় শঠতা তথা অরাজকতা রুখতে ভারতের ক্ষেত্রেও শিক্ষণীয় হতে পারে বলে তাঁর মনে হয়-

> ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে–অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্মপ্রচারক, কোরানপাঠক, সৈয়দ–এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধি প্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সংকুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস করে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ

---

[175]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৩৭।

[176]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৪২।

> পণ্ডিতের সম্মতি-অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে।[177]

ধর্মের নামে আচারবিচারের বাড়াবাড়ি, ভণ্ডামি থেকে মুক্তি পেতে তিনি ভারতের অগণিত পুরোহিত-পাণ্ডাদেরও যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্যে 'উপাধি-পরীক্ষা' দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন-

> অন্তত একবার কল্পনা করে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক বলে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি। কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরো অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্ছে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যার পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তা হলে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন-কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে; যদি অন্যের জন্য হয় তা হলে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মকে যদি জীবিকা, এমন-কি লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্তব্য এ কথা মানতেই হবে।[178]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের সূত্রে বিশশতকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় আরও এক নতুন মাত্রা সংযোজনের কথা উল্লেখ করা যায়, তা হল আকশপথে যাত্রা। উড়োজাহাজে চেপে পারস্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার মুহূর্তটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন লেখেন -

---

[177]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬২৮।

[178]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬২৮।

> এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘন্টা থেমে আবার আকাশযাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটানো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন; ক্ষণে ক্ষণে চলছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল। কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন করে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকি তিনজন পালাক্রমে তরী-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু-বা আহার, কিছু-বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়। [179]

"যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না"- তাঁর এই মন্তব্যই বুঝিয়ে দেয় সফরের পূর্ববর্তী মাধ্যমগুলির সঙ্গে এই আধুনিক প্রকরণের বিজাতীয়তা। এবং যাত্রীদের মধ্যে সম্বন্ধহীনতার পাশাপাশি আকাশপথের চূড়ান্ত যান্ত্রিকতার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কহীনতা তথা নান্দনিকতার অনুপস্থিতির বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়না -

> এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল করে নয়, বাতাসকে পীড়িত করে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখির গান নেই, জন্তুর গর্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় করে আজ চিৎকার করছে।
>
> সূর্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টামাত্র করে নি। আকাশনীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেন্টের বালাই

---

[179]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬২৬-৬২৭।

> নেই; শোভাকে ও অবজ্ঞা করে; অনাবশ্যককে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল, পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ঐ যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মতো ভন্ ভন্ করে উড়ে চলল।[180]

আধুনিক পৃথিবীতে আকাশযানই যে ধীরে ধীরে সামাজ্যবাদী আগ্রাসন বিস্তারের, হননবিদ্যার অব্যর্থ অস্ত্র হয়ে উঠছে সেই বিষম বাস্তবটিও তাঁর বিদগ্ধ দৃষ্টি এড়ায়না। পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা প্রযুক্তিনির্ভরতার আকাশচুম্বী সাফল্যের এই উদাসীন নিষ্ঠুরতার দিকটিকে দাগিয়ে দিয়ে তিনি লেখেন-

> বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের, সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।[181]

যদিও আকাশযানের এই উদ্ভাবনের মধ্যে মানবসভ্যতার অদম্য পরিশ্রম তথা প্রচেষ্টার যে দিকটি প্রতিফলিত হয় সে কথা বলতেও তিনি ভোলেননা -

---

[180]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬২৯।

[181]প্রাগুক্ত

> এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য এ যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে–সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্তের দুষ্যন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন–আমারও সেই দশা। এ কালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর–সেটাই সব-চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তুলতে হচ্ছে, তবু এরা পরাভব মানছে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।[182]

জলপথ বা আকশপথ – যাত্রার মাধ্যম যাই হোক না কেন অভিজ্ঞতার পরিসর ক্রমশ সমৃদ্ধ হয় জাহাজ যখন মূল গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই ছোট-বড় নানা বন্দরে নোঙর ফেলে। বস্তুত প্রায় সকল যাত্রীর কথনেই উঠে আসে এই স্পর্শবিন্দুগুলি বিষয়ে কমবেশি অভিজ্ঞতার কথা। ইন্দুমাধব যেমন প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক পরিচয়কে যথাসম্ভব তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের পারস্য সফরও প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি পারস্যের ইতিহাসের অভিগমন বিষয়ে এক নিবিড় পাঠ হয়ে ওঠে যাতে শামিল হয় ভারত থেকে শুরু করে এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশের ইতিহাস-ধর্ম-রাজনীতি-সমাজনীতি বিষয়ক বিবিধ পর্যবেক্ষণ। আলোচিত হয় তৎকালীন বিশ্বের ঔপনিবেশিক আর সাম্রাজ্যবাদী নানা ছকের রূপরেখা। একই প্রবণতা চোখে পড়ে সুনীতিকুমারের লেখাতেও। সকলে এত বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও প্রায় সব কথনেই বিদেশের মাটিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের বসতিস্থাপন তাঁদের বর্ণনায় এক বিশেষ জায়গা নেয়। কেদারনাথ যেমন লেখেন, “দেখিলাম হংকং-এর সহরে বিস্তর বম্বাই অঞ্চলের লোক, সিন্ধুদেশবাসী ও পাঞ্জাবী, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীর বিভব-বিভাগটা যেন সম্মুখে সমুদ্র ও পশ্চাতে পর্বতের

---

[182]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩০।

চাপে জড়সড় হইয়া এক বর্গ মাইলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পাঞ্জাবীরা মুদীখানার দোকানও খুলিয়াছে,- বড়ি, বেসন, পাপর, পকৌড়ি,- নাগাইত চানাচুর- সবই বর্তমান!”[183] এবং শুধু ভারতীয়ই নয়, নানা দেশের নানা মানুষের সহাবস্থান যেন বিশ্বায়নের এক নতুন ছবির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটায়। তাই রেঙ্গুন পৌঁছে সেখানে নানা দেশীয় মানুষের ভিড়ে সে দেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনুপস্থিতি দেখে বিস্মিত ইন্দুমাধব লেখেন,

> দেখিলাম সকল নৌকাগুলিরই মাঝি চট্টগ্রামের মুসলমান লস্কর। একটিতেও ব্রহ্মদেশীয় মাঝি নাই।
> তীরে নামিয়া দেখি জাহাজ হইতে যে সব লোক জিনিসপত্র নামাইতেছে ও উঠাইতেছে, তাহারা সকলেই মান্দ্রাজ দেশীয়। তাহাদের মধ্যে একজনও ব্রহ্মদেশীয় লোক নহে।
> ঘোড়া গাড়িতে উঠিতে গিয়া দেখি,- সব গাড়োয়ানই উত্তর-পশ্চিম দেশের মুসলমান। রাস্তায় দেখি যত পাহারাওয়ালা সবই শিখজাতীয়; কেহই মগজাতীয় নহে। দুইধারের দোকানে দেখি, সব দোকানদারই হয় সুরাটী মুসলমান, নয় ইহুদী, নয় পার্শী, নয় চীনে, নয় সাহেব, বর্ম্মন একজনও নহে।...এই সকল দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সবই তো দেখিলাম ভিন্ন দেশীয় লোক- চাটগাঁয়ের লস্কর, মান্দ্রাজী কুলী, পশ্চিমে গাড়োয়ান, শিখ পাহারাওয়ালা, সুরাটী, ইহুদী, পার্শী ও চীনে ব্যবসাদার। এখানকার আদত ব্রহ্মদেশী লোক গেল কোথায়?[184]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই বিস্ময়ই খানিকটা বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়। জাপান যাত্রাকালে বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের রমরমা হতাশ ও বিরক্ত করে তাঁকে। রেঙ্গুন পিনাং সিঙ্গাপুর সর্বত্রই বন্দর জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি যুদ্ধ বা বাণিজ্যিক জাহাজের মধ্যে একধরনের ধনসর্বস্ব ব্যবস্থার স্থূলতাকে প্রকট হতে দেখেন তিনি। জাহাজ থেকে রেঙ্গুন দেখে তাঁর মনে হয়,

[183] কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২২৪।

[184] ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ২০।

> আদালতে সত্যপাঠ করে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে রেঙ্গুন নামক এক শহরে - আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড়ো রকমের সত্যপাঠ করতে হয় সেখানে আমাকে বলতেই হবে, রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।
> এমন হতেও পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার; বাড়িগুলি তক্‌তক্‌ করছে; রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙিন রেশমেরকাপড় পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ - বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা, গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয় বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলারফাঁসি, রেঙ্গুন শহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।[185]

বস্তুত পৃথীবির নানা জাতের নানা দেশের মানুষের একত্রে বসতি স্থাপনের এই ছবির মধ্যে তিনি নিছক ব্যবসায়িক বা বৈষয়িক তাগিদ ব্যতীত আর কোনো মহত্ত্ব খুঁজে পান না, বন্দরগুলিকে দেখে তাঁর মনে হয়, "এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই।"[186] সিঙ্গাপুরে নেমে ইন্দুমাধবেরও যেমন মনে হয়, "সহরের ভিতর ঢুকিয়া যতদূর দেখিলাম, সমস্ত শহরটি কেবল দোকানে পরিপূর্ণ।...পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এখানে ব্যবসাসূত্রে আসিয়াছে। সকল লোককে দেখিলেই মনে হয় তাহারা অস্থায়ী, কেবল ধন লুটিতে আসিয়াছে।"[187] জাপানে গিয়ে হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা ও কারখানা পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে উদ্যোগী মন্মথনাথ অবশ্য এই ব্যবসায়িক তৎপরতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেননা। বরং পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এমনকি ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় বাঙালির ব্যবসা বিমুখতার তুলনা উঠে আসে তাঁর লেখায়। জাহাজ পেনাং বন্দরে পৌঁছালে

---

[185]"জাপান-যাত্রী", পৃষ্ঠা- ৪০৩।

[186]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৫।

[187]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১৫।

তিনি লেখেন, "এখানকার অধিকাংশ প্রবাসীই চীনাম্যান। সকলেই ব্যবসাসূত্রে আছেন। রেঙ্গুন ছাড়িয়া বাঙ্গালীর মুখ আর দেখিলামনা। শুনিলাম পেনাঙে ২।৩ জন বাঙ্গালী আছেন। বোধ হয় তাঁহারা কলম পিশিতেই এতদূর আসিয়াছেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী একজনও নাই।"[188] বাঙালির ব্যবসা বিষয়ে এই বিরাগ তথা পশ্চাদগামী মনোভাব তাঁকে বারবারই হতাশ করে। কারণ, ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বনই যে জাতিগত উন্নতির প্রধান সোপান সে বিষয়ে তিনি একপ্রকার নিঃসংশয় থাকেন -

> (সিঙ্গাপুরে) এখানে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই ব্যবসাসূত্রে আছে। কিন্তু কয়েকজন গুজরাটী ব্যতীত আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ী কাহাকেও দেখিলাম না। ব্যবসাই জাতীয় উন্নতির প্রধান মূল। ইহা ব্যতীত, এ পর্য্যন্ত কোনও জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতিকে উন্নতির সোপানে উন্নত দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই ব্যবসায়ী। যাহারা ব্যবসায়ে যেরূপ উন্নত, তাহারা সেইরূপ জাতীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। সভ্য জগতে ব্যবসাই জাতীয় উন্নতির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্য জাতীয় জীবন গঠন ও পোষণ করিয়া থাকে।

বাণিজ্য বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও, চীনা শ্রমজীবী নারীপুরুষের কর্মদক্ষতা, সপ্রতিভ গতিবিধি কিন্তু সকলকেই মুগ্ধ করে। রাসবিহারী বসু লেখেন- "চীনা শ্রমজীবীদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমান পরিশ্রম করিতে পারে। অসংখ্য স্ত্রীলোককে পুরুষের ন্যায় নৌকা পরিচালনা করিতে, বোঝা বহিতে, দোকান এবং ফেরি করিতে দেখিয়াছি।"[189] একই প্রশংসা উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের কলমেও এবং এই প্রসঙ্গে তিনি তুলনা টানেন ভারতের কর্মে অনীহাগ্রস্ত, নানা আচারবিধিতে ব্যতিব্যস্ত জনসাধারণের।

---

[188]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৪।

[189]রাসবিহারী বসু, পৃষ্ঠা- ২০।

যাত্রাপথে আরেকটি অভিজ্ঞতার উল্লেখও প্রায় সকলের লেখাতেই আসে, তা হলে হংকং বা সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে নিযুক্ত শিখ পুলিশ বা পাহারাদারদের কথা। সিঙ্গাপুরে বিশালাকায় শিখ পাহারাওয়ালাদের হম্বিতম্বি দেখে ইন্দুমাধব বিশেষ উচ্ছ্বসিত হন। বিশেষত খর্বকায় মালয় পুলশের সামনে ভারতীয় পাহারাওয়ালার এই সদর্প উপস্থিতি, ব্রিটিশ শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা তাঁকে রীতিমতো গর্বিত করে,

> এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই শিখ পাহারাওয়ালা দেখা যায়। তাদের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের যেন শান্তি রক্ষা চলে না। বেছে বেছে ভীমাকৃতি শিখ আমদানী করা হয়েছে। অধিকাংশই দেখিলাম ৬ ফুটের উপর ঢেঙ্গা। তাহারা রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া শান্তি রক্ষা করিতেছে। খর্ব্বাকৃতি মালয় পুলিশ তাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া হুকুম তামিল করিতেছে। শিখ পাহারাওয়ালাকে সেখানে সকলেই যমের মত ভয় করে। দোষীর বিচারও তাদের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। গালি, ঘুষি, চপেটাঘাত, যষ্টিপ্রহার ও চীনেদের বিনানী ধ'রে টানিয়া উৎপীড়োন,- ইহা প্রায়ই দেখা যায়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড সচরাচর হইয়া থাকে। শিখ পাহারাওয়ালা একবার হাঁক দিলেই হল- সকলে ভয়ে কাঁপে।[190]

শুধু তাই নয়, বিদেশ বিভুয়ে তাঁদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলে তিনি স্বজন সুখও অনুভব করেন, "আমরা তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কহিলে, তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। দেশের লোক দেখিয়া যেন আত্মীয়তার স্পৃহা জাগিয়া উঠিত। চীন-রিক্সাওয়ালাকে আমাদিগকে দেখাইবার স্থান সকল বুঝাইয়া দিত, এবং আমাদের যেন কোনও বিষয়ে অসুবিধা না ঘটে, সে সম্বন্ধেও শাসাইয়া দিত।"[191] কিন্তু এই একই দৃশ্যের প্রতিগ্রহণ আবার পুরোপুরি পাল্টে যায় সরোজনলিনীর অভিজ্ঞতায়। যাঁদের আস্ফালন দেখে ইন্দুমাধব গর্বিত হয়েছিলেন, তাঁদের

---

[190]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৪৯।

[191]প্রাগুক্ত।

সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভূতি হয় সরোজনলিনীর- ঔপনিবেশিক শাসকের পদানত দাস ছাড়া আর কিছু মনেই হয় না। তিনি লেখেন,

> সিঙ্গাপুর হংকং ও বিশেষ ভাবে সাংহাইয়েতে অনেক শিখ ও পাঠান পাহারাওয়ালা আছে। এরা প্রত্যেকেই খুব লম্বা ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ। খর্ব্বাকৃতি চীনেদের মধ্যে এদের আরও লম্বা ও বলবান্ দেখায়। এদের দেখলে আনন্দ হয় কি দুঃখ হয়, তা বলা শক্ত। এই বলবান্ দীর্ঘকায় পাহারাওয়ালা যে আমাদের দেশের লোক এ কথা মনে হলে গর্ব্ব হয়, কিন্তু পরক্ষণে যখন মনে পড়ে যে এত বল এত সতেজ শরীর নিয়েও এরা সামান্য বেতনে দাসত্ব কর্‌ছে, তখন লজ্জায় মরে যেতে হয়। আমরা ভারতমাতার কত অযোগ্য সন্তান দেশের বাইরে এসে মনে তা আরও বেশী রকমে উপলব্ধি করা যায়। মায়ের এমন তেজীয়ান সন্তানগুলোও আজ বিদেশে এসে দাসত্ব কর্‌ছে! ভারতের লোক দাসত্ব ছাড়া বুঝি আর কিছু যাবে না![192]

আমরা বুঝতে পারি, দুজনের দৃষ্টিকোণের এই প্রভেদ আসলে অনেকটাই সময়গত, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দুমাধব যখন তাঁর যাত্রা শুরু করছেন, তখন ইংরেজ শাসনের নানা দোষত্রুটি সামনে আসতে শুরু করলেও, শাসক হিসেবে তাঁদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার সাহস বা ইংরেজমুক্ত ভারতের স্বপ্ন তখনো শিক্ষিত শ্রেণির অগোচরে ছিল। ইন্দুমাধবের কথনে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের বা অধিকার কায়েমের ইতিহাসের নানা তথ্য উঠে এলেও ইংরেজদের জাতিগত যোগ্যতা বিষয়ে তেমন সংশয় আমরা পাইনা। বরং নিজ যোগ্যতাবলেই যে তারা দুর্বল জাতিদের উপর রাজত্ব করছে সেই বিষয়ে তিনি বেশ নিশ্চিন্তই থাকেন,

---

[192]সরোজনলিনী দেবী, “জাপানে বঙ্গনারী”, *ইন্দুমাধবের চীনভ্রমণ, সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী,* সীমন্তী সেন (সম্পা.) (কলকাতা: ছাতিম বুক্‌স, ২০১০), পৃষ্ঠা- ১৬৫-১৬৬।

> যে কারণে মানুষের উন্নতি ও অবনতি হয় সেই কারণেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি বা অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। চারিদিকের পরিবর্ত্তনের স্রোতের সহিত সমানে অগ্রসর হইতে না পারিলে স্থানচ্যুত হইতেই হইবে। তাই আসিয়ার জাতিসকল পরহস্তে স্বাধীনতা হারাইয়া অশেষ নির্য্যাতন সহিতেছে। যারা পূর্ব্ব হইতেই পরের করতলগত হইয়াছে তাদের আর আশা নাই।[193]

অন্যদিকে সরোজনলিনীর যাত্রাপর্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইচ্ছা যখন মজবুত হতে শুরু করেছে, তখন ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতার এই তত্ত্ব অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে, ফলত 'পরাধীনতা'-র যে কোনও ছবিই সেখানে নেতিবাচক অভিঘাত তৈরি করতে থাকে। এবং বিদেশে দেখা দৃশ্য যেন দেশ সম্পর্কে হতাশাকে আরও গাঢ় করে তোলে। প্রসঙ্গত শিখ পাহারাওয়ালাদের আস্ফালন রীতিমতো লজ্জিত করে রবীন্দ্রনাথকেও, এবং ইংরেজ প্রভুর কাছে চাকরিবৃত্তির কদর্য নমুনা বলেই মনে হয়। "শূদ্রধর্ম" প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

> প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার দুর্গতি অনেক দেখেছি-, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশবিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না; কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহুদূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।[194]

আমরা বুঝতে পারি, ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কীভাবে অঙ্গাঙ্গী থাকে আত্মসমালোচনার নানা পাঠ যা শুরু হয়ে যায় গন্তব্যে পৌঁছানোর বহু আগে থেকেই। এবং সেই পাঠে ধরা দিতে থাকে

---

[193] ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১৩০।

[194] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শূদ্রধর্ম", *রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৭), পৃষ্ঠা- ৬১৩-৬১৪।

পরাধীন জাতির বিবিধ সীমাবদ্ধতা, অভাব আর আকাঙ্ক্ষার কথা। সিঙ্গাপুরের বন্দরে জাপানের নিজস্ব যুদ্ধ জাহাজ দেখার অভিজ্ঞতা জানিয়ে রাসবিহারী বসু যেমন লেখেন,

> সিঙ্গাপুরের কাছের সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ পাহারা দিতেছিল। আমাদের জাপানী সহযাত্রীরা নিজেদের রণপোত দেখিয়া বড়ই খুশী। আমাকে বলিল, দেখুন, ঐগুলি আমাদের warship! জাপানের warship- এই কথাটি শুনিয়া বেশ একটা আনন্দ হইল।[195]

আমরা অনুধাবন করতে পারি, এই জাহাজ আসলে উপনিবেশিত চেতনে বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আর ক্ষমতার দ্যোতক হয়ে ওঠে। বস্তুত বেশিরভাগ বৃত্তান্তেই সমুদ্রপথে দেখা ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাহাজ, রণতরীগুলি ‘সভ্যতা’ আর শক্তির সমার্থক হয়ে উঠে ক্ষমতার ছকে বিভক্ত এক বিশ্বের ছবি তুলে ধরে, যে বিশ্বদরবারে পরাধীন জাতির কোনো অস্তিত্বই নেই। ফলত জাপানের রণতরী দেখে আনন্দিত হওয়ার পরক্ষণেই রাসবিহারী বসুর মনে হয়, “...এক সেকেণ্ড পরেই চোখ থেকে জলের ধারা পড়িতে লাগিল। হায়, আমরা কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যে আমাদের একখানিও রণপোত নাই। ভারতের ১৬০ বছরের ইংরাজ রাজত্বের ফলে আজ আমাদের একখানিজও যুদ্ধজাহাজ নাই...”[196]। তবে এই পর্বের বৃত্তান্তগুলিতে আমরা দেখি, ‘স্বাধীনতা’ শব্দটির সঙ্গে ইংল্যান্ড বা ইউরোপকেই অভিন্ন ভাবতে শেখা উপনিবেশিত শিক্ষা তথা শাসনে অভ্যস্ত বাঙালির কাছে চিন বা জাপানের এই স্বাধীনসত্তা এক অভিনব অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেয়। এময় বন্দরে ইউরোপীয় জাহাজের মাঝে চিনের জাহাজের সদম্ভ উপস্থিতির স্মৃতি যেমন ইন্দুমাধবের মনে ‘সুস্পষ্টরূপে’ ধরা থাকে

---

[195]রাসবিহারী বসু, পৃষ্ঠা- ৮৬।

[196]প্রাগুক্ত।

> ...যখন এময়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, এইবার ইংরাজ অধিকার ছাড়ীয়া খাস চীন-রাজত্বে আসিয়াছি।...এময়ে বন্দরে ঢুকিবার পথে আমাদের অনেক দেরি হইল। এ সকল স্থান তো আর ইংরাজ-রাজত্ব নহে,- সমীহ করিয়া ঢুকিতে হয়। তখন জাহাজের মাস্তুলে "ড্রাগন" আঁকা চীনে নিশান উড়ান হয়। বন্দরের বাহিরে নঙর করিয়া জাহাজ পাইলটের জন্য ঘন ঘন সিটী দিতে লাগিল। এখানে প্রায় ৫/৬ ঘণ্টা দেরি হইল। এমন দেরি কোথায়ও কখন হয় নাই। ঢুকিবার পথেই দেখিলাম, অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ ও ক্রুজার জাতীয় জাহাজ নঙর করিয়া রহিয়াছে। তার মধ্যে মার্কিন ও ফরাসী জাতির জাহাজই বেশী। সবগুলি সুসজ্জিত, সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কাহারও বা চারিটী মাস্তুল, কাহারও বা তিনটী, কাহারও বা দুইটী। স্তরে স্তরে সারি সারি বুল বুলি সাজান, তাহার ভিতর দিয়া কামানের মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে। মাস্তুলের উপর লোহার মাচাবাঁধা; সেখান হইতে বন্দুক ছুঁড়ে।...এখানে বন্দরের এক নূতন রকম ব্যবস্থা; এক ধারে ভিন্ন দেশীয় জাহাজ থাকিবে, আর এক ধারে চীনে জাহাজ থাকিবে। চীন এলাকায় প্রথম আসিয়া নঙর করিবার সময়কার দৃশ্যটি এখনও আমার মনে সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া আছে।...চীনেম্যানরা এদেশে স্বাধীন। ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ এখানে চীনের প্রজা।[197]

প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা শোনা যায় সরোজনলিনীর লেখাতেও। জাহাজ জাপানে প্রবেশ করার পরে তিনি লেখেন-

> এখন আমরা জাপানি রাজ্যে, সে জন্যে পাইলট্ও অবশ্যিই জাপানি, লোকটার পোষাক পরিচ্ছদও অবিকল জাপানী।...ইংরেজদের মনের ভাব আজ বড় ম্লান বলে বোধ হলো। জাপানীদের স্বাধীনতা এঁদের কাছে ভাল লাগেনা তা বেশ বুঝ্‌লাম। ভারতবর্ষে এঁদের সর্ব্বত্রই আধিপত্য, কিন্তু এখানে এঁরা কেউ নয়। এখন থেকেই তাঁদের ভাব-ভঙ্গি বদ্‌লে গেছে। সেই উগ্র ভাব অনেক নম্র হয়ে এসেছে। এতদিন তাঁরা জাপানি যাত্রীদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বল্‌তেন না; কিন্তু আজ যে কয়জন জাপানি যাত্রী প্রথম শ্রেণিতে ছিলেন, তাঁদের উপর খুব নজর পড়ে গেছে।[198]

---

[197]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৯৭-৯৯।

[198]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৬৭-১৬৮।

আমরা বুঝতে পারি, এশীয় একতাবাদের স্বপ্ন তথা ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত সরোজনলিনীর মননে জাপানের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য তথা ইউরোপের সঙ্গে সমকক্ষতার এই দৃশ্য যেন ভারতের পরাধীনতার হীনম্মন্যতা কিছুট হলেও কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে; উপনিবেশিতের প্রতিনিয়ত অবদমিত মননকে আরাম দেয়। বস্তুত এশীয় একতার এই সূত্র প্রাচ্য দেশ বেড়ানোর বৃত্তান্তে নানা অনুষঙ্গে-প্রসঙ্গে প্রায়শই চোখে পড়ে আমাদের। কখনো ইন্দুমাধব বর্মা রমণীর শোকপ্রকাশের ভঙ্গীতে খুঁজে পান অবিকল ভারতীয় নারীর মুর্তি-

> একদিন লেক্ পার্ক দেখিতে যাবার সময় রাস্তায় দেখিলাম একটী আধবয়সী বর্ম্মা রমণী কাঁদিতেছে। দু'জন লোক তাকে সাবধানে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। সে বড়ই আকুলভাবে কাঁদছিল। কাঁদ্‌চে এ জানতে তো ভাষা জানার দরকার হয় না। তবে কি জন্য ও কাহার জন্য কাঁদ্‌চে জানিবার জন্য আমি খোট্টা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে জেনে বললে, সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে, তাই কাঁদ্‌চে। কান্নার বুলিটি এইরূপ,- "তুমি গেলে আমি রইলাম, তোমাকে আর ঘরে গিয়ে দেখ্‌তে পাব না, সে ঘরে কেমন করে থাক্‌বো?" ঠিক কি আমাদের দেশের মত! তার সঙ্গীরাও কাঁদতে কাঁদতে তাহাকে বুঝাচ্ছে_ ঠিক কি আমাদের দেশের মত! তার সঙ্গীরাও কাঁদতে কাঁদতে তাহাকে বুঝাচ্ছে- ঠিক কি আমাদের দেশের মত! পথে যে দেখ্‌চে, যে শুন্‌চে সেই চোখের জল ফেলে যাচ্চে,- ঠিক কি আমাদের দেশের মত![199]

কখনো আবার ওকাকুরার প্রাচ্য একতা বিষয়ক বই, *Idea of East* এর মুগ্ধ পাঠক, রাশিয়াকে হারিয়ে জাপানের জয়ে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত রথীন্দ্রনাথের বলা জাহাজে জাপানি আর আমেরিকানদের মাঝে তুমুল বচসা তথা প্রায় হাতাহাতির গল্পটির উপস্থাপনার মধ্যে উঠে আসে এশীয় আত্মপরিচয় নির্মাণের উদ্যম-

---

[199]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৩৩।

> সহযাত্রীদের মধ্যে কিছু জাপানি ছিল। একদিন খাবার টেবিলে একজন জাপানি ভুল করে এক আমেরিকানের জায়গায় বসে পড়েছিল। বেঁটে-খাটো নিরীহ জাপানিটির উপর সেই প্রকাণ্ড আমেরিকানটির সে কী তম্বি- এই মারে তো সেই মারে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে শেষ পর্যন্ত একটা ছোরা বের করে শাসাতে লাগল। জাপানিটি যখন বিনা বাক্যব্যয়ে আসন ছেড়ে উঠে চলে গেল- আমাদের ভারি খারাপ লেগেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এল তার স্বদেশবাসীদের একটি দল সঙ্গে ক'রে। বলল, ইয়াঙ্কিরা দলে ভারি ছিল বলে সে তখন কিছু বলেনি। এবার দু-দল সংখ্যায় সমান সমান, এখন যদি ইয়াঙ্কিরা মারামারি করতে চায় তো জাপান প্রস্তুত। ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল, এসিয়ার সম্মান অক্ষুণ্ণ রইল।[200]

কখনো আবার সুনীতিকুমারের মনে হয়, "এ বিদেশ আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ"। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে এই নৈকট্যের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মনেও জাগতে থাকে। পারস্য ভ্রমণকালে যেমন সেদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁর মনে হয়, "কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করে নি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্টই অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডীর, সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষই আমার গোচর হয় নি।"[201] পারস্পরিক অভিন্নতা তথা ঐক্যের ধারণা বা বলা ভালো ঐক্যস্থাপনের বাসনার এই বহুমাত্রিক উপস্থাপনার সূত্র ধরেই, এইবার আমরা চোখ রাখব বৃত্তান্তগুলির কথনবস্তু তথা পর্যবেক্ষণের নানা ভঙ্গিমাতে। বুঝতে চাইব জাতীয়তাবাদী আবহে দাঁড়িয়ে যখন প্রতিবেশী দেশগুলি বিষয়ে মনোভাবের ক্ষেত্রে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বদল ঘটছে, তার অভিঘাত কীভাবে বৃত্তান্তগুলিতে পড়ছে, ভ্রমণকারীদের আত্মদর্শনের পাঠ কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তাঁদের কথনগুলিতে ।

---

[200]রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১১০।

[201]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৩৬-৬৩৭।

গন্তব্যের পথে পথে

(১)

এশিয়া ভ্রমণের যে বৃত্তান্তগুলি নিয়ে আমরা কথা বলব, সময়ের হিসেবে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিনযাত্রী*৷ তিনি যাত্রা শুরু করেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বক্সার আন্দোলন চলাকালীন, ব্রিটিশ সরকারের মিলিটারী বিভাগে চাকরির সুবাদে। এবং দ্বিতীয় বৃত্তান্তটি ইন্দুমাধবের লেখা- ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে চিনের পথে পাড়ি দেওয়ার বিস্তৃত বিবরণ। মূলত যাত্রাপথের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা কেদারনাথের পুরো কথন জুড়েই থাকে, কৌতুকপূর্ণ নানা পর্যবেক্ষণ, স্বজাতি বিষয়ে নানা টীকাটিপ্পনী এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয় 'সভ্যতা' বিষয়ে নানা বক্রোক্তি। চিনের বক্সার বিদ্রোহের পটভূমি ও তার পরিণতি (যে প্রেক্ষিতে তাঁর চিন যাত্রা) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যেমন তিনি বলেন,

> দুনিয়ার যত শ্বেতজাতি ১৯০০ সালে বদ্ধপরিকর হয়ে চিনের বিপক্ষে অভিযান করেন, যেহেতু তারা তাদের রাজ্যে বিদেশির গন্ধ সইতে পারছিল না, ধর্মপ্রচারকদের সদুপদেশ ও সদিচ্ছার কদর্থই করে বসেছিল।
>
> চিনেরা মহা রক্ষণশীল জাত। তারা নিজের সনাতন আচার বিচার সংস্কার নিয়ে থাকতে চায়। অন্যের মোড়োলি সইতে চায় না। তাদের চেয়ে আবার বোঝে কে?- "তোমাদের কে ডেকেচে,- আমাদের তরে তমাদের এত মাথাব্যাথা কেনো?" তারা বোঝে না,- জ্ঞান বিতরণ, আঁধার বিতরণ, আঁধার মোচন,- মহৎদের ধর্ম। রোগী আর কবে আস্ত্রপেচারে রাজি হয়- কিন্তু অবোধের উপকারের জন্য সেটা জোর করেই করতে হয়। সহজে বাধা

না দিতে পেরে, দুষ্টেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শেষে খুনখারাপি করে বসে। তার পরিণাম,- সমগ্র শ্বেতজাতি রোষে রাঙা হয়ে চিন অভিযান করেন, এবং অস্ত্রোপেচারও আরম্ভ হয়।[202]

হাল্কা চালে বলে চলা কথাগুলির মধ্যে, 'সভ্যতা' কায়েমের নামে ইউরোপীয় শক্তিদের নানা ছলছুতোয় দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য স্থাপনের রাজনীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ বুঝতে আমাদের আবশ্যই ভুল হয়না। আর সেই শ্লেষের মধ্যে থেকেই উঁকি মারে, বিদ্রোহী চীনাদের জন্যে চোরা সহানুভূতি। এবং এই সূত্র ধরেই উঠে আসে বিদেশী অবদমনকে আত্মস্থ করে নেওয়া বাঙালি বাবুদের প্রতি ভর্ৎসনা, তাই চাকরি রক্ষার দায়ে চিনে পাড়ি জমানো নিয়ে তাঁর স্বশ্রেণির দিকে থাকে তির্যক টিপ্পনী, "সেই সূত্রে এই শিষ্টদেরও অর্থাৎ আমাদেরও ডাক পড়ে। অভিযানে জ্ঞান দেবার মতো প্রাণ নিয়ে নয়, বরং প্রাণটা যাতে ঘরে ফিরে আসে, তাই কেউ রাম, কেউ আল্লা, কেউ দুর্গা, কেউ মা কালীর কাছে সকাতর পিটিসন পেশ করে পা বাড়াই।"[203] এভাবেই পরাধীন দেশের সাহেবের অনুগত বাঙালি বাবুদের সুবিধাবাদী তথা সাবধানী নানা মনোবৃত্তি, সাহেবের পদতলে নিরাপদে আশ্রয় খোঁজার অহরহ প্রবণতাকে বারেবারে শ্লেষমিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে পাঠককে পেশ করতে থাকেন তিনি। প্রসঙ্গত তাঁর যাত্রার প্রথম বাক্যই শুরু হয় এই দাসত্বের অনুষঙ্গ দিয়ে, "আমরা যত বড় দাসত্ব করি না কেন, হনুমানকে হারাইতে পারিব না।...যাক, হনুমান মরিয়া হইয়া স্বেচ্ছায় ও স্ববলে, সাগরপারে পাড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার ছিল কি না জানি না; অন্ততঃ থাকার প্রমাণাভাব। আমাকে অনিচ্ছায় ও অগত্যা পরের বলে পা বাড়াইতে হইয়াছিল।"[204] ইংরেজ সরকারের কাছে চাকরির দাসত্বে বদ্ধ বাঙালি বিষয়ে বক্রোক্তি আরও তীব্র হয় যখন জাপানিদের প্রসঙ্গ আসে।

[202]কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "চিনের স্মৃতি", (*শতবর্ষ আগের ভ্রমণকথা: চিনযাত্রী,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০) পৃষ্ঠা- ১৮০।

[203]"চিনের স্মৃতি", পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

[204]"চিনযাত্রী", পৃষ্ঠা- ১৭৫।

বস্তুত কেদারনাথ চিনে থাকাকালীন রাশিয়া-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়, সে যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তির সামনে জাপানের অসামান্য পরাক্রমতার নানা দৃশ্য কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা উঠে আসে তাঁর স্মৃতিতে। জাপানি কিশোর ওকুমুরার নিরাপদ জীবনের ঘেরাটোপ ভেঙে যুদ্ধে যাওয়ার আকুলতা বা তার মায়ের ছেলেকে দেশের জন্যে লড়তে পাঠানোর বাসনা অভিভূত করে তাঁকে। নির্বিরোধী, ভীতু বাঙালির কাছে এই ঘটনা ঠিক কতটা অভুতপূর্ব তা তিনি সযত্নে হাজির করেন পাঠকের কাছে–

> (ওকুমুরাকে) বললুম,- বেশ তো দোকান করচ'- ইচ্ছে করে যুদ্ধে যাওয়া কেনো? সকলকেই কি যুদ্ধে যেতে হবে? তোমার মা বৃদ্ধা- তাঁকেও তো দেখা চাই।"
> শুনে সে নিজে কিছু বললে না, আমার কথাগুলি মাকে শোনালে। মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমার আর এক ছেলে আছে, তার বয়স মাত্র ১৫, তাকে ওরা পাঠাবে না- সে দোকান দেখতে পারে। আমার উপযুক্ত ছেলে থাকতে সামান্য কারণে সে এই বিপদের সময় দেশের কাজে লাগবে না? আমি মুখ দেখাবো কি করে? আপনি দয়া করে এমনভাবে কিছু লিখে দিন যাতে ওকুমুরার যাওয়া হয়। সে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে দরখাস্ত দেবে।" ইত্যাদি বলে কেবলই হাতজোড় করতে লাগল।[205]

এবং জাপানিদের এই স্বাধীনসত্তা বা স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গে বাঙালির স্বভাবগত ভীরুতা, চারিত্রিক দৌর্বল্য এবং সর্বোপরি বিদেশী শাসকের তাঁবেদারি করার অভ্যাসটিকে কেদারনাথ সজোরে আঘাত করেন-

> যার মা এই কথা বলে, তার ছেলেকে আর বোঝাব কি? সুরেশ ভায়া বললেন- "বাঁড়ুজ্যে ওরা বাঙালি নয় যে ২৫ টাকার কোরানি হয়ে বেঁচে থেকে বাপের নাম বজায় রাখবার

[205]"চিনের স্মৃতি', পৃষ্ঠা- ৩৫৬।

> কথা নির্লজ্জের মতো মুখে আনবে,- এখানে গয়াও নেই যে পিণ্ডি দেবার পরোয়ানা আছে। ওদের দেশ আছে, দেশের জন্য প্রাণও আছে। পারো উপায় করে দাও।”[206]

নিজেকে সেই ‘২৫ টাকার কোরানি’ হয়ে বেঁচে থাকা শ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ক্রমশই আত্মসমালোচনামূলক এক পাঠ করে তোলেন, “১৮ বছর বয়স থেকে দরখাস্ত লেখার মক্সাই করা হয়েছে। ফল হোক না হোক- মাথা ঘামিয়ে মুসুবিদে করে, লম্বা এক দরখাস্ত লিখে দিলুম।”[207] এবং স্বজাতি-স্বশ্রেণির প্রতি চপেটাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের আপাত অবিশ্বাস্য জয়ে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের স্বরচিত শ্রেষ্ঠত্বের শ্লাঘাটি যে নিদারুণভাবে আহত হয়, সে বিষয়ে সরস মন্তব্য করতেও ছাড়েননা,

> সবার চেয়ে সমস্যা ইংরাজদের,- তাঁরা জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে ally- বন্ধু। আবশ্যক হলে পরস্পরকে সাহায্য করতে উভয়ে বদ্ধ ও বাধ্য। কি হোটেলে, কি অফিসে, কি ক্লাবে ঐ কথা, ঐ প্রসঙ্গ, অবশ্য সন্তর্পণে ফিস্ ফাস্! গোল বেঁধেছে- রুশ য়ুরোপের শ্বেত জাতি হয়ে। জাপানিরা এশিয়ার লোক, রংয়ে নিকৃষ্ট,- তার এ ধৃষ্টতা কেনো? স্পর্ধারও সীমা আছে।– তাই তো...এই ভাব।[208]

কেদারনাথের পাশাপাশি এবার আমরা চোখ রাখতে পারি ইন্দুমাধবের কথনটির দিকে। তিনি তাঁর কথন জুড়ে মূল গন্তব্য চিন সহ পূর্ববর্তী যাবতীয় বন্দর ও সেখানকার মানুষের যাপনের, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাসের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন । বর্মার কর্মব্যস্ত মেয়ে আর অলস পুংসমাজ, সেদেশের বৈবাহিক নিয়মের শিথিলতা, পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং সর্বত্র চীনা শ্রমজীবী নারী-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, ব্যবাসার সূত্রে বন্দরে বন্দরে নানা দেশের মানুষের

---

[206]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৬।

[207]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৭।

[208]প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

সমাগম, অভিবাসী ভারতীয় থেকে শুরু করে চিনের সামাজিক-পারিবারিক নানা আচার-বিশ্বাস, সেদেশের অর্থনৈতিক হালচাল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মচিন্তা-দর্শন সবেরই তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ উঠে আসে সে লেখায়। এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সমস্ত দেশের মধ্যে একধরনের প্রতিবেশিতার সম্বন্ধ অনুভব করেন। বস্তুত আগের ধাপের আলোচনাতেই দেখেছি আমরা, বর্মা রমণীর শোক প্রকাশের সঙ্গে ভারতীয় রমণীর অনুভূতির সমতা বা জাহাজে কোরিয়ান যাত্রীর থেকে শোনা গল্পের সঙ্গে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের গল্পের সাদৃশ্য আবিষ্কার করে তিনি কীভাবে পুলকিত হন। চিনের সামাজিক জীবন বা পারিবারিক নানা প্রথার, আতিথেয়তার ভঙ্গীর সঙ্গে চোখে পড়ার মতো মিল খুঁজে পান ভারতীয় জীবনের। সেখানকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারীদের অবস্থাও তাঁকে বারেবারে মনে পড়ায় ভারতের কথা-

> একদিন বৈকালিক চা-পান করিবার সময় সুইচিনের সহিত চীনদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, চীনদেশে স্ত্রীলোককে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। শুধু চীনদেশে কেন, সকল প্রাচীন দেশেই এই প্রথা ছিল। সেখানে শিশু-কন্যা জন্মিলেই সকলেই দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়। প্রকাশ্যে শিশু-কন্যা জলে ডুবাইয়া মারার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ রদ্ হয় নাই। শিশু বিক্রয় তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধূকে শাশুড়ীর হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারিলে মারিতে পারেন, রাখিলে রাখিতে পারেন। স্বামীর স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার একটী কারণ, শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া ও অপর কারণ, বেশী কথা কওয়া! স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার আর বিধবা হয় না; তবে অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা স্ত্রীর মতো থাকা চলে। সহমরণের প্রথাও প্রচলিত আছে।[209]

যদিও চীনাদের কর্মনিষ্ঠা বা অফুরন্ত এনার্জি, সুস্থ-সবল শরীর, কাজের খোঁজে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পাড়ি দেওয়ার অকুতোভয় স্বভাব ভারতীয়দের পক্ষে শিক্ষণীয় বলে মনে হয়

---

[209]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১১৬।

তাঁর। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত বেমিল ছাড়া সার্বিকভাবে এশিয়াবাসীর স্বভাবগত ঢিলেঢোলা প্রকৃতি সম্পর্কে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও একাত্মতার বোধ জেগে ওঠে তাঁর গোটা ভ্রমণ জুড়েই। এবং দেশ ও জাতিগুলির বিষয়ে পরিচয়প্রদানের পর্বে ইতিহাসের অনতিক্রম্য অনুষঙ্গ হিসেবে উত্থাপিত হয় ঔপনিবেশিক শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রসঙ্গটিও। বর্মার ব্রিটিশ শাসনের আওতাভুক্ত হওয়ার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেমন তিনি লেখেন, "...নিত্য নিত্যই ইংরাজের তরফ হইতে নূতন নূতন দোষারোপ হইতে লাগিল। তখন উত্তর-বর্ম্মায় নূতন আবিষ্কৃত হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক ইংরাজ-বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।"[210] এবং 'হস্তগত' করার এই প্রক্রিয়া যে সাম্রাজ্যবাদ শুধু এশিয়ায় নয় সারা বিশ্বজুড়েই চালায় সেই বিষয়েও তাঁর কোনো দ্বিমত থাকে না । তাই এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকার সম্বন্ধ তথা সাদৃশ্য স্থাপন করতেও দেরি হয়না, তিনি বলেন "র‍্যাণ্ড কিম্বা কিমার্লির স্বর্ণ ও হীরকখনিই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্ত্র বিলুপ্ত হইবার প্রধান কারণ। দেশ কাড়ীয়া লইব ইচ্ছা করিলে, কারণের আর অভাব হয় না"[211] ইন্দুমাধবের এই মন্তব্য প্রায় কেদারনাথের মতেরই অনুরণন হয়ে ওঠে। চিনের উপর ইউরোপীয় শক্তিদের আক্রমণের প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে কেদারনাথও ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, "সময়ের সঙ্গে সভ্য জাতিদের কত দায়িত্ব, কত চিন্তা, কত কাজ বেড়েছে। শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিল্পাদির আদান-প্রদানে অমানুষদের মানুষ না করলে, জগতের উন্নতি হয় না। সে কাজে বলপ্রয়োগেও দোষ নেই। ডাক্তাররা যেমন রোগীকে বাঁচানোর জন্যে অস্ত্রপ্রয়োগ করে থাকেন..."[212]

---

[210]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ২৭।

[211]প্রাগুক্ত।

[212]কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "চিনের নিদ্রাভঙ্গ", (*আমাদের চিনচর্চা, শতবর্ষ আগের ভ্রমণকথা: চিনযাত্রী,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০) পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

আমরা বুঝতে পারি ভ্রমণের সূত্রে উঠে আসা এই ইতিহাসপ্রসঙ্গের মধ্যে মিশে থাকে উপনিবেশিতের বিরোধিতার নানা ইঙ্গিত, গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদে ভুক্তভোগী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানুভূতির পরিসর। অবশ্য উপনিবেশিতের চেতনে ঔপনিবেশিক প্রশিক্ষণের সর্বাত্মক সম্মোহন এত সহজে মোটেই কাটেনা। তাই ইন্দুমাধব ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশের আগ্রাসী মনোভাবের যতই নিন্দা করুন, শাসক হিসেবে তাদের যোগ্যতার বিষয়ে কিন্তু নিঃসংশয় থাকেন। এবং প্রাথমিক আগ্রাসনের বিনিময়ে আদতে যে বৈদেশিক এই শাসনই দেশে দেশে উন্নতির বিবিধ সোপান নির্মাণ করে দিয়েছে সে বিষয়ে বেশ নিশ্চিত থাকেন। তাই ব্রহ্মদেশ দখল বিষয়ে ইংরেজদের সমালোচনা করার পরেই তিনি লেখেন, "...ব্রহ্মদেশের শুভাশুভ ইংরাজের হস্তেই ন্যস্ত। ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে।"[213] একইভাবে, চিনের বিভিন্ন অংশেও যে মিশনারি ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে সে কথাও বিশদে ব্যাখ্যা করে চিনের বক্সার বিদ্রোহ বা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের[214] বিরুদ্ধতার প্রসঙ্গে সেখানকার মানুষের প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকার অদম্য বাসনাকেই দায়ী করে তিনি বলেন

> ...চীন দেশে আজকাল খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সাধারণ চীনবাসীর, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারীদের উপর বড়ই বিদ্বেষ! এই অবকাশের ফলেই "বক্সার" বা মুষ্টি-যুদ্ধের হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল। বিদেশীয়দের উপর যত ক্রোধ থাকুক বা না থাকুক, স্বদেশীয় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারীদের বিনাশই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কত চীনে খৃষ্টান যে এই ব্যাপারে বিদ্রোহীর হস্তে হত হইয়াছে, তাহার আর ইয়াত্তা নাই।
>
> অথচ খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সে দেশে কত যে লোক-হিতকর কার্য করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বতই মনে কৃতজ্ঞতার ভাব আসে। অতি বিপদসঙ্কুল স্থানেও তাঁহারা অধিষ্ঠান

---

[213] ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ২৭।

[214] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে ইংল্যান্ডের কাছে চিনের পরাজয়ের পর তিয়েনসেনের সন্ধির শর্তের ভিত্তিতে মিশনারিরা চিনে ধর্মপ্রচারের অনুমতি পান।

> করিয়াছেন; বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেছেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কূপ খনন করিয়া দুষ্প্রাপ্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্তের অন্ন দেন, রুগ্নের চিকিৎসার ভার লয়েন; চিকিৎসার জন্য সুন্দর হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে জলে ডুবাইয়া শিশু কন্যা হত্যা করা করা না হয় তার জন্য তাঁরা সদাই সচেষ্ট। বাজারে কেহ ছোট ছেলে বা মেয়ে বিক্রয় করিতে আনিলে, ইহারা তাহাদিগকে কিনিয়া লন ও নিজেরা তাহাদের লালনপালন করেন। দরিদ্র প্রতিবেশিনীগণের নানাপ্রকারে তাঁহারা সাহায্য করেন।[215]

এবং নিজের চোখে সেইসব দেখে ইন্দুমাধব আরও একবার নিশ্চিত হোন, ঔপনিবেশিক শাসন আসলে জাতিগত যোগ্যতারই পরিমাপক,

> আমি এক বেলা ঘুরে ঘুরে এসব দেখিলাম- ও সুইচিন সেইখানে নিয়ে গিয়ে নিজে আমাকে সবই দেখালেন। দেখে আমার মনে আনন্দের সীমা রইল না। কত দূরদেশের লোকদের শ্রমসঞ্চিত অর্থদ্বারা এই সকল হিতকর কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। যাহারা অর্থ উপার্জন করিতে জানে, তাঁহারাই অর্থের সদ্ব্যয় বুঝে। প্রতি কার্য্যেই কি সুনিয়ম কি সুশৃঙ্খলা! এই সমস্ত দেখিবার সময় আমার বার বার মনে হ’তে লাগিল, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিবার উপযুক্ত গুণ ইহাদেরই আছে।[216]

আমরা বুঝতে পারি, ইন্দুমাধবের লেখায় অংশবিশেষে বিজিত মননের বিরোধিতার স্ফূরণের আভাস থাকলেও সার্বিকভাবে শাসকের সুশাসন বিষয়ে নিখাদ আস্থায় কোনো খামতি থাকেনা। এবং গুণগতভাবে এশিয়ার দেশগুলির যে ইউরোপের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা নেই, আর নেই বলেই তারা শোষিত সেই বিষয়েও তিনি দ্বিধাহীন থাকেন,

---

[215]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১১১-১১২।

[216]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১১২।

> ভাগ্যচক্রে যে আপনিই উঠে নাবে সে দৃষ্টান্ত হাজারেও একটা দেখা যায় না। যে উঠে সে আপনার চেষ্টাতেই উঠে। যে উন্নত সে সদাই সচেষ্ট।...ইউরোপের সহিত সংস্পর্শে আসিয়ার চোখ মিলিলেও দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। পলে পলে তার রুধির শোষিত হইতেছে। গাছ যেমন শিকড় বিস্তার করিয়া উর্ব্বরা ক্ষেত্র হইতে সৎ পথে সার রস শোষণ করে- রেল জলজান পথ ঘাট ও বিদেশীয় ব্যবসাদি বিস্তারে আসিয়ারও সকল গুপ্ত সম্পদ তেমনি শোষিত হইয়া গেল। যে পথে গিয়াছিলাম তার যেখানেই চোখ মেলা যায় যে জিনিষেই নজর পড়ে, সবই বিদেশীয়। এমন শোষণে আর কতদিন বাঁচিবে। আমার মনে হতো ইউরোপের সহিত জীবন সংগ্রামে আসিয়ার সকল জাতিই পরিশেষে সমূলে ধ্বংস হইবে।[217]

এবং এই ধ্বংসের প্রকৃত কারণ তিনি প্রাচ্যবাসীদের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত থাকতে দেখেন, “দেখিতাম প্রাচ্যজাতিরা সকলেই অল্পে তুষ্ট। তাদের সনাতন প্রকৃতি স্বভাবত পরস্বে লোলুপ নয়। কিন্তু নিজের অবস্থায় এত সন্তুষ্ট থাকাতেই তারা স্থানভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হইতেছে।” কেদারনাথ কিন্তু ইউরোপের দেশগুলির নিজের গরজে অন্য দেশে সভ্যতা বিস্তারের এই ‘সদিচ্ছা’ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখান। তাই যে বক্সার বিদ্রোহ বিষয়ে ইন্দুমাধব লিখেছিলেন, “চীনবাসীর, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারীদের উপর বড়ই বিদ্বেষ! এই অবকাশের ফলেই “বক্সার” বা মুষ্টি-যুদ্ধের হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল।” সেই ঘটনাকেই কেদারনাথের মনে হয় ইউরোপীয়দের অযাচিত অভিভাবকত্ব। মিশনারিদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে ইউরোপের নানা দেশের একযোগে চিনের উপর হামলাকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি বলেই বোধ হয়- “কোথাও কোনো দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া- নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে, অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থে আসিয়া উপস্তিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না করিয়া ফেরেন না।...এই দয়ার কাজের

[217] ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১৩০।

জন্যে পাঁচ হাজার মাইলের পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগস্বীকারটাও ততোধিক।”[218] অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন বিষয়ে ভাবনাগত কিছু ফারাক থাকলেও ইন্দুমাধব এবং কেদারনাথ দুজনের চোখেই চিন প্রতিভাত হয় মূলত এক প্রাচীন রক্ষণশীল রূপ নিয়ে। ইন্দুমাধব লেখেন, “বহুদিনকার পুরান এক রকম রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে আজও চলিতেছে। বাহির হইতে ইহারা কোনও পরিবর্ত্তন লইতে চাহে না।”[219] কেদারনাথেরও মনে হয়, “চিনেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল- নূতন কিছুর নেশা তাদের সহজে ধরতে পারে না। কবে কোনো এক স্থানে এসে সেই যে তারা থেমে গিয়েছিল, সেইখানেই বেশ নিশ্চিন্তে আরামে কাটিয়ে আসছিল।”[220] উনিশ শতকের প্রারম্ভে, কেদারনাথ বা ইন্দুমাধবের দেখা এই চিনের ছবি কিন্তু বেশ দ্রুতই বদলে যেতে থাকে। যে বদলায়মানতার সাক্ষী থাকে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রার অনভিপ্রেত তথা বিতর্কিত অভিজ্ঞতা। প্রাচীনতাকে আঁকড়ে থাকা জাতির একাংশ তখন ক্রমেই আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তিতে রপ্ত করতে উদগ্রীব হচ্ছে। ফলত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ, বস্তুবাদী ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী আধ্যাত্মিক বক্তৃতা তথা উপদেশ নিতান্ত বায়বীয় এবং পশ্চাদগামী বলে মনে হয়েছিল। এবং সে বক্তব্যকে পরাধীন জাতির অপ্রয়োজনীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে ধিক্কারও জানায় তারা। ছাত্রদের প্রতিবাদে পূর্বনির্ধারিত বক্তৃতাগুলিকেও বাতিল করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই ভাষণের বিষয়ে আলাদা করে কিছু না বললেও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অভিজ্ঞতা যে তাঁর পক্ষে বিশেষ সুখকর হয়নি তা তাঁর সহযাত্রীদের লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়। ক্ষিতিমহন সেন যেমন রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে জানান, “...চীনের ছোকরাদের মধ্যে এসে পড়েছি- এরা ঘোরতর যন্ত্রনেশায় মত্ত। সবই এদের মেশিন যন্ত্র- ও

---

[218]“চিনযাত্রী”, পৃষ্ঠা- ২৮৯।

[219]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ১০১।

[220]“চিনের নিদ্রাভিঙ্গ”, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।

তারই পূজা করছে -এবং রাজনীতির ঘুরপাক থেকে উচ্চতর স্বর্গ এদের নেই।..."[221] আর এই রাজনৈতিক আস্থিরতার, আদর্শগত সংঘাতের আরও সজীব ছবি তুলে ধরেন রামনাথ বিশ্বাস, তাঁর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের চিন যাত্রায়। সাইকেলে চেপে চিনের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর এই অভিজ্ঞতা মেজাজের দিক থেকে যে অন্যান্য কথনগুলির থেকে অনেকটাই আলাদা, তা পাঠক হিসেবে আমরা বুঝে যাই একেবারে গোড়াতেই, যখন রামনাথ তাঁর যাত্রার পটভূমি বিষয়ে লেখেন, "১৯৩১ সনের জুলাই মাসের সাত তারিখ। কপর্দ্দকহীন নিঃসহায় আমি একখানি মাত্র সাইকেল ও কয়েকখানা জামাকাপড় নিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। এবারকার যাত্রা আদিযুগের মানবসভ্যতার প্রতীক মহাচীনের দিকে।"[222] তবে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত 'আদিযুগের মানবসভ্যতা'-র পীঠস্থল কিন্তু রামনাথের লেখায় কোনো প্রাচীনতার প্রতিকৃতি হয়ে ধরা দেয় না। বরং সাইকেলকে সঙ্গী করে চিনের পথেঘাটে, গ্রাম-গঞ্জে ঘুরেতে ঘুরতে এই ভ্রমণ হয়ে ওঠে চীন-জাপানের পারস্পরিক বিদ্বেষ, চীন-কোরিয়া সংঘাত, চিনের নানা অঞ্চলে কমিউনিজমের উত্থান, রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রস্তুতির এক বর্ণাঢ্য বাস্তবের রিপোর্টিং।

---

[221]চিঠির অংশটি *আমাদের চিনচর্চা, শতবর্ষ আগের ভ্রমণকথা: চিনযাত্রী (* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১০) বইটিতে শংকরের লেখা "আমাদের চিনচর্চা" অংশ থেকে গৃহীত, পৃষ্ঠা- ১৯।

[222]রামনাথ বিশ্বাস, *মুক্ত মহাচীন* (কলকাতা: ভট্টাচার্য্য সন্‌স্ লিমিটেড, ১৯৪৯), পৃষ্ঠা- ১।

(২)

এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলির আলোচনা করতে গেলে কিছুটা আলাদা করে জাপানের বৃত্তান্তগুলির কথা বলতেই হয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই যে জাপান বিষয়ে বাঙালির আগ্রহ এবং সে দেশ যাওয়ার ঝোঁক বাড়তে থাকে সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। বস্তুত ইউরোপের মতো জাপান ভ্রমণও 'শিক্ষামূলক' ভ্রমণ অভিজ্ঞতার দাবিদার হয়ে উঠতে ঠাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা চোখ রাখতে পারি মন্মথনাথ ঘোষের জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উৎসর্গপত্রটির উপর। যশোরের রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আপনি সজ্জন, স্বদেশ-হিতৈষী এবং বিদ্যোৎসাহী। আপনারই অনুগ্রহে আমি সেই নবাভূদ্যিত সুদূর জাপানের কর্ম্মময় ক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জাপানিদের ন্যায় উন্নতিশীল জাতির মধ্যে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ শিক্ষার্থে অতিবাহিত করিয়া আমার যে টুকু জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই জাপান-প্রবাস আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম।"[223] আমরা খেয়াল করব 'স্বদেশ-হিতৈষী' এবং 'বিদ্যোৎসাহী' শব্দ দুটির দিকে। উল্লিখিত এই দুই বিশেষণই বুঝিয়ে দেয়, বইটিকে তিনি ঠিক কোন প্রেক্ষিতে পেশ করতে চাইছেন। ইউরোপ যাত্রীরা যেভাবে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে স্বদেশের উন্নতির ঔষধি হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে স্বদেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াকে দেশপ্রেম তথা দেশচিন্তারই অভিব্যক্তি মনে করেছিলেন, জাপান ভ্রমণকেও মন্মথনাথ ঠিক একই মাত্রা দিতে চান। প্রায় একই সুর শোনা যায় সরোজনলেনীর বই-এর ভূমিকা অংশেও, "গ্রন্থকর্ত্রীর আন্তরিক

[223]মন্মথনাথ ঘোষ, "উৎসর্গপত্র"।

স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন যে, পুস্তকখানিতে কত আছে, তাহার ইয়াত্তা হয় না। বিদেশের যে সকল আনুষ্ঠান দেশগুলিকে মহিমাময় করিয়াছে, তাহার বিবরণ লিখিবার সময় স্বদেশের কথা মনে করিয়া তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে। তিনি বারবার বলিয়াছেন,- "কেন আমাদের দুর্ভাগা দেশে এগুলির আয়োজন হইতেছে না?"[224] প্রসঙ্গত জাপানকে নতুন শক্তির সূচক হিসেবে উপস্থাপনার প্রবণতা আমরা দেখতে পাই, সমুদ্রপথ থেকেই। ইন্দুমাধব যখন চিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন রাশিয়ার সঙ্গে জাপান যুদ্ধরত- বিশ্বরাজনীতিতে জাপানের আত্মপ্রকাশের এই পর্বটিকে ঘিরে তৎকালীন কৌতূহল জানিয়ে তিনি লেখেন –

> চীন সমুদ্রে গিয়া অবধি আমার সর্ব্বদাই রুষ-জাপান যুদ্ধের কথা মনে হত। সকল সভ্য দেশেরেই রণতরী, পাছে কোন গোলমাল উঠে এই আশঙ্কায়, সদাই যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত আছে। জাহাজের সকল লোকের মুখেই রুষ-জাপান যুদ্ধের কথা। প্রতি বন্দরেই জাহাজের জন্য সংবাদপত্র লওয়া হইত, তাহা হইতে যুদ্ধের অনেক খবর পাইতাম।[225]

এবং শুধু কৌতূহল নয় এশিয়ারই এক দেশের এই অবিশ্বাস্য উত্থানকে ঘিরে তৈরি হওয়া অদম্য উত্তেজনাও টের পাই আমরা ইন্দুমাধবের কথনে- "জাপানের (Rising Sun) "উদীয়মান" সূর্যের লাল ছবিযুক্ত নিশান সদর্পে উড়িতেছে। যেন সবে মাত্র অতল জল হইতে উঠিয়াছে; অনন্ত আকাশে এখনও যে কত উঠিবে তার ইয়ত্তা নাই।"[226] বস্তুত ইন্দুমাধবের যাত্রাকালে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল তখনো অজানা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী কথনগুলিতে জাপানের শক্তিমত্তা বিষয়ে এই বিস্ময় তথা অনুমান, 'বিশ্বাস'-এ পরিণত হতে শুরু করে। মন্মথনাথ

---

[224]জগদানন্দ রায়ের লেখা মূল বই-এর ভূমিকা, *ইন্দুমাধবের চীনভ্রমণ, সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী,* পৃষ্ঠা- ১৪৭।

[225]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৭০-৭১।

[226]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৯৯।

যেমন অস্থির চিন সমুদ্রের পর 'প্রশান্তমূর্তি' জাপানসাগরের প্রবেশ করে বলেন, "চীন-সাগর পার হইয়া জাপানসাগরে পড়িলাম। হঠাৎ সমুদ্রও প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। জাপানের নব্যভুদয়-শক্তির প্রভাব কি সাগর ও গ্রহগণকেও বিচলিত ও বিকম্পিত করিয়াছে?"[227] এই ভাবনাই আরও দৃঢ় স্বরে শোনা যায় সরোজনলিনীর গলায়, জাহাজ বন্দর ছুঁলে, যে কথা আমরা কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি।

জাপান ভ্রমণের কথনগুলি পড়তে পড়তে আমরা খেয়াল করি, তৎকালীন বাঙালি মননে জাপান যেহেতু ক্রমেই পশ্চিমী শক্তির সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হয়ে ধরা দিচ্ছিল তাই ইংল্যান্ড ভ্রমণের কথনে সভ্য ও স্বাধীন জাতির স্বরূপ অনুধাবনে সেদেশের জীবন ও যাপনের বিভিন্ন দিক যেমন সযত্নে ও সবিস্তারে পেশ করা হয়েছিল এক্ষেত্রেও সেই একই প্রবণতা বজায় থাকে। রাস্তাঘাটের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পুলিশি তৎপরতা, সাধারণ মানুষের দেশ-রাজনীতির নানা বিষয়ে সচেতনতা, কর্মস্পৃহা- সকল অভিজ্ঞতাই পাঠকের কাছে বিশদে বর্ণিত হয়। এবং এইগুলি যে 'সভ্য' দেশকে চেনার আন্যতম চাবিকাঠি সেই বিষয়েও ভ্রমণকারীরা নিঃসংশয় থাকেন। জাপানে পা রেখেই যেমন মন্মথনাথ লেখেন,

> ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। রাস্তাটী লোকে লোকারণ্য, কিন্তু রিকশার খড়খড়ি, ফেরিওয়ালার ঘণ্টার ঠনঠনি এবং ধীবরের বাঁশীর প্যাঁ পোঁ, ব্যতীত কাহারও মুখে কোনও উচ্চ বাক্য নাই। বাজারে এবং দোকানে অনেক বেচা কেনা হইতেছিল,: কিন্তু দরদস্তুরী করিতে কোনও গোলমাল নাই। বোধ হইতে লাগিল যেন জাপানীরা উচ্চস্বরে কথা বলিতে জানেন না।
>
> ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখি সেখানে সকল প্রকার লোকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ট্রামে চড়ীতেছেন। মোড়ে একজন পুলিস কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান ছিল, যখন যাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যক হইতেছিল, সে অতি বিনীতভাবে তাহা বলিয়া দিতেছিল। ইহাকে এবং

---

[227]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ২৩।

> অন্য সকলকে অতি ভদ্র ও বিনয়ী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। কারণ ওরূপ একটী নম্রজাতি আমি ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।[228]

জাপানিদের নিঃশব্দে যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার চারিত্রিক গুণটি রবীন্দ্রনাথ ও সরোজনলিনীরও নজর কাড়ে। মন্মথনাথের মতোই বিস্ময় নিয়ে, জাপানিদের এই সম্পূর্ণ 'অ-বাঙালি' স্বভাব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

> একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ বাইসাইকিল-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্‌লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্‌লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।[229]

একইভাবে হোটেলের কনসার্ট হলে বহু নারী এবং শিশু সমাবেশিত ঘরে কোনো কোলাহল ছাড়াই, শান্ত পরিবেশ বজায় রেখে উদ্দিষ্ট কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হন সরোজনলিনী। এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে ভারতের যে কোনো মহিলা জমায়েতে হওয়া গোলমাল বা চেঁচামিচির কথা-

---

[228]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২৫।

[229]"জাপান-যাত্রী", পৃষ্ঠা- ৪২২।

> এখানে দেখ্‌লাম, আমাদের দেশের সঙ্গে এদের একটি বিষয় খুবই মিলে যায়। আমাদের দেশের ভদ্রমহিলারা কোথাও কিছু দেখ্‌তে গেলে যেমন ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে যান- এদেশের মেয়েরাও তাদের ছেলেপিলে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু এক ঘরে এতগুলি ছেলেপিলে থাকা সত্ত্বেও একটু গোলমাল শোনা গেল না। এদের ছেলেপিলেদের বিশেষত্ব যে আমাদের দেশের ছেলেপিলেদের মত তারা কান্নাকাটি বা গোলমাল করে না। এদের মেয়েরাও সব চুপচাপ বসে আছে বা আস্তে আস্তে কথা বল্‌ছে। এরা এত সংযত যে, এত স্ত্রীলোক একত্রে বসে আছে অথচ জোরে হাস্‌তে বা জোরে কথা বল্‌তে কাউকে দেখ্‌লাম না।[230]

আমরা বুঝতে পারি যে, সরোজনলীনি দুই দেশের নারীর আচরণগত এই বৈপরীত্যকে নিছক চারিত্রিক তাফাত না ভেবে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান সঠিক শিক্ষাগুণে দেশ বা জাতির উন্নতির প্রসঙ্গটিকে। তিনি লেখেন–

> যাদের মেয়েরা এ রকম সংযত, তারা যে সংযম শিক্ষা কর্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এরা খুবই কম কথা বলে যতক্ষণ বাজনা হচ্ছিল তারা একাগ্র চিত্তে সেই বাজনা শুন্‌ছিল। আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলেও একত্রিত হলে হাসি ঠাট্টা কথাবার্ত্তায় এত গোলমাল বাধান যে, যে শিক্ষা লাভের জন্য গেছেন বা যা কিছু উপভোগ করবার জন্যে গেছেন তার উপর অনেক সময় দৃষ্টিই থাকে না। আর আমাদের শিশুরা অকারণে বা সামান্য কারণে কান্নার রোল তোলে। এই জন্যে আজ কালকার আধুনিক মাতারা পাশ্চাত্য মাতাদের অনুকরণে কোনও সম্মিলনীতে নিয়ে যান না এবং সেই কারণেই অনেক মাতাকে আমোদপ্রমোদ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমরা যে দিন জাপানি-মাতাদের মত সংযত হয়ে সন্তানদের সংযম শিক্ষা দিতে পার্‌ব, সেই দিন আমাদের দেশও উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে।[231]

রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়, অতিরিক্ত কথার বদলে নিজের নিজের কাজ করে যাওয়ার এই প্রবণতাই জাপানের উন্নতির অন্যতম কারণ, “আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির

---

[230]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৭১-২৭২।

[231]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৭২।

মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।"[232] আমরা বুঝতে পারি, পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে, ভ্রমণজাত ছোটবড় কোনো পর্যবেক্ষণই নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরে আবদ্ধ থাকেনা, বরং এক সমীক্ষাবাদী বিশ্লেষণ হয়ে উঠতে চায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের আধিপত্য থেকে আত্মপ্রতিরোধে উদ্যোগী জাতির কাছে জাপান ধরা দিতে থাকে অভিপ্রেত বিকল্প হিসেবে। ফলত সেখানে দেখা যাবতীয় ঘটনার সঙ্গেই জুড়ে যায় স্বদেশ বিষয়ক তুলনা-আলোচনা-সমালোচনা। এবং জাপানের এই উন্নতির হাল-হদিশ সন্ধানে উদ্দীপ্ত যাত্রীদের চোখে ধরা পড়তে থাকে সে দেশ ও জাতির নানা স্বভাববৈশিষ্ট্য। যেমন জাপানিদের উত্থানের নির্ভুল প্রমাণ হিসেবে, সেদেশের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও জ্ঞানস্পৃহা বা রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন মন্মথনাথ, "...বাসায় প্রত্যাগত হইয়া দেখি, পরিচারিকগণ তরকারীওয়ালার সহিত এক গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতেছে। তাহাদের সকলের হাতেই এক একখানি সংবাদপত্র ছিল। প্রথম দিনই এই সমস্ত দেখিয়া মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন কি?"[233] একই বিস্ময় তথা মুগ্ধতা থাকে হরিপ্রভার কলমেও, "কারখানায় অফিসে হাসপাতালে স্টেশনে দোকানে হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, সমুদ্রে মাছধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজ এরা করে, অথচ কৃষকপত্নী কৃষকমাতা জেলেনি সকলেই লেখা পড়া শেখে, দৈনিক কাগজ পড়ে।"[234] মন্মথনাথ বা হরিপ্রভার এই লেখা আমাদের নিঃসন্দেহে মনে পড়িয়ে দেয় আগের অধ্যায়ে আলোচিত ইউরোপ ভ্রমণের নানা দৃশ্য, যেখানে পাশ্চাত্য সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির নারীপুরুষের নিয়মিত খবরের কাগজ পড়া, দেশের

---

[232]"জাপান-যাত্রী", পৃষ্ঠা- ৪২২।

[233]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২৬।

[234]হরিপ্রভা তাকেদা, "জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা", *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,* পৃষ্ঠা- ৫৮।

রাজনৈতিক হালচাল বিষয়ে ওয়াকিবহাল্ থাকা রীতিমতো বিস্মিত করেছিল ভ্রমণকারীদের। আমরা বুঝতে পারি, জাপান ভ্রমণকালেও যাত্রীদের মনে ‘সভ্য’ দেশ তথা সমাজকে শনাক্তকরণের প্রকরণগুলির বিশেষ বদল হয়না। কিন্তু সভ্যতার একপেশে ইউরোপীয় মডেল অনেকসময়ই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, বিশেষত ভাষাকে কেন্দ্র করে। ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতাকে যোগ্যতা নির্ণয়ের চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে মেনে নেওয়া ভারতীয় চোখে, জাপানের মানুষের কাছে তাদের মাতৃভাষার আদর বা ইংরেজি ভাষা বিষয়ে উদাসীনতা এক সম্পুর্ণ নতুন জগতের স্বাদ দেয়। এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ উপনিবেশিত মননে একধরনের আত্মবিশ্বাসও যোগায়। সরোজনলিনী যেমন মার্‌কুইস্ ওকুমার সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে লেখেন,

> এই বৃদ্ধকে দেখলে সত্যই ভক্তি হয়। যদিও তিনি ইংরাজী বললেন না এবং আমি তাঁর কথা বুঝলাম না তথাপি তাঁর কথাবার্ত্তায় যে একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তা বেশ অনুভব করা গেল। এ দেশে এসে এই প্রথম বুঝলাম যে ইংরাজী ভাষা না বলতে পার্‌লেও লোকে মূর্খ বলে গণ্য হয় না। এরা নিজেদের ভাষার মর্য্যাদা বোঝে- নিজের ভাষাই আসল। তবে ইংরেজরাও যেমন নিজের ভাষার পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করে, এঁরাও তেমনি নিজের ভাষা আয়ত্ত করে ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষা শেখেন। মার্‌কুইস্ ওকুমা এত বড় লোক, কিন্তু ইনি ইংরাজী ভাষা মোটেই জানেন না। কিন্তু জ্ঞানে তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত অনেক লোকের চেয়েই বড়।[235]

আমরা বুঝতে পারি, আজন্ম ইংরেজি ভাষার ‘মহিমা’ বিষয়ক নানা বাণী তথা স্তুতিতে অভ্যস্ত উপনিবেশিতের কাছে, “ইংরাজী ভাষা না বলতে পার্‌লেও লোকে মূর্খ বলে গণ্য হয় না”– এই

[235]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২৪৫।

বোধ পরম স্বস্তির বিষয় হয়ে ওঠে। এবং জগতের জ্ঞানভাণ্ডার যে ইংরেজদের একচেটিয়া পরিসরমাত্র নয়, সেই অভিজ্ঞতাও রীতিমতো তৃপ্তি দেয়। আর এই তৃপ্তি তথা নবঅর্জিত আত্মবিশ্বাস ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালির বাংলা চর্চায় অবহেলার প্রবণতাকে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েনা, বা বলা ভালো মাতৃভাষার কদরই যে উন্নত জাতির বিশেষত্বের অন্যতম লক্ষণ সেই বিষয়ে ভেবে দেখার ইঙ্গিত দেয়। মন্মথনাথ আবার সকল ভাষার সম্মিলনে তৈরি এসপেরান্তো ভাষার উল্লেখ করেন এবং উচ্চশিক্ষার্থে জাপান যেতে ইচ্ছুক ছাত্রদের জাপানি ভাষা শেখারও পরামর্শ দেন। ঔপনিবেশিক পাঠক্রমে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব তথা চরম নৈতিক উৎকর্ষের ধারণা আরোপের যে রেওয়াজ, জাপান বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ভাষাভিত্তিক সেই ক্ষমতার প্রকোষ্ঠটিকে যেন অন্তত প্রশ্ন করার রসদ খুঁজে দেয়।

জাপানের অবিশ্বাস্য উন্নতির নানা কারণের ভিতর যে অন্যতম হল, সে দেশের নম্র, ভদ্র, অথচ দৃঢ়চেতা সুশিক্ষিতা নারীসমাজ এবং তাঁদের সুযোগ্য মাতৃত্ব সে বিষয়ে সকল যাত্রীই সহমত পোষণ করেন। প্রায় প্রত্যেক কথনেই আমরা দেখি জাপানি নারীদের প্রতি অপার শ্রদ্ধা তথা মুগ্ধতা। তাঁদের সুব্যবহার, পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গৃহকর্মে নিপুণতা এবং অবশ্যই সুসন্তান পালনের দক্ষতা- সব কিছুই অগাধ প্রশংসা কুড়োয়। হরিপ্রভার যেমন মনে হয়, “সুশিক্ষিতা সুবিনীতা মধুরস্বভাবা জাপানের মহিলা প্রাচ্যের সংস্কৃতির প্রতীক স্বরূপা। তাদের বাক্যে ব্যবহারে পদক্ষেপে নারীত্ব ও নম্রতা ফুটে ওঠে।”[236] এবং দেশের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে, পরিবারের সঠিক পরিবেশ আর শিক্ষাদীক্ষাই যে একটি জাতির উন্নতিকে সুনিশ্চিত করে সে ব্যাপারেও যাত্রীদের কোনো সংশয় থাকে না। তাই জাপানের নারীরা যে বাংলার মা-মেয়েদের উন্নতির অনুপ্রেরণা হতে পারেন, সেই বিষয়ে নিশ্চিত থাকেন হরিপ্রভা, “গ্রামে কয়েক বৎসর থাকার সুযোগ পেয়ে তথাকার গ্রামের অবস্থা

---

[236]হরিপ্রভা তাকেদা, “জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা”, পৃষ্ঠা- ৫৩।

সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস আমার মাতৃভূমি বাংলার গ্রামের বোনেদের কাছে উপস্থিত করছি। এতদ্বারা আমার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা উর্বরা অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারপূর্ণ দেশের বোনেরা জাপানের পাহাড় পাথরভরা ছোট্ট অতি দরিদ্র দেশের মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে- স্বীয় উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে উদ্যোগী হলে আনন্দিত হব।”[237] জাপানের মেয়েদের জীবনযাত্রা যে পরাধীন দেশের আরও বেশি পদানত নারীদের আত্মোন্নতির নির্দেশিকা হতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না সরোজনলিনীরও। জাপানি গৃহিণীদের গুণমুগ্ধা হয়ে তিনি লেখেন- “ভদ্র জাপানি গৃহিণীরা যে কত ধীর, কত নম্র এবং তাঁহাদের হাত পায়ের গতি যে কত সংযত ও স্বচ্ছন্দ তা’ আজকার চায়ের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম।”[238] এবং সুশিক্ষাই যে আসলে মেয়েদের ভবিষ্যতে এরূপ সুগৃহিণী বানিয়ে পারিবারিক সুগঠনটিকে কায়েম রাখতে পারে, তিনি সে কথাটি উল্লখে করতেও ভোলেননা,

> Domestic Science-এর (গৃহস্থালী শিক্ষার) ক্লাসটী বড় সুন্দর। এ ক্লাসে কি প্রণালীতে রান্না কর্‌তে হয়, তারপর কেমন করে পরিবেশন কর্‌তে হয়, এবং সুগৃহিণী হবার আদব কায়দা কি, তা সকলি শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি ঘরের মধ্যে উনুন আছে, জলের কল আছে, রান্না শিক্ষার জন্য যা যা দরকার সবই আছে। তারপর খাবার ঘরের পরিবেশন ইত্যাদির আদব কায়দা শিখবার জন্য রীতিমত সাজসজ্জাও আছে। সমস্তই হাতে কলমে দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু বই পড়ীয়ে নয়। আমাদের দেশের বালিকা-স্কুলে এ জিনিসটিরই অভাব; কিন্তু এটিই খুব বেশি রকমে তুচ্ছ বলে মনে করা হয়। আমরা যদি সুগৃহীণী হতে চাই তা হলে আমাদের স্কুলে স্কুলে জাপানের মতো এ রকম ক্লাস করা দরকার।[239]

---

[237]প্রাগুক্ত।

[238]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৮২।

[239]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২০১-২০২।

এবং সেইসঙ্গে এহেন সুশিক্ষার জন্যে যে ভারতে শিক্ষাখাতে যথাযথ ব্যয় করা প্রয়োজন, সেটিও জানিয়ে দেন

> ...এদেশে ভাল শিক্ষয়িত্রীর অভাব নাই। তা ছাড়া শিক্ষয়িত্রীরা যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা। এদের শিক্ষয়িত্রীরা কত বেতন পায় সে কথা জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম যে পঞ্চাশ ইয়েনের কম বেতনে এখানে শিক্ষক নাই। এই জন্য এত উৎকৃষ্ট শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়। এরা বালিকাদের শিক্ষার মূল্য অনুভব করেছে বলেই এর জন্য পয়সা খরচ্ কর্‌তে দ্বিধা করে না।[240]

অবশ্য এমন ভাবলে ভুল হবে যে সমাজ বা নারীজীবনের ছবি কেবল বামা-লেখনীতেই ধরা দেয়। বিদেশী জাতিকে চেনা ও বোঝার জরুরি সূচক হিসেবে এই পর্যবেক্ষণ উঠে আসে পুরুষ কথনেও। সরোজনলিনী বা হরিপ্রভার মতোই জাপানি নারীর স্থির-নম্র অথচ দৃঢ় চরিত্রের সবিশেষ প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিষয়ে মন্মথনাথও জানান নিজের মুগ্ধতার কথা,

> আমি কোবে যাইয়া জাপানীদের প্রকৃত চরিত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম পুরুষদিগের ন্যায় জাপানী স্ত্রীলোকেরাও শ্রমশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা। ছোট ছোট সন্তানগুলিকে ইঁহারা কাপড় দ্বারা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাহাকেও একদণ্ডও বৃথা কাটাইতে দেখি নাই। ইঁহাদের কাহারও মুখে শোক কিংবা দুঃখের চিহ্ন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহারা সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্তা এবং হাস্যময়ী।[241]

এবং ভারতীয় নারীদের মতো জবুথবু হয়ে না বেঁচে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের নারীরাও সমান তালে কাজ করতে এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম বলেই যে জাপান দ্রুত হারে উন্নতি করতে পেরেছে সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত থাকেন,

---

[240]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২০২।

[241]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩৬।

> জাপানে হাটবাজারের ভার স্ত্রীলোকেরই উপর থাকে। এইরূপে কেহই কাহারও উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন এবং সেইরূপভাবে থাকিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন।
> ফলকথা, যে কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, জাপানীরা তাহা তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত করিয়া, পুরুষোচিত কার্য্যগুলি নিজেরা করিতে থাকেন। এইরূপে স্ত্রীপুরুষ একত্রে কার্য্য করায় জাপানের উন্নতি এত শীঘ্র হইতেছে। আমাদের ন্যায় এক অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইলে আজ জাপানী জাতির কি অবস্থা হইত কে বলিতে পারে?[242]

তবে মন্মথনাথ ভারতীয় নারীকে 'অকর্ম্মণ্য' আখ্যা দিয়ে থেমে গেলেও সরোজনলিনী বা হরিপ্রভার কথনে কিন্তু তাঁদের প্রতি গভীর মমত্ব ফুটে ওঠে এবং সেই অকর্মণ্যতার সামাজিক তথা পরিবেশগত কারণটি তাঁরা সযত্নে বিশ্লেষণ করে দেখাতে থাকেন। হরিপ্রভা যেমন জাপানের মেয়েদের স্বাধীন আচরণ বা পুরুষের উপর নির্ভরতাহীনতা যে আদতে তাদের শৈশব থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণের পরিণাম সেই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে লেখেন,

> গৃহের ভাইবোনের মত শৈশবকাল হতে একত্রে অধ্যয়ন খেলাধূলা করে, স্বল্প পরিচ্ছেদে একত্রে নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শেখে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচের ভাব এরা মনে আনার সুযোগ পায় না- সহজ ও সরল ভাবে শৈশব কাল হতে ছেলেমেয়েরা মিশতে অভ্যস্ত হয়। ছেলেদের সঙ্গে এ ভাবে মেলামেশা খেলাধূলা করায় মেয়েরা ছেলেদের মতই সবল ও পরিশ্রমী হয়। পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তারা অনেক পরিশ্রমের কাজ করতে সক্ষম হয়। মেয়েরা সকল অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং পুরুষ মেয়েদের ওপর কোন প্রকার পাশবিক অত্যাচারের সাহস পায় না। প্রয়োজনবোধে শান্ত নম্রপ্রকৃতির মেয়েকেও দৃপ্তা সিংহীর মত বিক্রমশালিনী হতে দেখা যায়- ফলে মেয়েরা উদ্দীপ্ত তেজে স্বাধীন জীবিকার্জন করে চল্‌তে সক্ষম হয়।[243]

---

[242]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৫৩।

[243]"জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা", পৃষ্ঠা- ৫৮।

দেশীয় নারীশিক্ষা আন্দোলনে ব্রতী, পর্দা প্রথা অবসানের অন্যতম উদ্যোগী, দেশের নানা অঞ্চলে নারীসমিতি গঠনের কাণ্ডারী সরোজনলিনীও নারী শিক্ষার প্রতিটি প্রকরণকে নিবিড়ভাবে অনুধাবন করেন - শরীর চর্চার সুযোগ, স্কুল থেকেই প্রাপ্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা, গৃহকর্মের প্রশিক্ষণ, শেখার আগ্রহ ও ধৈর্য, শান্ত স্বভাব ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর পর্যবেক্ষণ আওতার বাইরে থাকেনা। তাঁর ভ্রমণ-ডায়েরির পাতার পর পাতা জুড়ে থাকে জাপানি মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের অবাধ সুযোগের কথা। এবং তারই সমান্তরালে অনিবার্যভাবে উঠে আসে ভারতীয় নারীদের শিক্ষার বেহাল দশা। তাঁর মনে হয়, যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবেই জাপানের মেয়েদের তুলনায় ভারতীয় মেয়েদের মনোনিবেশের ক্ষমতা বা শেখার আগ্রহ কম। মেয়েদের একটি হাইস্কুলে গিয়ে, তাঁর স্বামীর ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লেখেন,

> মেয়েরা সমস্ত একাগ্র চিত্তে ওঁর বক্তৃতা ও আমার গান শুন্‌লে এবং শেষে খুব হাততালি দিলে। জাতীয় স্বভাবের গুণেই হোক্ বা শিক্ষার গুণেই হোক জাপানি মেয়েরা সমস্ত সময়টা চুপচাপ করে বক্তৃতা ও গান শুন্‌লে, হাসি ঠাট্টা বা অন্য গোলযোগের একটুও আওয়াজ পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশে এত ছেলে মেয়ে এক ঘরে থাক্‌লে কি রকম গোলমাল ও গল্প হতো, তা বোধ হয় যিনি আমাদের কোন বড় স্কুলে গেছেন তা বেশ বুঝ্‌তে পারেন। একাগ্র চিত্তে কোন বিষয় শোন্‌বার ও শিখ্‌বার ইচ্ছা আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুব কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঠাট্টা বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টাই ওদের স্বভাবগত।[244]

জাপানের স্কুল দেখতে দেখতে স্বদেশের শিক্ষাবিষয়ক নানা অব্যবস্থা, পড়াশোনা বিশেষত মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে অভিভাবকদের চরম অনীহা, সংসারের গণ্ডীতে তাঁদের

[244]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার রেওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমেই তাঁর মনে হতাশা জেগে উঠতে থাকে। এবং তিনি নিশ্চিত থাকেন, জাপানের শিক্ষার মডেল অনুসরণ করে কেবল পুরুষদের চাকরির সঙ্গে পড়াশোনাকে সমার্থক না ভেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করতে পারলে তবেই দেশের বর্তমান বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে,

> আমাদের দেশের মেয়েরা মায়ের সাহায্য কর্‌বার অছিলায় স্কুলে আস্‌তে পারে না। এতে আমাদের দেশে মেয়েদের অনেক সময় অশিক্ষিতা থাক্‌তে হয়। এ দেশে কিন্তু সে স্বার্থপরতা নাই। এদের মায়েরা গৃহের কাজ কর্ম্মে মেয়েদের সাহায্য পাওয়াটায় অভাব অনুভব করেন নিশ্চয়; তবে তাঁরা কন্যাদের পরকালের কথা ভেবে সেটা সহ্য করে যান্‌। শিক্ষা জিনিষটার মূল্য জাপানিরা বেশ উপলব্ধি করেছে। আমরা যদি আজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অভাব উপলব্ধি কর্‌তাম তা হলে এ দেশের এই হীনতা, এই দরিদ্রতা থাক্‌ত না। পঞ্চাশ বৎসর আগে যাকে লোকে অসভ্য বলেই জান্‌তো, সেই জাপান শিক্ষার জোরে আজ এত উন্নত; আর আমরা অতীতের সব কীর্ত্তি সব কাহিনী ভুলে গিয়ে শিক্ষার অভাবে এত পশাৎপদ ও পরাধীন। এক শিক্ষার অভাবে আমাদের সব অতীত গৌরব লোপ পেয়েছে। জাপানকে দেখ্‌লে মনে হয় শিক্ষা পেলে আমরাও একদিন আমাদের অতীত গৌরব ফিরে পাবার আশা কর্‌তে পার্‌বো। জাপান শিক্ষার অভাবে পঞ্চাশ বৎসর আগে আমাদের মতই হীন ও অজ্ঞান ছিল। আমাদের দেশের পিতামাতারা জেগে উঠুন-পুত্র কন্যাদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তা হলে দেশের অভাব ঘুচ্‌বে। শিক্ষার জন্য এরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর্‌ছে। আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাসে চারি আনা মাত্র বাপ মায়েদের কাছ হতে কষ্টে পাওয়া যায়; ঐ চার আনা দেবার ভয়ে কন্যা চিরদিন অজ্ঞান ও অশিক্ষিত থাকে। অনেক পিতামাতা মাসে এই সামান্য খরচ থেকে অব্যহতি পাবার জন্য বলেন,- "মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে, সে কি চাক্‌রি করবে?" আমাদের দেশে শিক্ষা শুধু চাক্‌রি পাবার আশায় দেওয়া হয়, জ্ঞান লাভের আশায় নয়! সেই খানেই হলো আমাদের গলদ্‌। যতদিন শিক্ষার মর্য্যাদা আমরা না বুঝ্‌ব ততদিন আমাদের এই হীন পরাধীন অবস্থায় থাক্‌তে হবে![245]

---

[245]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২০৬।

এবং শুধু নারী শিক্ষার বিষয়ে পারিবারিক বিধিনিষেধ নয়, দেশের অপ্রতুল শিক্ষা পরিকাঠামো, স্কুল বাড়ির বেহাল দশা সম্পর্কে পরাধীন জাতির নিরুপায় হতাশা জেগে ওঠে, "স্কুলের বাড়ি ঘর জাপানিরা যে রকম করেছে আমাদের দেশের স্কুলগুলি তার তুলনায় গোয়াল-ঘর মাত্র। এই সব স্কুল দেখে মনে হচ্ছে দেশে ফিরি গিয়ে কোন রকমে এই রকম সুন্দর বড় বড় স্কুল করে, দেশের ছেলে মেয়েদের এই রকম শিক্ষা দিয়ে, দেশকে এদের মত স্বাধীন করি। কিন্তু হায় এ সব দুরাশা মাত্র!"[246]

শুধু মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার স্বাধীনতাই নয়, ছেলে মেয়ে একসঙ্গে স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ আচরণ, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ হরিপ্রভা এবং সরোজনলিনী দুই নারীকেই সমান মুগ্ধ করে। হরিপ্রভা লেখেন, "জাপানের মাধুর্যময়ী গ্রাম্য বালিকাও সভাসমিতি ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করে, সাইকেল চড়ে বহুদূর পথ গমনাগমন করে। পুরুষের সঙ্গে সমভাবে চলে- ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে এবং চালক কণ্ডাক্টারের কাজ করে। কারখানায় অফিসে হাসপাতালে স্টেশনে দোকানে হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, সমুদ্রে মাছধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজ এরা করে"।[247] মেয়েদের ড্রিল-জিমন্যাস্টিক ক্লাস বা ছোট থেকেই শরীরচর্চা বা শারীরিক কসরতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা সযত্নে তুলে ধরেন সরোজনলিনী। হরিপ্রভা বা সরোজনলিনীর এই অভিজ্ঞতা আমাদের অবধারিতভাবে মনে পড়িয়ে দেয় আগের অধ্যায়ে কৃষ্ণভাবিনী বা দুর্গাবতীর ইংরেজ মহিলাদের স্বাধীনতা বিষয়ক পর্যবেক্ষণকে। আমরা অনুভব করি পর্দানশীন অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাদের সাপেক্ষে মেয়েদের শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা তথা সুযোগ, সহজ সামাজিক গতিবিধির এই ছবি ঠিক কতটা অন্যরকম, আর সেই জন্যেই ঠিক কতটা কাঙ্ক্ষিত। হরিপ্রভা যেমন লেখেন, "ছেলেমেয়েদের শৈশবেই ছোট সাইকেল কিনে

---

[246]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ৫৮।

[247] *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা,* পৃষ্ঠা- ৫৮।

দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়ে সকলেই সাইকেল চালাতে শেখে। মেয়েরা দূর পথ সাইকেলে চলাফেরা করে। মেয়েদের কোন প্রকার অবরোধ প্রথা নাই।”[248] এবং মেয়েদের সঠিক শিক্ষাই যে ভবিষ্যতে তাঁদের সুযোগ্য 'মা' করে তোলে, সঠিক মাতৃত্ব-ই যে দেশের জন্যে বীর সন্তান প্রস্তুত করতে পারে– জাতীয়তাবাদী পর্বের এই ভাবনার অনুরণনও উঠে আসে বৃত্তান্তগুলিতে। তাই শিক্ষার প্রসঙ্গের সঙ্গে ওতপ্রোত থাকে মাতৃত্বের প্রসঙ্গটিও। সকলেই নিশ্চিত থাকেন, জাপানের উন্নতি, তাদের স্বদেশ প্রেম সকল কিছুই আসলে জাপানের মেয়েদের/মায়েদের সুশিক্ষার পরিণাম তথা পুরস্কার। হরিপ্রভা যেমন বলেন,

> জাপানবাসীর দেশপ্রিয়তা সুবিখ্যাত- দেশের জন্যই তাদের গৌরব ও জীবন মনে করে। সন্তানদের সেইভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। পুত্র, দেশের জন্য জীবন দান করতে শিক্ষা পায়। আর কন্যা উপযুক্ত পুত্রের মাতৃত্ব পদপ্রাপ্ত হবে এই তাদের লক্ষ্য এবং সে ভাবে গঠিত হয়। দেশের জন্য জীবন দানে যাত্রাকালে- মা বোন স্ত্রী কখনও বিচলিত হন না বা অশ্রুমোচন করেন না। বৃদ্ধ মাতা বলেন, দেশের সন্তান দেশের কাজে চলেছেন- সন্তান প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত ছিল মাত্র তাঁর ওপর। স্ত্রী বলেন দেশের কাজে যাও- স্বামীর সন্তান প্রতিপালন করে স্বামীর নাম রাখার ভার তার ওপর।[249]

জাপানের মায়েদের দৃঢ় স্বভাব, শোকের সময়েও সংযত থাকতে পারার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত মন্মথনাথ লেখেন, “সাবাস মাতা! তুমিই বীররমণী! তোমা হইতে খুব শিক্ষা পাইলাম। শোক! এ রাজ্যে তোমার স্থান নাই!”[250]

নারী বিষয়ে আলোচনা বা অভিজ্ঞতা অবশ্য শুধু অনাবিল ইতিবাচকতায় শেষ হয়না, স্বাধীনতার এই আপাত উজ্জ্বল ছবির মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক চোখরাঙানি নজর এড়ায়না। হরিপ্রভা যেমন,

---

[248]হরিপ্রভা তাকেদা, “জাপানের নারী”, পৃষ্ঠা- ৬২।

[249]প্রাগুক্ত।

[250]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৩৭।

জাপানি মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে কঠোর অনুশাসনে ভরা জীবন নিয়ে লেখেন, “শ্বশুরালয়ে বধূকে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনোমত হয়ে চলতে হয়। তার অন্যথায় শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ভোগ এদেশেও আছে। পিতামাতার মনঃপূত না হলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা এখানে প্রচলিত আছে, বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চলে যায় এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুনর্বিবাহ করতে পারে।”[251] আমরা বুঝতে পারি, সুশিক্ষিতা জাপানি মেয়েদেরও বিবাহ পরবর্তী জীবনটির সঙ্গে অশিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েদের বিশেষ ফারাক নেই,

> এখানে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হয়ে চল্‌তে হয়। দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র স্বামীরও সকল অত্যাচার স্ত্রী নীরবে সহ্য করে এবং স্বামীর শাসন মেনে চলে। এদেশের স্বামী স্ত্রীকে দাসীবৎ জ্ঞান করে অথচ স্ত্রী স্বামীকে গুরুর ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। সাধ্বী স্ত্রী অসৎ প্রকৃতি স্বামীর পরিবর্তন প্রতীক্ষায় স্বামীর মনস্তুষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। স্বামীর প্রতি সুমধুর ব্যবহার, স্বামী সেবায় মেয়েদের একনিষ্ঠ চেষ্টা দেখা যায়। গৃহের যাবতীয় কার্য-সন্তানপালন, বাজার, দোকান, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি সকল কাজ মেয়েরাই করে।[252]

প্রসঙ্গত বর্মার নারীদের বিষয়েও একইরকম অভিজ্ঞতা হয় সরলা দেবীর। সে দেশের তথাকথিত স্বাধীনচেতা নারীদের উপর পিতৃতন্ত্রের সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণরেখাটি বিষয়ে জানতে দেরি হয়না তাঁর-

> অনেকের ধারণা বর্ম্মার স্ত্রীরা পুরুষপরতন্ত্র নয়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আমার বন্ধুরা বললেন সেটা ভ্রান্ত ধারণা। তাদের পর্দ্দা নেই বটে, তারা ইচ্ছা করলে নিজের জীবিকা

[251]“জাপানের নারী”, পৃষ্ঠা- ৬০।

[252]প্রাগুক্ত।

> নিজে অর্জ্জন করতে পারে বটে, কিন্তু ভদ্র-ঘরের বর্ম্মীজ পত্নী কখন পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেশামেশি, কথা-কওয়াকওয়ি করে না। এ বিষয় ভারতীয় আদর্শ ও বর্ম্মী আদর্শ একই।[253]

বুঝতে অসুবিধা হয়না, পুরষতান্ত্রিক বিধি থেকে ভারতের পর্দানশীন অথবা জাপান বা বর্মার স্বাধীনচেতা নারী কেউই বিশেষ নিস্তার পায়না। অবশ্য সার্বিকভাবে জাপানের নারীর অবস্থান বা তাদের শিক্ষাদীক্ষার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং সর্বোপরি তাঁদের আচারআচরণের শালীনতার মতো বেশ কিছু জিনিস যে ভারতীয় নারীর পক্ষে অনুকরণযোগ্য সে বিষয়ে প্রায় সকল যাত্রীই দ্বিধাহীন থাকেন।

জাপানের কাছে শিক্ষণীয় আরও যে দিকটি যাত্রীদের চোখে পড়ে, তা হলো সততা। জাহাজের জন্যে প্যাসেজ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছাতা হারিয়ে ফেলার পর, সেই ছাতা যখন ফিরিয়ে দিয়ে যান জনৈক রিক্সাচালক যরপরনাই অভিভূত হন সরোজনলিনী। এবং বলাবাহুল্য এই বিষয়ে তাঁর মনে শুধু কৃতজ্ঞতা বা বিস্ময় নয়, স্বদেশ বিষয়ে হতাশাও জেগে ওঠে। কারিগরি বিদ্যা শেখার সূত্রে জাপানের একাধিক শহরে একাধিক পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটিয়ে জাপানিদের সকল বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা বা সততা বিষয়ে নিঃসংশয় থাকেন মন্মথনাথও। বস্তুত জাতি হিসেবে জাপান সম্পর্কে বিবিধ মুগ্ধতার নানা পাঠ ছড়িয়ে থাকে মন্মথনাথ থেকে সরোজনলিনী প্রায় সকলেরই কথনে। জাপানিদের পরিশ্রমী মনোভাব, নারীপুরুষ উভয়েরই সর্বক্ষণ কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি কেরানীবৃত্তির বদলে বিভিন্ন কারখানাভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা - এসকল অভিজ্ঞতাই পাঠকের কাছে সযত্নে পেশ করেন মন্মথনাথ। যেমন ওসাকাতে বসবাসের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন,

---

[253]সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৫১

> প্রকৃত প্রস্তাবে ‘ওসাকা’র প্রতি গৃহই এক একটী কারখানা বিশেষ।...দরিদ্র লোকের বাটীতে গেলে দেখিবেন, গার্হস্থ্য কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তাহাদের স্ত্রী কন্যাগণের কেহ সুতা পাকাইতেছে, কেহ দেশলায়ে কাটী পুরিতেছে, কেহ হয়ত গেঞ্জি ও মোজা সেলাই করিতেছে। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই বড় বড় কারখানা হইতে ইহারা লইয়া থাকে। ভদ্র লোকের বাটীতে যাইয়া দেখুন, তথাকার স্ত্রী কন্যাগণের কেশ রেশমের উপর কারুকার্য্য, কেহ কৃত্রিম ফুল, আবার কেহ বা নানাপ্রকার বস্ত্রাদি সেলাই কার্য্যে সর্ব্বদাই রত। ইঁহাদের অনেকেই নিজকৃত শিল্প দ্বারা বেশ দুপয়সা উপায় করিয়া থাকেন। যাঁহারা উপায় করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা সংসারের সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিয়া খরচের ভার অনেক কমাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নশ্রেণিস্থ (অবশ্য জাতির হিসাবে নহে, দারিদ্র্যের হিসাবে) স্ত্রীলোকেরা ফ্যাক্টরীতে কর্য্য করে। জাপানে হাট বাজারের ভার স্ত্রীলোকেরই উপর থাকে। এইরূপে কেহই কাহারও উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন এবং সেইরূপ ভাবে থাকিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন।[254]

বস্তুত ব্যবসা এবং কারিগরি উৎপাদনের স্বনির্ভরতাই যে জাতীয় উন্নতি তথা স্বাবলম্বনের প্রধানতম শর্ত – এই বিশ্বাস তাঁর লেখায় বারংবার আলোচিত হয়। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে তাঁর জাপান যাত্রার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল, জাপানে গিয়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে কারিগরি শিক্ষা লাভ, আধুনিক নানা যন্ত্রপাতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন। তাই স্বভাবতই তাঁর কথনের সিংহভাগ জুড়ে থাকে জাপানের বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কর্মপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। শুধু তাই নয়, কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে জাপান যাওয়ার তৎকালীন ঝোঁক তথা প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে, তিনি ভবিষ্যৎ যাত্রীদের জন্যে রীতিমতো গাইডলাইন তৈরি করে দেন, “কিরূপ ছাত্র জাপানে শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থে যাইবার উপযুক্ত, তথায় মাসে কত খরচা লাগে এবং যে যে শিক্ষার্থী তথায় যাইবেন, তাঁহারা কে কি জিনিস্ এখান হইতে লইয়া গেলে সুবিধা হয়,

---

[254]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৫৩।

অনেকেই আমাকে এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণির পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের জন্য, আমি নিম্নে জাপান সংক্রান্ত ঐ সকল সংবাদ লিখিতেছি।”[255] বস্তুত তাঁর কথনের শেষ কিছু পাতা জুড়ে থাকে জাপানে গিয়ে স্বল্প খরচে ভারতীয় ছাত্রদের থাকার বিষয়ে বিশদ পরামর্শ যা আনায়াসে মনে পড়িয়ে দিতে পারে ইউরোপ যাত্রার প্রাথমিক পর্বের নানা কথনকে। আমরা বুঝতে পারি জাপান কীভাবে ক্রমশ আকর্ষণ আর উৎসাহের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠে জ্ঞানাহোরণের পীঠস্থান হিসবে ইউরোপকে পাল্লা দিতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ যেমন, বাংলার তরুণ শিল্পীদের জাপানে গিয়ে জাপানের শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষালাভের উপদেশ দেন, “বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে–তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।” অবশ্য জাপান বিষয়ে এই উৎসাহ যে ঔপনিবেশিক দীক্ষার সর্বাত্মক প্রভাবকে কাটিয়ে দেয় তা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে, বরং জাপানে গিয়েও ভারতীয়দের ইউরোপীয় নানা আচরণের ‘অনাবশ্যক’ অনুকরণ বিসদৃশ ঠেকে রবীন্দ্রনাথ বা রাসবিহারী বসুর মতো যাত্রীদের চোখে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, ভারতীয়দের আদ্যন্ত ইউরোপমুখী চিন্তাধারা জাপানে গিয়েও সেদেশের নিজস্ব গুণগুলিকে পরখ করতে ব্যর্থ হয়, ইউরোপ বিষয়ে এই সম্মোহনকে ভর্ৎসনাকে করে তিনি লেখেন,

---

[255]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৮।

> আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি- সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্য আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই যে আমাদের শেখবার, এ কথা মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার, এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে, এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেইজন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই, তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক নানা কুশ্রী জিনিসও নকল করেছে, কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিসই চোখে দেখতে পায় না। তারা এখান থেকে যে-সব বিদ্যা শেখে সেও য়ুরোপের বিদ্যা, এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্যরকম সুবিধা আছে তারা কোনমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে।[256]

পারস্য সফরকালেও তিনি ইউরোপের থেকে আবশ্যক গুণগুলি রপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বতাকে নষ্ট না করা যে ভারতীয় তথা প্রাচ্যবাসীদের জন্যে একান্ত দরকারি সেই কথাটির উপরে বিশেষ জোর দেন, -“এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা হলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।”[257] পারস্য বা জাপানের মতো আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে চাওয়া দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযগিতায় মত্ত, অহরহ যুদ্ধে ব্যস্ত ইউরোপের আগ্রাসী মনোভাব ও তার নেতিবাচক পরিণতি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, “আমি এই বলতে চাই, এশিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এশিয়া তাকে নতুন করে আপন ভাষা দিক। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-

[256]“জাপান-যাত্রী”, পৃষ্ঠা- ৪৩০।

[257]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৪২।

করা রাস্তা যদি গর্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তা হলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়।”[258] ভারতীয়দের সাহেবী অনুকরণের বহরকে, ইংরেজভক্তিকে প্রতিপদেই কটাক্ষ করেন রাসবিহারী বসুও। বস্তুত জাপানে পলায়ন করে সেখানকার ‘EuropeanisedIndians’-দের হাভভাব দেখে প্রবল বিরক্ত হন তিনি-

> কিন্তু চরিত্রহীন এবং Europeanised ভারতবাসীদের জন্য বুঝি বা ভারত এ সম্মান হারায়। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে জাপানে যে সমস্ত ভারতবাসী আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই চরিত্রহীন এবং অশিক্ষিত। এদের অনেকেই মদ্যপ এবং ব্যাভিচারী। এদের জন্যে সমস্ত ভারতের বদনাম হইতেছে। আর একপ্রকার লোক যারা জাপানকে ভারতের সম্বন্ধে কু-ধারণা দিচ্ছে, EuropeanisedIndians। তারা দুটো ইংরেজি লিখিতে এবং বলিতে পারে বলিয়া জাপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং জাপানীদিগের সঙ্গে ইংরেজ এবং আমেরিকানরা যেরকম ব্যবহার করে সেইরকম ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে।[259]

অবশ্য শুধু ভারতীয়দের ইউরোপীয় প্রথা নকল নয়, জাপানিদের অনেকের মধ্যেও এহেন আচরণ প্রত্যক্ষ করেন যাত্রীরা। প্রসঙ্গত আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, ইংরেজদের ফ্যাশনসর্বস্বতা কীভাবে সমালোচিত হয়েছিল। এবং তার থেকেও বেশি কীভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল ইংরেজদের হাভভাব, পোশাকপরিচ্ছদের নকল করা সাহেব সাজা বাঙালিদের। এশিয়া ভ্রমণকালেও ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির ঠিক কোন্ অংশগুলি অনুসরণযোগ্য আর কোনটা নয় সেই দ্বন্দ্ব সেই যোগ-বিয়োগ নিরন্তর চলতেই থাকে। আধুনিক জ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চায় ইউরোপকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দ্বিধা না থাকলেও, পোশাক-আশাকের বাহ্যিক অনুকরণকে ভালো চোখে দেখেননা যাত্রীরা। তাই জাপানি তরুণ-তরুণীদের ইউরোপীয় বা আমেরিকান ফ্যাশনের প্রতি অনুরাগ হতাশ করে জাপানিদের নানাবিধ গুণে মুগ্ধ

---

[258]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩৩।

[259]রাসবিহারী বসু, পৃষ্ঠা- ৯৯।

হরিপ্রভাকেও, তাঁর মনে হয় এই ‘অনুকরণ’-এর ফলে জাপানের বিশেষত সেখানকার তথাকথিত আধুনিক নারীদের মধ্যে “নম্রতা ব্যঞ্জক চালচলন পদক্ষেপ ও ভাব বদলিয়ে যাচ্ছে”। “জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা” প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন,

> স্বীয় উন্নতির চেষ্টায় জাপানবাসী সমানে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আস্‌ছে- অন্যান্য অনুকরণের সঙ্গে তাদের পরিচ্ছদ চালচলন অনেক বদলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বর্তমানে পরাজিত জাপানের মেয়েরা পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ অনুকরণে ব্যস্ত। এতদিন তাদের ঘাড় পর্যন্ত ছোট কাল চুল (বব্‌হেয়ার) ইলেক্ট্রিক কলে কুঁকড়িয়ে নিত কেবল- এক্ষণে রাসায়নিক ঔষধে কটা করে নিচ্ছে। এখন মেয়েদের নম্রতা ব্যঞ্জক চালচলন পদক্ষেপ ও ভাব বদলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাকঙ্ক্ষা দমাবার জন্য যুদ্ধ-প্রিয় বীরের পূজা বন্ধ করার চেষ্টায় ‘ওমিয়া’ দেবস্থান বনাকীর্ণ এখন।– এখন শহরে শহরতলিতে বায়স্কোপ থিয়েটার হল-এর নাচ ঘর (dance hall) হচ্ছে আর ছেলেমেয়ে একত্রে নাচ করছে, আমোদ করছে- এখন তারা মার্কিন অনুকরণে মার্কিন অভিরুচিতে গঠিত হচ্ছে।[260]

হংকং-এ জাপানি চিত্রকরের আঁকা ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত জাপান রাজা মিকাডো ও তাঁর রাণীর ছবি রীতিমতো আহত করে ইন্দুমাধবের রুচিকে, “সুন্দরী মিকাডো-মহিষীকে এই পোশাকে বড়ই কদর্য্য দেখাইতেছে।”[261] রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, নির্বিচারে এই ইউরোপীয় ‘আপিসের পোশাক’ পৃথিবীর সর্বত্র একধরনের রুচিগত কদর্যতার প্রকাশ যা প্রচ্ছন্ন করে দেয় জাতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যকে, ইউরোপীয় কেজো পোশাকে আচ্ছাদিত জাপানিদের বিষয়ে তিনি লেখেন,

---

[260]“জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা”, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯।

[261]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৮০।

> জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী জোড়া একটা আপিসরাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে-, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয়না, আপিস রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বলছে, "আমার ওই হ্যাটকোটের দরকার আছে।" আইনজীবীও তাই বলছে, বণিকও তাই বলছে। এমনি করেই দরকার জিনিসটা বেড়ে চলতে চলতে সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার করে দিচ্ছে।[262]

পোশাকের এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয় তাঁর পারস্য ভ্রমণকালেও, সেদেশের পুরুষদের পাশ্চাত্য ঘেঁষা 'শ্রীহীন' 'সর্বজনীন উর্দি' দেখে তাঁর মনে হয়

> সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, ক্বচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।
>
> আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণীনির্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁকে। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে, এমন-কি, এক দেশেই, বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোশাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হালকা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের– যারা সবাই একই বড়োরাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরস্ক ঈজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্বজনীন উর্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না।[263]

[262] "জাপান-যাত্রী", পৃষ্ঠা- ৪২২।

[263] "পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৪১।

পোশাকের সঙ্গে জাতিগত স্বকীয়তা বা চারিত্রিক স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে দেখার এই প্রবণতা চোখে পড়ে এশিয়ার অন্য দেশ ভ্রমণের কথনেও। সরলা দেবীর যেমন বর্মাতে গিয়ে জনৈক ব্যারিস্টার তথা পলিটিক্যাল নেতা পর্ত্তূনের সঙ্গে আলাপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, "পর্ত্তূন্ ইংরেজী ডীনার সূটে বিভূষিত হয়ে এসেছেন, বর্ম্মার আত্মা যেন তাঁর দেহত্যাগ করে চলে গেছে মনে হল। এর পরে আর একদিন তিনি সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সেদিন কিন্তু বর্ম্মীজ পোষাকে শোভিত ছিলেন। সেদিন তাঁর দেহের ভিতর স্বাভাবিক মানুষটাকেও যেন চেনা যাচ্ছিল।"[264] অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বার্দূনের স্ত্রীকে দেখে তাঁর মনে হয়, "তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ও ভারি একটী সৌকুমার্য্যসম্পন্না। তাঁর বেশভূষায় কথাবার্ত্তায় এমন একটি মোহিনী আছে যা বর্ম্মী মেয়েদের বিশেষত্ব।"[265] অন্যদিকে ডিনার পার্টিতে 'খ্রীষ্টান, আবাল্য মিশনারিদের হাতে মানুষ, কলেজে পাশ করা- নাকে মুখে চোখে কথা' কওয়া মেয়েটি বিষয়ে তাঁকে বলা হয় "এ মেয়েটিকে বর্ম্মীজ শিক্ষিত মেয়েদের আদর্শ ভাবলে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ আমাদের মেয়েরা এরকম নয়, তারা শিষ্ট ও সংযত, এ মেয়েটি মিশনারি শিক্ষার ফল।"[266] আমরা বুঝতে পারি, জাতিগত 'বিশুদ্ধতা' তথা এশীয় 'বিশেষত্ব' অন্বেষণে ব্যস্ত জাতীয়তাবাদী পাঠে 'প্রাচ্য' এবং 'পাশ্চাত্য' শব্দ দুটি কীভাবে পরস্পর বিপরীত নানা ভাব তথা বোধসঞ্জাত 'বিভাগ' হিসেবে নির্মিত হয়।

প্রসঙ্গত "পারস্যে"-র গোটা কথন জুড়েই রবীন্দ্রনাথ নিজের আর্য পরিচয়টির উপরে সবিশেষ জোর দেন এবং সেই পরিচয়ের যোগসূত্রটিকে অনুসন্ধান করতে চান। সেইসূত্রেই আর্যদের প্রাচীন ইতিহাস, এশিয়ার নানা স্থানে তাদের বিস্তার, সভ্যতা স্থাপন এবং সর্বোপরি পারস্যের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধরেখাটি বিশদে উপলব্ধি করতে চান। পারস্য সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের

---

[264]সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

[265]প্রাগুক্ত।

[266]সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

বিবর্তনের নানা বাঁক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আর্য বৈদিক যুগের সঙ্গে নানা সাদৃশ্য খুঁজে পান। খ্রীস্ট জন্মের সাড়ে-পাঁচশো বছর পূর্বে সম্রাট সাইরাসের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থানের কথা বলতে গিয়ে যেমন তিনি বৈদিক ভারতের ধর্মীয় আচারের অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন-

> সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্‌দা। ভারতীয় আর্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধু কর্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।[267]

বস্তুত জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে করা পারস্য যাত্রার অনেক আগে থেকেই তিনি বিশ্ববন্দিত, ইউরোপের জ্ঞানী-গুণী মহলে সমাদৃত। কিন্তু পারস্যের এই সফর, সেদেশে প্রাপ্ত সম্মান-সম্ভাষণ তাঁর কাছে বিশেষ হয়ে ওঠে তাঁর প্রাচ্য পরিচয়ের নিরিখে। তাঁর ভাষায়-

> এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেইজন্যে এরা অগ্রসর হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্যঅভিমানবোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ।"[268]

---

[267] "পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৪৬।

[268] "পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৩৬।

সেদেশের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংবর্ধনার প্রকৃতিকেও তাঁর নিখাদ প্রাচ্যদেশীয় মনে হয়, যা স্বভাবগতভাবে ইউরোপের থেকে অনেকটাই আলাদা। তিনি বলেন, “অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকদের আদর, পলিটিশিয়নদের দরবারে তার আসন পড়ে না, এখানে সেই গণ্ডী দেখা গেল না। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেছেন তাঁরা প্রধানত রাজদরবারীদের দল।”[269] এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন ঈজিপ্টের অভিজ্ঞতাও। সেখানে গিয়ে যখন তিনি দেখেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে রাজকর্মচারীরা পার্লামেন্টের কার্যকলাপ কিছু সময়ের জন্যে মুলতুবি রেখেছেন, তখন তাঁর মনে হয় এইধরনের আবেগ-আন্তরিকতার প্রকাশ শুধুমাত্র “প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব।”[270] শুধু তাই নয়, সেদেশের হাফিজ, রুমি, সাদির মতো মরমিয়া সাধক কবিদের কাব্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করার ‘জনশ্রুতি’-টিও তাঁকে রীতিমতো তৃপ্তি দেয় এবং সহজ অনাড়ষ্ট মেলামেশার সুযোগ তৈরি করে দেয়, “এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। ...আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে–এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনাপাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই।” সরোজনলিনীর লেখাতেও বারেবারে ‘প্রাচ্য’ আর ‘পাশ্চাত্য’-কে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ক্যাটাগরি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতার হদিশ মেলে। “এমেরিকা ও ইংলণ্ড’ ফেরত” মিঃ সুকামোটোকে লেখিকার ‘কাঁগাওয়াদের’ মতো যথেষ্ট ‘খাঁটি’ জাপানি বলে মনে হয়না। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন,

---

[269] প্রাগুক্ত।

[270] প্রাগুক্ত

> মিঃ সুকামোটো সম্প্রতি এমেরিকা ও ইংলণ্ড বেড়িয়ে এসেছেন। এঁরা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী; সেই জন্য স্বামীতে একটু অতিরিক্ত বিলাতি ধরণ আছে। তাই এঁদের মিঃ ও মিসেস কাঁগাওয়ার মতো খাঁটী জাপানি বলে মনে হয় না। কাঁগাওয়াদের মধ্যে কেমন একটা নম্রতা ও সরলতা আছে, যা সুকামোটোদের মধ্যে লক্ষিত হলো না। তাঁদের অস্বাভাবিকতা আমাদের বড়ই চোখে লাগ্‌ল। দেখ্‌লাম মিঃ সুকামোটো বিলাতি নাচ গান বাজনার অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কোথায় নেচেছিলেন ইত্যাদির গল্প করে আমাদের শোনালেন।[271]

আমরা দেখি, ‘বিলাতি’ বা জাপানি শব্দ দুটির তিনি শুধু স্বভাবগত পৃথকীকরণই করেন না, তাঁর লেখায় বিলেত/ইউরোপ বা পাশ্চাত্য নঞর্থক ব্যঞ্জনার ধারক হয়ে ওঠে। জাপান থেকে ইংল্যান্ডে যাওয়ার জাহাজের প্যাসেজ বুক করার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন,

> একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিসের ব্যাপার নজরে পড়্‌ল, যে সব অফিসে জাপানি কর্ম্মচারী ছিল, তাদের সবাই বেশ হেসে হেসে ভদ্রতার সঙ্গে বললে “জায়গা নেই”। কিন্তু যে তিনটে অফিসে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিল, তাদের কি মেজাজ! আচ্ছা বাপু, প্যাসেজ্‌ দিতে পারবে না তাই বললেই হয়, কিন্তু তা না বলে কথায় কথায় তারা মেজাজ দেখায়। জাপানি ও বিলাতি ভদ্রতার তফাৎ এই খানেই।[272]

আবার তিনি আমেরিকান মিশন স্কুলের ছাত্রীদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে কোবের হাই স্কুলের তুলনা টেনে বলেন –

> দসিসা স্কুলটা এমেরিকান মিশন বালিকা বিদ্যালয়।...মিস্‌ মেট্‌সুদা বলে একজন জাপানি শিক্ষয়ত্রী আমাদের সব ক্লাস দেখালেন। ইনি ইংরিজি জানেন। প্রথমে কলেজ, তারপর

---

[271] সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৯০-৯১।

[272] সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২৪৮-২৪৯।

> স্কুল দেখালেন। মিশন স্কুল বলে এটী একটু বেশী বিলাতি ধরণের হয়ে গেছে। কোবের হাই স্কুলের মত অমন বিশুদ্ধ জাপানি প্রতিষ্ঠান নয়। সেজন্য মেয়েদের আদব কায়দায় কেমন বিনয় ও নম্রতার অভাব মনে হলো।[273]

অর্থাৎ, আচার, সহবৎ, ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা সবকিছুই বিচার্য হয় প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মাঝে ভালো-মন্দের বিপরীত যুগ্মপদের নিরিখে। তাই মিডল স্কুলের প্রিন্সিপালের অপরিচ্ছন্ন ঘর দেখে তিনি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন- “এ লোকটির মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আভাষ আছে, তাই বোধহয় পুরো জাপানি পরিচ্ছন্নতার অভাব দেখা গেল।”[274] আমরা বুঝতে পারি, উপনিবেশিত মননের বিশিষ্টতা অন্বেষণের আকুলতা কীভাবে নির্ণয় করতে থাকে সরোজনলিনীর বিশ্লেষণের অভিমুখ যেখানে পাশ্চত্য প্রভাবিত যাবতীয় স্বভাব তথা বৈশিষ্ট্যেরই বিশুদ্ধতা তথা গুণমান বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ভালো-মন্দের এমন অতিসরলকৃত বিচার অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনই করেননা। বরং তাঁর মনে হয় পারস্পরিক জ্ঞানের আদানপ্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধিক উত্তরণই জাতিগত পরাধীনতা অতিক্রমণের সঠিক পথ। ঠিক সেই কারণেই জাপানের যে দিকটি তাঁকে প্রধানত বিব্রত তথা বিচলিত করে তা হল তাদের সামরিক তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রদর্শনী। যদিও সমুদ্রপথ থেকেই বেশিরভাগ যাত্রীকে আমরা জাপানের ক্রমবর্ধিত শক্তি বা যুদ্ধ জয় বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের ঠিক পরেই জাপানে পৌঁছে রথীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে জাপানিদের জয়ের উদ্‌যাপন দেখে রীতিমতো গর্বভরে লেখেন,

> মালয় ও চীনের বন্দরে বন্দরে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে আমাদের জাহাজ মাস পাঁচেক পরে জাপানে এসে পৌঁছল। তখন জাপান সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার অন্ত নেই। প্রত্যেক জাপানি আমাদের চোখে এসিয়ার বীরসন্তান। যুদ্ধে রুশকে হারিয়ে তারা প্রমাণ করে

---

[273]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২০১।

[274]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২১৭।

> দিয়েছে, পশ্চিমের রণশক্তি অপরাজেয় নয়। আমরা যখন জাপানে পৌঁছলাম তখন সেখানে বিজয়োৎসবের পালা চলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে শান্তিনিকেতনে আমরা এই উৎসব পালন করে এসেছি- তার স্মৃতি তখনো আমাদের মনে জ্বলজ্বল করছে। জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় যে যুগান্তকারী ঘটনা, আমাদের মনে সে ধারণা তখনো স্পষ্ট। সুতরাং টোকিও শহরের এই উৎসবে আমরা পরম উৎসাহে যোগ দিলাম। প্রত্যেক পার্কে, প্রত্যেক স্কোয়ারে, স্তরে স্তরে সাজানো শত্রুপক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কামান বন্দুক গুলিগোলা। ঘুরে ঘুরে এই-সব দেখি আর জাপান সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব আমাদের উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।[275]

রবীন্দ্রনাথের কিন্তু মনে হয় জাপানের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সৌম্য সৌন্দর্য তাকে কলুষিত করে সামরিক শক্তির সদম্ভ প্রকাশ, “জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ, সেইজন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এইজন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি।”[276] তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ জাপানের বিজয়োৎসব দেখে যতই অভিভূত হন না কেন, পিতার কিন্তু মনে হয়, “চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল– সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সেকথা - জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে, সে তো হিংসা নয়।”[277] বস্তুত জাপানের জাতীয়তাবাদী উগ্রতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্বেগের প্রসঙ্গটি উঠে আসে তাঁর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের পারস্য সফরেও। পারস্যের নানা স্থানে

---

[275] রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১০৮-১০৯।

[276] “জাপান-যাত্রী”, পৃষ্ঠা- ৪২৯।

[277] প্রাগুক্ত।

ভ্রমণের সমান্তরালে সমকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে করতে তিনি ইউরোপের মতো জাপানেরও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান মোহের ভয়াবহতা সম্পর্কে লেখেন -

> নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্বএশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এশিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু করে দিয়েছে এশিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে একদিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। [278]

এবং এই সাম্রাজ্যবাদী বিদ্বেষের বিধ্বংসী পরিণতি বিষয়েও তিনি নিঃসংশয় থাকেন, “কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।”[279] রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কাগুলিকেই প্রকট-প্রবল রূপে প্রত্যক্ষ করেন রামনাথ বিশ্বাস, তাঁর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ভ্রমণে। তাঁর চিন যাত্রার কথনেই জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ঘিরে চিনের পথে প্রতিবাদ মিছিল, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে জনমানসের ক্ষোভের কথা আমরা আগেই শুনেছি। সেই পর্বের ভ্রমণে কোরিয়ার উপর জাপানের অবদমনের এক ভীষণ চিত্রও উঠে আসে। কোরিয়ার দৈনন্দিন যাপনের সর্বত্র জাপানের নিয়ন্ত্রণ দেখে রামনাথের মনে হয়, “জাপান কোরিয়াকে জয় তো করেছেই এখন চায় একদম গ্রাস করতে।”[280] এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠি”-র অন্তর্ভুক্ত “কোরীয়

---

[278] “পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩৩।

[279] “পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩৩।

[280] *মুক্ত মহাচীন*, পৃষ্ঠা- ৫।

যুবকের রাষ্ট্রিক মত" প্রবন্ধটির কথাও, যেখানে একইভাবে জনৈক কোরীয় যুবকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে কোরিয়ার উপরে জাপানের আধিপত্য কায়েমের ছবিটি,

> আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোরিয়ায় জাপানী রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয়?"
> "না।"
> "কেন। জাপানী আমলে তোমাদের দেশে পূর্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয় নি।"
> "তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, জাপানী রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মুনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল করে রাখে, কারণ সেটা তার আপন সম্পত্তি,তাকে নিয়ে তার অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটি বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে বাহ্য যত্ন করলেই তার পক্ষে যথেষ্ট।"[281]

বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হরিপ্রভার তৃতীয়বারের জাপানযাত্রায়, রবীন্দ্রনাথ বা রামনাথ যে বিপদের অশনিসঙ্কেত পেয়েছিলেন জাপানের সামরিক দম্ভের মাঝে, সেই আশঙ্কাকেই সত্যি হতে দেখা যায়। প্রথমবারের আনন্দভ্রমণের তুলনায় যা চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ, কথনের শুরুতেই লেখিকা বলেন -

> জগৎ জোড়া রণভেরী বেজে উঠেছে। যুদ্ধাশঙ্কায় সবার মন কম্পিত। আমার স্বামী নিজ দেশ জাপানে ফিরে যেতে চান। বৃদ্ধ বয়সে বন্দী হয়ে থাকা কষ্টকর। স্বামীর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। জাপান সরকারই নিয়ে যেতে এসেছে। যুদ্ধাশঙ্কায় যারা দেশে ফিরতে চায় তাদের জন্য জাপান থেকে শেষ জাহাজ আসছে। বোম্বে থেকে জাহাজে উঠতে হবে। এবার আমার তৃতীয়বার জাপান যাত্রা।[282]

---

[281] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত", রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড ,পৃষ্ঠা- ৬১৪।

[282] হরিপ্রভা তাকেদা, "যুদ্ধ-জর্জরিত জাপানে", পৃষ্ঠা- ৬৪।

চরম উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু এই কথন সর্বক্ষণই সাক্ষ্যবহ থাকে, যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের এক ধূসর ছবির। প্রথমবারের কাহিনীতে যেখানে রাজনৈতিক কোনো বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিলনা, সেখানে তৃতীয়বারের অভিজ্ঞতা পুরোটিই আবর্তিত হয় রাজনৈতিক বাস্তবতার নানা কঠোর চিত্রকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধপ্রসঙ্গ বারবারই ফিরে আসে এই কথনে, বা বলা যায় যুদ্ধ তথা যুদ্ধসঞ্জাত নানা অভিজ্ঞতাই এ কথনের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে। বস্তত এই যাত্রা শুরুই হয় মাইনে ভরা সমুদ্র দিয়ে যাত্রাকালে প্রতিমুহূর্তে জাহাজডুবির ভয় নিয়ে, "...সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি সমুদ্রে ভাসমান ছিন্ন মাইন, জাহাজে ঠেকলে জাহাজ তলিয়ে যাবে আশঙ্কায় জাহাজ সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চলছে। যাত্রীগণ যে কোন মুহূর্তে জাহাজডুবির ভয়ে রাত্রি জাগরণে বসে আছেন। বিপদ সঙ্কেত শুন্‌লেই নিমজ্জমান জাহাজ থেকে নেমে যাবেন বাঁচার চেষ্টায়।"[283] জাপানের ঝকঝকে ছবি বদলে যায়, যুদ্ধধস্ত দেশের অনিশ্চিত, উৎকণ্ঠিত আবহে, "তেল পাওয়া যায় না। কোনওমতে সমবায় পদ্ধতিতে চলছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সগুলি ঠাট বজায় রেখে কোনও মতে পুরাতন দ্রব্যাদি বিক্রয় করে চলেছে। কিছুই পাওয়া যায় না।"[284] ফলত প্রথমবার জাপানে গিয়ে জাপানের খাদ্যরীতি বিষয়ে নানা খুঁটিনাটির বিবরণ পাঠককে দিলেও, নিজে সেই স্বাদ না চাখার সিদ্ধান্ত বা স্বাধীনতা সেসময়ে ছিল, এই চরম খাদ্যসঙ্কটের মাঝে স্বভাবতই তা আর থাকেনা। হরিপ্রভা লেখেন, "...সমুদ্রে মাছ ধরা বিপজ্জনক- যুদ্ধাশঙ্কায় মাইনভর্তি।...ডিমও কম পাওয়া যায়- নিয়ন্ত্রিত। জাপানি রান্না খাওয়ার অভ্যাস করি।"[285] বস্তত বোমাতঙ্কে মাটির নীচের বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়া, যুদ্ধবিমানের আনাগোনায় নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন, আপনজনেদের হারানো, অর্থাভাব, খাদ্যসঙ্কট, যুদ্ধধ্বস্ত দেশে ভিক্ষুকদের লাইনে দাঁড়িয়ে দৈনিক আহার সংগ্রহ করা থেকে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর উদ্যোগে রেডিওতে বাংলায়

---

[283]"যুদ্ধ-জর্জরিত জাপানে", পৃষ্ঠা- ৬৬।

[284]প্রাগুক্ত।

[285]যুদ্ধ-জর্জরিত জাপানে, পৃষ্ঠা- ৬৮।

সংবাদ পাঠ, নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রভৃতি নানা রোমহর্ষক মুহূর্তে ভরা থাকে এই কথন। প্রথমবারের বিদেশযাত্রায় ভীত অথচ শ্বশুরবাড়ি দেখতে উন্মুখ সেই মেয়েটির ঘরোয়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যায়না আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল পাকেচক্রে বিপর্যস্ত জনজীবনের এই আখ্যানকে।

জাপান ভ্রমণের বৃত্তান্ত অবশ্য শুধু জাপানিদের বিষয়ে ভালো-মন্দের পর্যবেক্ষণ বা শিক্ষাগ্রহণের পাঠেই সমাপ্ত হয়না, সেইসঙ্গে বিশেষভাবে উঠে আসে বৌদ্ধধর্মের সূত্রে জাপানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সম্বন্ধসূত্রটির চর্চাও। জাপান যে বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে বহুলাংশে ভারতের কাছে ঋণী সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ অনেক কথনেই উঠে আসে। জাপানের বর্তমান উন্নতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া যাত্রীদের অধিকাংশকেই স্বসত্তা বিষয়ে আত্মবিশ্বাস দেয় এই অতীত অভিঘাতের প্রসঙ্গটি। ফলত জাপানিদের ভারতীয়দের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বা সেদেশের ধর্মের উপর ভারতের প্রাচীন অভিঘাত এই প্রসঙ্গও কমবেশি সকল কথনেই উঠে আসে। সদ্য পলাতক, ইংরেজের দাসত্ব বিষয়ে লজ্জিত রাসবিহারী বসু যেমন জাপানে গিয়ে জনৈক জাপানবাসীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়ার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন -

> সে বুঝাইয়া দিল যে, আমরা ভারতবাসী, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের দেশের লোক, সেইজন্যে আমাদের সেবা করিতে সে আসিয়াছে। সে টাকার জন্যে আসে নাই। বুদ্ধ তাহার 'কামী' অর্থাৎ ভগবান, তাহার দেশের লোক বলিয়া সে এবং অন্য সমস্ত জাপানী আমাদের ভায়ের মতন ভালোবাসে।
>
> এই কথাটা শুনিয়া হৃদয়ে একটা বেশ আনন্দ হইল। ভারতীয়কে ভালবাসে এমন জাত পৃথিবীরে আছে এই প্রথম জানিলাম এবং পরে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি।
>
> আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ এখনও জাপান ভারতকে এবং ভারতের ঋণ ভুলে নাই বলিয়া। কপর্দকহীন, বন্ধুহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন হইয়াও আমার মতন অকেজো এবং অপদার্থ একজন যে এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ

> এই যে, পূর্বে ভারত জাপানকে যে জিনিস দিয়াছিল তাহা জাপান ভুলে নাই এবং কখনও ভুলিবে বলিয়া বোধ হয় না। আজও ভারতবাসী এখানে সম্মান পায়।[286]

আমরা বুঝতে পারি ভারতীয় সভ্যতার সূত্র ধরে বাড়তি সম্মান পাওয়ার এই ঘটনা কীভাবে পরাধীনতার মালিন্য ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে। কীভাবে নতুন আত্মবিশ্বাস দেয়। এই বিশ্বাস তথা প্রত্যয় থাকে সরজনলিনীর কলমেও, "ভারতবর্ষের উপর জাপানিদের খুবই শ্রদ্ধা দেখ্‌লাম, কারণ তাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তিই ভারতবর্ষে।"[287] জাদুঘরে বুদ্ধ মূর্তি দেখতে দেখতেও তাঁর মনে হয় আধ্যাত্মিক চেতনাই জাপানিদের গভীর নান্দনিকতার বোধ সৃষ্টি করেছে আর এই আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকৃত উৎস ভারতবর্ষ-

> মনে হয় প্রাচীন জাপানের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বুদ্ধের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য থেকেই ফুটে উঠেছে। আর এই সৌন্দর্য্যগুলিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে তোল্‌বার জন্যে জাপানের প্রাচীন শিল্পীদের মনে যে কি গভীর আবেগ ছিল তা এগুলি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে সোজা না এসে চীন দেশ হয়ে এলেও ভারতবর্ষের সঙ্গে তার নিকট সম্বন্ধ ধরা পড়ে; জাপানীরা প্রধান আধ্যাত্মিক ভাবগুলি যে ভারতবর্ষ থেকে খুব নিকট ভাবেই পেয়েছে তাও বেশ বোঝা যায়।[288]

বস্তুত অতীত ভারতের সঙ্গে জাপানের এই যোগাযোগ বিষয়ে, জাপানের উপর ভারতের অভিঘাত বিষয়ে যে আরও গভীরে আরও বিশদে চর্চা হওয়া দরকার, সে কথা জানিয়ে *প্রবাসী*-তে চিঠি লেখেন, জাপানগামী ছাত্র সত্যসুন্দর দেবও,

---

[286]রাসবিহারী বসু, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯।

[287]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ১৮৭।

[288]সরোজনলিনী দেবী, পৃষ্ঠা- ২১৩।

> জাপান হইতে লিখিবার বিষয় অনেক আছে; বিশেষতঃ কিয়োটোতে বাস করিয়া। কারণ, কিয়োটো জাপানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাভূমি। বিশেষ গবেষোণা করিয়া দেখিলে ভারতের সহিত জাপানের অনেক সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। এখানে প্রাচীন ভারতের বস্তু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ভারতের কথা অনেক শুনিয়া থাকি। কিন্তু তাহা পর্য্যালচনা করিয়া সবিশেষ লেখা আমাদের স্যার ছাত্রদের কার্য্য নয়; তজ্জন্য বিশেষ পাঠ এবং পরিশ্রমের দরকার।[289]

এবং ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতের জ্ঞানস্পৃহা কম বলেই যে তারা নিজেদের অতীত গৈরবের এক মহিমান্বিত অধ্যায় যা ছড়িয়ে আছে জাপানের কলা-স্থাপত্য-ধর্মের নানা স্তরে তা নিয়ে উদাসীন, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত থাকেন, “আমাদের যথার্থ স্বদেশপ্রেম ও জ্ঞানলিপ্সা থাকিলে অন্ততঃ দুই একজন ভারতবাসীও কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের চিহ্নগুলি অধ্যয়ন করিবার জন্যই জাপানে যাইতেন। এখন আমরা নিদ্রা যাই। যখন কোন বিদেশী এই সকল বিষয়ে কিছু লিখিবেন, তখন আমাদের বড়াই করিবার পালা আসিবে।”[290] আমারা অবশ্যই খেয়াল করব চিঠিতে নির্বাচত ‘স্বদেশপ্রেম’ ও ‘জ্ঞানলিপ্সা’ শব্দ দুইটিকে। কারণ প্রায় একই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ আমরা দেখেছিলাম মন্মথনাথের উৎসর্গপত্রটিতেও, যেখানে জাপান থেকে জাতির পুনর্গঠনের উপযোগী নিদানগুলি শেখার তাগিদে ভ্রমণের অভিপ্রায়কে বিশেষিত করা হয়েছিল এই শব্দযুগলের সাহায্যে। আর এখানে এদের ব্যবহার ঠিক উল্টোপথে- ভারত থেকে বাহিত জ্ঞান-দর্শন যা ভারতের কাছে জাপানকে চিরঋণী করেছে সেই বিষয়ে চর্চার গুরুত্ব বোঝাতে। আমরা বুঝতে পারি, পরাধীন জাতি তার বর্তমানে সঙ্গে যুঝতে ভ্রমণ মারফৎ শুধু ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান নির্মাণেরই প্রয়াস করে না, নিজের অতীত গৌরব রোমন্থনের ‘গুরুদায়িত্ব’-ও পালন করতে চায়। বস্তুত ভ্রমণকথনগুলিকে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই আমরা বুঝতে পারি, ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপন বা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার যে জাতিগত

---

[289]সত্যসুন্দর দেব, “বাঙ্গালীর কথা”, *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩১২, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ২১৭।

[290]বাঙ্গালীর কথা, (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১২, ৪র্থ সংখ্যা), পৃষ্ঠা- ২১৮।

যোগ্যতা তথা পরাক্রমতার নমুনা সেই বিষয়ে বেশিরভাগই নিঃসংশয় থাকেন। সকলে ইন্দুমাধবের মতো সরাসরি না বললেও (যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি) কথনগুলি জুড়ে বাণিজ্যতরী, রণপোত, সামরিক বিজয়, ইউরোপীয় কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিষয়ে প্রশংসা বা মুগ্ধতা (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যতিক্রমীদের কথাও ভুলে গেলে চলবেনা) থেকেই একথা স্পষ্ট যে কীভাবে সেগুলিকেই ক্ষমতা তথা যোগ্যতার প্রকরণ হিসেবে আত্মস্থ করে নেওয়া হয়। এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের সেই দরবারে যেহেতু পরাধীন জাতি নিজেদের কোনোরকম প্রতিনিধিত্ব কায়েম করতে পারেনা, তাই ক্ষমতায়নের বিকল্প সুলুকসন্ধান চলতে থাকে ভারতের অধ্যাত্মবাদ-ধর্ম-দর্শন বা অতীত গৌরবের প্রকল্প রচনার মধ্যে দিয়ে। এবং সেই অতীতকে বর্তমানে পুনঃস্থাপিত করার উদ্যোগের বিবিধ উপস্থাপনা চোখে আসে এই পর্বের বৃত্তান্তগুলিতে। তাই রাজনৈতিকভাবে না হলেও, অতীতের মতোই বর্তমান প্রেক্ষিতেও আধ্যাত্মিকভাবে যে ভারত দেশে দেশে নিজের প্রভাব বিস্তারের কাজ করতে পারে সে কথা মাথায় রেখে, জাপানে হিন্দুধর্ম প্রচারের অভিনব প্রস্তাব দেন সারদাচরণ মিত্র, মন্মথনাথের *জাপান-প্রবাস*-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে। এবং বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের পরিচিতি, হিন্দু ধর্ম এবং তার ঐতিহ্য বিষয়ে এই আত্মপ্রত্যয়কে আরও বাড়িয়ে দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উন্নত জাতিও যে ধর্ম-আধ্যাত্মিকতার সূত্রে, চারিত্রিক উন্নতি অর্জনে ভারতের মতো প্রাচীন দেশের মুখাপেক্ষী হতে পারে, সে বিষয়ে যুক্তি সাজিয়ে তিনি বলেন,

> জাপানের বড় বড় সহরে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিশ্বাস বড় বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না।...এককালে গৌতম বুদ্ধের জ্যোতিঃ জাপানকে আলোকিত করিয়াছিল; এখন শঙ্করের অংশ স্বরূপ শঙ্করের মত প্রচারের দ্বারা নূতন জ্ঞানালোক প্রচারের কাল উপস্থিত।
> জগতের সমস্ত ধর্ম্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেবল আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের নাই। আমাদের ধর্ম্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ? খৃষ্টান

> ধর্ম্ম যেমন জগত বেড়ীয়া ফেলিতেছে; হিন্দু ধর্ম্ম কি তাহা পারিত না? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিলে বোধ হয় জগতের লোককে মুগ্ধ করা যায়। বিবেকানন্দ সমিতির চেষ্টায় (The Vivekananda mission) আমেরিকায় কিরূপ সুফল ফলিতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। আমার বোধ হয়, ঐরূপ একদল প্রচারক জাপানে যাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলে, অচিরে জাপানবাসীদিগকে হিন্দু করা যাইতে পারে। জাপানে আজকাল ধর্ম্মপ্রভাব প্রায় লোপ হইয়াছে। জাপানীরা এ অবস্থায় যে ধর্ম্মের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন।[291]

আমরা অনুভব করতে পারি, ভ্রমণ কীভাবে উপনিবেশাশ্রিতের আত্মনির্মাণেরই জরুরি ভাষ্য হয়ে ওঠে। যে নির্মাণের ভিতরে নিহিত থাকে অনুসন্ধান, সমীক্ষা, সমালোচনা, আত্মপ্রশস্তির বিবিধ প্রক্রিয়া। কখনো তার মধ্যে থাকে উন্নত জাতির থেকে শিক্ষার্জনের মাধ্যমে বর্তমান তথা ভবিষ্যৎ ভাগ্যরেখা পরিবর্তনের প্রয়াস, কখনো বা অতীত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চর্চার মধ্যে দিয়ে বর্তমানের অপারতা তথা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্বেগকে পেলব করার প্রয়াস। এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিষয়ক নানা বাসনা, ক্ষোভ, উৎকণ্ঠার প্রভূত চাপানোতরের মধ্যেই নির্মিত তথা নিয়ন্ত্রিত হয় ভ্রমণকারীদের দৃষ্টিপথ। এই আলোচনাকে বহতা দিতেই এবার আমরা চোখ রাখব ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের একত্রে ইন্দোনেশিয়ার নানা অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপস্থাপনার দিকে।

(৩)

এই অধ্যায়ের প্রথম ধাপেই, কথনগুলির প্রেক্ষিত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন

[291]“বিশেষ দ্রষ্টব্য” (সারদাচরণ মিত্রের লেখা ভূমিকা), *জাপান-প্রবাস*।

মূলত তৎকালীন ‘বৃহত্তর ভারত’ বিষয়ক চিন্তা তথা চেতনাকে কেন্দ্রে রেখে। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মভিত্তিক যোগাযোগের পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতের ‘সনাতন’ এক রূপকে দেখার প্রত্যাশা নিয়েই যে এই যাত্রা সে বিষয়ে তিনি বিদায়পূর্ব সংবর্ধনাতেই জানিয়ে দেন। সহযাত্রী সুনীতিকুমারও এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য বিষয়ে বলেন– “রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ-ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, ভারত কী ক’রে যবদ্বীপকে আপনার ক’রেছিল তা চাক্ষুষ দেখে আসা, যবদ্বীপের culture কে একটু বোঝবার চেষ্টা করা।”[292] এবং এই অতীতমন্থনের কাজে বর্তমান যে প্রায়শই চাপা পড়ে গেছে অথবা আলোচনার আওতাতেই আসেনি সে স্বীকারোক্তিও জুড়ে দেন তিনি- “এদেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বা শাসন-পদ্ধতি ভালো ক’রে দেখ্‌বার সুযোগ আমাদের হয় নি, আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য- যেমন যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি- তার দিকেও আমরা নজর দিতে পারি নি। ভারতের সাহচর্য্যে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ-এর-ই একটু-আধুটু দেখ্‌তেই আমরা যত্নশীল ছিলুম।”[293] বস্তুত “ভারত কী ক’রে যবদ্বীপকে আপনার ক’রেছিল” বা “ভারতের সাহচর্য্যে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ” প্রভৃতি বক্তব্যের আবতারণা বুঝিয়ে দেয় কীভাবে একধরনের আধ্যাত্মিক ‘উপনিবেশায়নের’ আকাঙ্ক্ষা জারিত থাকে যাত্রীদের দৃষ্টিপথে যেখানে গন্তব্যস্থলগুলি ‘বৃহত্তর ভারত’ ভাবনার এক বৈশিষ্ট্যবিহীন ‘অপর’-এ পরিণত হয়, তাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা চোখেই পড়ে না। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই, জাভার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, ভারতেরই ‘ভাঙাচোরা মূর্তি’, তিনি চিঠিতে লেখেন, “এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই-সব ভাঙাচোরা মূর্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নীচে বসে গিয়েছে– সেই-সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ;

---

[292]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৫৯।

[293]প্রাগুক্ত।

আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।”[294] আমাদের বুঝতে আসুবিধা হয়না যে প্রাচীন এক উপনিবেশের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার বাসনা বা তাকে নিয়ে চর্চাই আসলে এই ভ্রমণের প্রধান অভিমুখ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বা সুনীতিকুমারের কথনে চোখ রাখলেই আমরা অনুধাবন করেতে পারি যে দুজনেই সেদেশের ধর্ম-দর্শন, সংস্কৃতি, পৌরাণিক আখ্যান সমস্ত কিছুকেই প্রাচীন ভারতের প্রক্ষেপ হিসেবে দেখতে বা পড়তে চান। সুনীতিকুমার যেমন লেখেন,

> নানা দিক্ দিয়ে বালিও দ্বীপ এক আশ্চর্য্য দেশ। এখানকার লোকেরা এখনও তাদের প্রাচীন সারল্য আর তেজ বজায় রেখেছে, এদের জীবন-যাত্রা যেন স্বপ্ন-রাজ্যের ব্যাপার-প্রতি পদে আমাদের প্রাচীন ভারতের কল্প-লোকের কথা স্মরণ করিয়ে’ দেয়। ভারতবাসীর পক্ষে এই দেশ এক তীর্থ-স্বরূপ। আমাদের প্রতি পদে মনে হ’চ্ছিল, প্রাচীন ভারতকে আংশিক ভাবে চাক্ষুষ ক’রে দেখতে হলে- বালিদ্বীপ একবার ঘুরে যাওয়া দরকার।[295]

আমরা বুঝতে পারি এই ভ্রমণ আসলে পরাধীন জাতির ক্ষমতায়নের ভাষ্য হয়ে উঠতে চায় যা ভারতের প্রাচীন ব্যাপ্তির ইতিহাসটিকে নির্মাণ করে নিতে চায়। আর এই ইতিহাসের প্রকল্পে ইউরোপের বলনির্ভর, আধিপত্য কায়েমে উদগ্রীব উপনিবেশায়নের অভিপ্রেত বিকল্প হিসেবে প্রাচীন ভারত তথা প্রাচ্যের আত্মিক বন্ধনে আবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপনিবেশের ছবি গড়ে তোলা হয়। এবং যেহেতু এই ক্ষমতায়নের প্রধান আলম্ব থাকে অতীতকল্পনা, তাই সুনীতিকুমার এবং রবীন্দ্রনাথ দুইজনের বৃত্তান্তেরই গতিপথ অতীত আর বর্তমানের মাঝে পিচ্ছিল হতে থাকে। বা

---

[294]রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “জাভা-যাত্রীর পত্র” (৭ নং পত্র), *রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৬), পৃষ্ঠা- ৫১৩।

[295]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৭৬।

বলা ভালো, বর্তমানের ক্ষত বা খামতি ঢাকতে বর্তমানের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হয়ে ওঠে না দেখা অতীত। যদিও সেই অতীতকল্পনার সঙ্গে অনেকসময়েই দেশগুলির বর্তমান বাস্তবের কোনো সাযুজ্য থাকেনা। সুনীতিকুমার যেমন ইউরোপীয় ট্যুরিস্টদের চাহিদা মেনে, আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসানো বালির প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্রমশ ম্লান হয়ে যেতে দেখে স্বীকার করে নেন,

> কিন্তু এ'কথাও স্বীকার ক'র্‌ছি- বালিদ্বীপের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর সারল্য আর থাক্‌ছে না- অতি শীঘ্র শীঘ্র বদ্‌লাচ্ছে, দুই-পাঁচ বছরের ভিতর এই স্বর্গরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য থাকবে না, পৃথিবীর ধুলায় মলিন হ'য়ে যাবে, বালীর হিন্দু জনগণের জীবনের সৌন্দর্য্য আর সুষমা অতীতের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াবে। মোটর-কার, বিলিতি মালের মহাজন, সিনেমা, আমেরিকান আর ইউরোপিয়ান টুরিস্ট্‌, আর ফ্যাশনের আধিপত্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন-নতুন অভাব- সবে মিলে বালিদ্বীপকে বর্তমান পৃথিবীর অন্য অংশে সামিল ক'রে দিচ্ছে।[296]

আমরা খেয়াল করি, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত এই কথনে অনুপস্থিত থাকে বর্তমানের অনেক জরুরি অনুষঙ্গ। ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতা বা অস্থিরতার বাস্তবটি যেমন বিশেষ সামনে আসেনা। এবং সেই অনুপস্থিতির কারণ নির্দেশ করে সুনীতিকুমার লেখেন,

> যবদ্বীপে আমরা বিশেষ ক'রে প্রাচীন কীর্তি-ই দেখ্‌তে যাই। এদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার আর স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম ক'রছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশি

[296] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৭৬।

> মেশ্‌বার সুযোগ আমাদের হয় নি। ডচ্ সরকারি লোক বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকাটা এর একটা কারণ হবে। তাই এদিকটায় আমাদের ভ্রমণ অপূর্ণ র'য়ে গিয়েছে।[297]

অবশ্য, যে দেশ বা অঞ্চলগুলিকে তাঁদের মনে হয়েছিল ভারতেরই আরেক অংশমাত্র, বা যাদের উপর ভারতীয় সভ্যতার অপরিসীম প্রভাব ভেবে শ্লাঘা বোধ করেছিলেন, সেই দেশগুলির সাধারণ মানুষ যে আদৌ এই বিষয়ে ভাবিত নন, বা তাদের দৈনন্দিন যাপনে ভারত বিষয়ক ভাবনার আলদা কোনো তাৎপর্য নেই সে কথাও সামনে চলে আসে, ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের মনে ভারতবর্ষ বিষয়ক ধারণা সম্পর্কে তিনি লেখেন-

> ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতির এমন কি তার অস্তিত্বের কথা সাধারণ লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। নিজেদের ভাষায় পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত পড়ে বটে, বিস্তর পৌরাণিক কাহিনী জানে বটে, কিন্তু এদের বিশ্বাস, দেবদেবীর লীলা আর পৌরাণিক যত ঘটনা ঘ'টেছিল, তার সমস্ত বালিদ্বীপে আর যবদ্বীপেই ঘ'টেছিল- আর জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের কথা এদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানেন বটে, এদের কাছে কিন্তু সে জম্বুদ্বীপ পুরাণের যুগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বাস্তব জগতে তার যেন অস্তিত্ব নেই। তবে আজকাল ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে, ভূগোল-বিদ্যা আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা একটু সচেতন হ'চ্ছে বটে।[298]

বর্মাতে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করতে গিয়ে 'বৃহত্তর ভারত' বিষয়ক চেতনাকে একইভাবে ধাক্কা খেতে দেখেন সরলা দেবীও। বর্মার বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তিনি উপলব্ধি করেন, বৌদ্ধ ধর্মের উৎস হিসেবে সে দেশের মানুষ অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় শ্রীলঙ্কাকে,

---

[297]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৮৮।

[298]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০৫।

> বার্দূনের কথায় জানতে পারলুম, আদৎ যে বর্ম্মা জাতি, তারা নিজেদের মূলতঃ তিব্বতী আর্য্য জাতি বলে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের বিশেষ টান নেই। বৌদ্ধধর্ম্মগত যে টান সেটা সিঙ্ঘলের উপরেই বেশী পড়েছে। কেননা প্রথম প্রথম উত্তরপূর্ব্ববঙ্গ থেকে বৌদ্ধ প্রচারকের দল বর্ম্মাদেশ অভিযান করলেও শেষাশেষি সিঙ্ঘলের মহাযান-পন্থার বৌদ্ধধর্ম্মই তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছে; সিঙ্ঘল থেকে বুদ্ধের দন্ত প্রভৃতি অনেক স্মৃতিচুহ্ন তারা লাভ করেছে; তাই প্রায় দু'তিন শতাব্দী থেকে সিংহলের সঙ্গেই বর্ম্মার বৌদ্ধদের বেশী ঘনিষ্ঠতা, এবং সিংহলে যাতায়াতও বেশী।[299]

এবং বৃহত্তর ভারতের আদর্শে তৃপ্ত মনে স্বভাবতই যে বাস্তবের এই বিরূপতা খুব একটা সুখকর হয়না, সেকথাও তিনি জানান, "এদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষে বর্ম্মাস্থ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অনেক বর্ম্মীরা সম্প্রতি বিশেষভাবে বিমুখ হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রতি তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ঋণ একেবারে ভুলে যাবার যোগাড় হয়েছে। হিন্দু মহাসভার নেত্রী যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন ও সন্দেশ নিয়ে এখানে উপনীত হয়েছে, তার কর্ণকুহরে বর্ম্মীমুখপ্রসূত এ-সব তথ্যগুলি বড় শ্রুতিমধুর হল না।"[300] এই লেখা পড়তে পড়তে সহজেই ধরা যায়, প্রাচীন ভারতের নির্মাণপ্রকল্পের সঙ্গে বাস্তবের বিচ্ছেদ রেখাটি লেখিকাকে বেশ বিব্রত করে। সুনীতিকুমার অবশ্য বাস্তবের বিরূপ চিত্রের বিক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ করলেও তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত 'ভারতের বাইরে ভারতের' রূপ দর্শনের পূর্বনির্ধারিত ভ্রমণপ্রকল্পটির সাপেক্ষেই। ফলত ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপ, নানা অঞ্চল তাঁর কাছে বারেবারে অতীত ভারতেরই চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। এবং যাত্রা শেষ করার আগেও তিনি আরও একবার সেই অভিপ্রায়টিকেই ঝালিয়ে নিয়ে বলেন, "একটি বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্নের মতন আমাদের দ্বীপময়-ভারত দর্শন সমাপ্ত হ'ল। কিন্তু দ্বীপময়-ভারত দর্শনের ফলে আমি আমার ভারতীয় জাতির গৌরব কিছু পরিমাণে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছি, প্রাচীন ভারতের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হ'ইয়েছি,-

---

[299] সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৪৮-১৪৯।

[300] সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ১৪৯।

আর সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যৎসামান্য দ্যোতনা লাভ ক'রে, নিজেকে-ও আগের চেয়ে আরও ভালো ক'রে জান্‌তে সমর্থ হ'ইয়েছি।।[301] আমরা বুঝতে পারি এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য আদপেই ইন্দোনেশিয়া বিষয়ে চর্মচক্ষুজাত অভিজ্ঞতা অর্জন ছিলনা, বরং ছিল অতীত ভারত তথা নিজেদের ভারতীয় সত্তার এক স্বপ্নালু রোম্যান্টিক অন্বেষণ। অর্থাৎ ভ্রমণ আর শুধু স্বচক্ষে দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ থাকেনা, বরং ভ্রমণকারী অনেক সময়েই কল্পনা আর বাস্তবের এক মধ্যবর্তী পরিসরে দাঁড়িয়ে নিজের গন্তব্যের অবয়বটিকে নিজের চাহিদা অনুসারে নির্মাণ করে নেন বা নিতে চান।

(৪)

ওকাকুরার *Ideals of the East* পড়ে রোমাঞ্চিত রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "'Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate two mighty civilizations...'- পড়ে আমাদের গায়ে কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।"[302] প্রশ্ন উঠতে পারে, এশিয়ার নানা দেশ নিয়ে নানা জনের লেখা বৃত্তান্তগুলি পড়তে পড়তেও কি সবসময় এশিয়ার অবিভাজ্যতা বিষয়ে এমন কোনো নিরবিচ্ছিন্ন নিটোল ছবি আমাদের মনে তৈরি হয়? নাকি এই কথনগুলি এশিয়ার এক বহুধাবিভক্ত অস্তিত্বের বহু রকমফেরের সাক্ষী থাকে? রকমফের বলতে আমরা যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের সাপেক্ষে উদ্ভূত ভিন্নতাকে ধরছি, তা নয়। এই রকমফের নির্ণীত হয়, ভ্রমণের

[301]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৯৩।

[302]রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১০১-১০২।

সময়, অভিপ্রায় এবং অবশ্যই ভ্রমণকারীর লিঙ্গের নিরিখে। একইভাবে গন্তব্য দেশ ও তার বাসিন্দাদের বিষয়েও যাত্রীদের কোনো একমাত্রিক বা সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠেনা। এশিয়ার নানা অংশে ভ্রমণের সুবাদে, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রাচ্যবাসীর বেশ কিছু স্বভাব সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন, (যা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি) তেমনই তুলে ধরেন পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যগুলিকে, ভূপ্রাকৃতিক ভিন্নতাকে। পারস্যে পৌঁছে তিনি লেখেন–

> এ দেশে আসবামাত্র সব চেয়ে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্তান থেকে আরম্ভ করে মেসোপটেমিয়া হয়ে আরব পর্যন্ত নির্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদবর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেছে এবং অবরুদ্ধ করেছে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ বলেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।[303]

সরলা দেবীর আবার প্রত্যক্ষ করেন বর্মীজ সমাজের এক অসম, বহুবিভাজিত রূপ - সাবেকী সনাতনী নারী থেকে ইউরোপীয় হাবেভাবে অভ্যস্ত আধুনিকা- দুই বিপ্রতীপ চিত্রই তাঁর চোখে আসে এবং এই দুই ভাবেরই গ্রহণযোগ্যতাকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখতে চান। ফলত জনৈক বর্মী নারীর সঙ্গে আলাপের সময়ে তাঁর মনে হয়,

> তা সত্য দোষে গুণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শের নমুনা এ মেয়েটি। দোষগুলি উপেক্ষা করে দেখলে দেখা যায় সে অনেক গুণে গুণান্বিতা। সে গুণগুলি ফুটবার অবসর পেয়েছে

[303]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৪৫।

> মিশনারিদের কল্যাণে। সে গান গায় অতি সুন্দর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে সিদ্ধ গায়িকা, আবার ইংরাজী হাল গানে, মজার গানে, নাচুনে গানে, প্রেমের গানেও পরিপক্ক। তার মুখে সুমিষ্ট বর্ম্মীজ গানও শুনলুম; আমি তখনি তখনি তার স্বরলিপি করে নিলুম। সামাজিক সম্মিলনীতে যে কোন সমাজে তার পাসপোর্ট সহজলভ্য। এমন হাসিমুখী, জীবন্ত, প্রাণবন্ত মেয়ে উপস্থিত সবাইকেই প্রাণোবন্ত করে তোলে। প্রাচ্য সমাজের আদর্শ তা হয়ত নয়; কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেটা সর্ব্বত্র আদরণীয়।[304]

অন্যদিকে সরোজনলিনীও সরলা দেবীর মতোই কিছু বিশেষ আচরণকে ‘প্রাচ্য’ বা ‘পাশ্চাত্য’ হিসেবে দাগিয়ে দিলেও তাদের মধ্যে সংশ্লেষের কথা চিন্তা করেননা, বরং সরাসরি ভালো-মন্দের যুগ্মপদে ফেলে দেখতে চান। ফলত ইউরোপীয় আদবকায়দায় অভ্যস্ত যে কোনো জাপানি নারীপুরুষ সম্পর্কেই নেতিবাচক মতামত দেন, যার বেশ কয়েকটি উদাহরণ আমরা এর আগে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। বস্তুত জাপানের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার এক কাঙ্ক্ষিত মডেলকে খুঁজে নেওয়ার অদম্য উৎসাহ চোখে আসে তাঁর সমগ্র কথনে, যেখানে স্বভাবতই পশ্চিমকে বর্জনের মাপকাঠি হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। আবার বিশ শতকের একেবারে প্রারম্ভে, ইন্দুমাধব যখন যাত্রা শুরু করেন ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠতা তথা জগৎব্যাপী শাসনের যোগ্যতা বিষয়ে উপনিবেশিত মনন যখন অনেকটাই দ্বিধাহীন, তখন স্বভাবতই ইন্দুমাধমের মনে হয়েছিল প্রাচ্যের প্রাচীন জাতিগুলির ভবিতব্যই হল ইউরোপের বশ্যতা স্বীকার। ভারতের সঙ্গে নানা বিষয়ে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাচ্যের নানা দেশ সম্পর্কে নানা বিষয়ে সমানুভূতি থাকলেও সভ্যতার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতাকেই বেছে নেন। চীনভ্রমণ তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলেও সেই দেশকে তিনি পরাধীন ভারতের উত্তরণের মডেল হিসেবে কোনোভাবেই দেখেননি। জাপান বা রাশিয়ার মাঝে চলমান যুদ্ধে জাপানের পরাক্রমতার সংবাদ তাঁকে

---

[304]সরলা, দেবী, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

জাপানের শক্তি বিষয়ে উচ্ছ্বসিত করলেও, জাপানকে সভ্যতা তথা প্রগতির বিকল্প মডেল হিসেবে বিবেচনা করার চিন্তা তাঁর আসেনা, যে চিন্তার সচেতন উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী কালে সরোজনলিনীর (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) জাপানকে দেখার মধ্যে। কেদারনাথের স্মৃতিচারণ (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) যা ইন্দুমাধবের প্রায় সমসাময়িক সেখানে জাপানের স্বদেশভক্তি তথা বীরত্ব বিষয়ে নানা মুগ্ধতার বাণী বা ইউরোপীয় আগ্রাসন বিষয়ে নানা তির্যক শ্লেষ উঠে এলেও, এশীয় বিকল্প তথা প্রতিনিধি অনুসন্ধানের আত্মবিশ্বাস ছিল না। বরং সেই কথনের এক বড় তথা বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল স্বশ্রেণি বিষয়ে নানা ব্যঙ্গ- ঔপনিবেশিক প্রভুর দাসত্বে অভ্যস্ত তথা আত্মসমর্পিত বাঙালি চাকরিজীবী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সূক্ষ্ম শ্লেষ। যার সূত্র ধরেই জাপানের সঙ্গে ভারতীয়দের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা-সমালোচনা উঠে আসে। জাপানের অত্যুগ্র দেশপ্রেমের মধ্যে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা রামনাথ এক অনভিপ্রেত উগ্র সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা খুঁজে পান। চিনের রাস্তাতে রামনাথ প্রত্যক্ষ করেন জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিবাদ মিছিল। রবীন্দ্রনাথের পারস্য সফর বিষয়ক লেখাগুলিতেও ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশের পারস্পরিক বিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধপ্রস্তুতি সবমিলিয়ে এক অস্থির পৃথিবীর ছবি ধরা পড়তে থাকে। আমরা বুঝতে পারি এই অভিজ্ঞতাগুলি আসলে এক অশান্ত সময়ের ভাষ্য। যে সময়ে দাঁড়িয়ে 'অবিভাজ্য এশিয়া'-র ভাবনা এক অলীক স্বপ্ন মাত্র। প্রসঙ্গত ইন্দুমাধব তাঁর চিন যাত্রার গোটা যাত্রাপথ জুড়ে সকল জাতির মধ্যে কিছু সাধারণ মানবিক ঐক্যের ছবি দেখেছিলেন, সেই মানবিকতাকেও ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেন হরিপ্রভা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রত জাপানে। বস্তুত এই পর্বের প্রথম কথন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কেদারনাথের *চিনযাত্রী* থেকে সর্বশেষ বৃত্তান্ত হরিপ্রভার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জাপান যাত্রা– এই মধ্যবর্তী সময়কাল আসলে এক ভীষণভাবে বদলাতে থাকা বিশ্বের সাক্ষী, যে বদলের বেশ কিছু আঁচড় ধরা থাকে কথনগুলিরে ছত্রে ছত্রে। আর এই বদলের সাপেক্ষেই ঘটতে থাকে উপনিবেশাশ্রিতের আত্মদর্শনের নানা

দিকবদল। এই দিকবদলেরই বিস্তারিত পাঠ আমরা নিতে চাইব পরবর্তী অধ্যায়ে, ইউরোপ ও এশিয়া এই দুই পর্বের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির প্রকৃতি, উপস্থাপনা, কথনকাঠামো প্রভৃতির তুলনামূলক পাঠগ্রহণের নিরিখে।

চতুর্থ অধ্যায়:

পর্যালোচনা

(১)

ইউরোপ ও এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলির পাঠ বিশদে নিতে নিতে আমরা বুঝতে পারি, ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘ কালপর্বে ভ্রমণের গন্তব্য, অভিপ্রায়, পদ্ধতি এবং অবশ্যই ভ্রমণকারীর লিঙ্গের নিরিখে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কোনো একক বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভব নয়। ভ্রমণকালে বা ভ্রমণশেষে যাত্রীরা কখনই কোনো একমাত্রিক, সমসত্ত্ব অভিজ্ঞতা নিয়েও ফেরেন না। বস্তুত ইউরোপ আর এশিয়ার বৃত্তান্তগুলিকে পাশপাশি রেখে পড়লে প্রথমেই কথনগুলির স্বভাবে বা স্বাদে কিছু মূলগত তফাৎ চোখে আসে। এর প্রধান কারণ অবশ্যই গন্তব্যগুলি বিষয়ে বাঙালি যাত্রীদের মনোভাবের ভিন্নতা। তাই ইউরোপ যাত্রার শুরুতে যেখানে বেশিরভাগ সময়েই সাহেবদের দেশে যাওয়ার এক দীর্ঘ আত্মপ্রস্তুতি বা উৎকণ্ঠার নানা ছবি উঠে আসে সে তুলনায় অনেক বেশি নির্ভার থাকে এশিয়া সফর। প্রফুল্লচন্দ্র যেমন বিলেত যাত্রার তোড়জোরের কথা লেখেন, "শিক্ষানবিশ হিসাবে আমি দুই একটা সস্তা রেস্তোরাঁতে গিয়া কিরূপে 'ডিনার' খাইতে হয় শিখিতে লাগিলাম। বখশিশ পাইয়া তুষ্ট খানসামারা আমাকে দেখাইয়া দিত কিরূপে ছুড়িকাঁটা ধরিতে হয় এবং কখন কীভাবে তাহার ব্যবহার করিতে হয়।[305] জাহাজে উঠে সাহেবী কেতা বা আদবকায়দার সঙ্গে যথাসম্ভব অভ্যস্ত হতে চাওয়ার এই চেষ্টা আরও অনেক কথনেই নজরে আসে। সেইসঙ্গে উঠে আসে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে হাজারো বাঁধানিষেধ, ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়ে জাত খোয়ানোর ব্যাপারে আত্মীয়-বন্ধুদের অনুররোধ-উপরোধ, রাগ-আসন্তোষের কথা।

[305]আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, "পঞ্চম পরিচ্ছেদ", *আত্ম-চরিত* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬০), পৃষ্ঠা-৫৪।

অন্যদিকে এশিয়ার দেশগুলির সম্পর্কে বেশিরভাগ সময়েই যাত্রীরা যেহেতু ঠিক বিদেশসুলভ বিজাতীয় ভাব অনুভব করেননা ফলত যাত্রাকালে বা যাত্রাপূর্বে বিদেশযাত্রার বিধি-বিধান বা অনুমতি আদায়ের বিষয়ে গৌরচন্দ্রিকা রচনার দরকার হয়না। প্রয়োজন হয়না বাহ্যিক তথা বাড়তি আয়োজনেরও।[306] "কলিকাতার বাসার চাকুরে বাবুদের শনিবারের পোশাকেই"[307] তাই দিব্যি চিনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে পারেন কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়। এমনকি ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে সহাবস্থান কালেও যে এহেন কোনো কড়াকড়ি থাকেনা সেই অভিজ্ঞতা রীতিমতো স্বস্তি যোগায় অনেক যাত্রীকেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া সফরকালে, সুনীতিকুমার লেখেন, "...ফরাসি ফার্স্টক্লাসের যাত্রীরা ইংরেজদের মতো কেতা-দুরস্ত নয়- এক মুখ খোঁচা-খোঁচা আ-কামানো দাড়ি নিয়ে বেলা দশটা পর্য্যন্ত শোবার ঢিলে পায়জামা আর জামা প'রে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা বেড়াচ্ছে। কেউ-কেউ আমাদের মতন দিব্যি চটি জুতো প'রেই র'য়েছে- মেয়েরাও অনেকে তাই করে।"[308]

তফাৎ চোখে আসে দুই তরফের ভ্রমণের অন্তিম পর্বেও। ইউরোপ ভ্রমণের কথনগুলিতে, সাহেবদের দেশে গিয়ে সাহেবী নানা কেতায় অভ্যস্ত হয়ে দেশের মানুষের চোখে বদলে যাওয়ার বা স্বজনদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয় বা আশঙ্কাতে অনেক যাত্রীকেই বেশ আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়। তাই যাত্রা শুরুর অংশে যেমন পরিবার ও সমাজের চোখরাঙানি সত্ত্বেও এহেন যাত্রার ঝুঁকি নেওয়ার যৌক্তিকতা বা বৃহত্তর স্বার্থকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ আমরা দেখেছিলাম; তেমনই চেষ্টার ছাপ থাকে দেশে ফিরে আসার সময়েও যেখানে যাত্রীরা সযত্নে নিজের মাটিতে ফেরার ব্যগ্রতাকে তুলে ধরতে চান। বস্তুত পরাধীন জাতির হীনম্মন্যতা বা শাসকের উপর স্বাভাবিক জাতিগত বৈরিতার কারণে খোলাখুলি তাদের রীতিনীতির প্রতি

[306]জাহাজ বিষয়ে যাত্রীদের মনোভাবের ভিন্নতার কথা আমরা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি।

[307]"চিনযাত্রী", পৃষ্ঠা- ২০।

[308]ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৬।

প্রশংসা বা স্বদেশের নিন্দা-মন্দ জনমানসে খুব ভালোভাবে গৃহীত না হওয়ার অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও কোনো কোনো যাত্রীকে হতে হয়। রমেশচন্দ্রের বইটির সমালোচনা লেখার সময় যেমন বেশ একটু তিরস্কারের স্বরেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যেরূপ স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়?"[309] বিদেশে গিয়ে দেশকে ভুলে যাওয়ার বা বিদেশী হাভভাবে অভিভূত হওয়ার এহেন সাধারণ তথা সর্বজনবিদিত অভিযোগ এড়াতে তাই অনেক যাত্রীকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে কলম ধরতে হয়। কৃষ্ণভাবিনী যেমন লেখেন-

> আজ কাল অনেকে বলেন যে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষীয়েরা ফিরিয়া গিয়া কেবল স্বদেশের নিন্দা আর স্বদেশকে ঘৃণা করেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানি না, কিন্তু আশা করি এমন কেহই নাই যে মাতৃভূমিকে ঘৃণা করিবে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহারা ইউরোপে আসেন, তাঁহারা অবশ্য (যাঁহাদের বুদ্ধি আছে) স্বাধীন ও সভ্য দেশে থাকিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন এবং এসকল দেশের বিষয় জানিয়া নিজ দেশের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে পান। এখানে আসিয়া তাঁহাদের চক্ষু খুলে, তাঁহারা যখন স্বদেশের মন্দ অবস্থা ভাবিয়া কষ্ট পান; এবং বোধ হয় সেই জন্য দেশে ফিরিয়া যাইবার পর, তাঁহারা ভারতের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করেন বলিয়াই লোকে তাঁহাদের ঐরূপ অপবাদ দিয়া থাকে।[310]

দেশে ফেরার প্রাক্কালে, দেবেশচন্দ্রেরও চিন্তা হয়- "এখন দেশে ফিরবার সময় সে আকুলতার সঙ্গে উদ্বেগ মিশে যাচ্ছে। এতদিনে না জানি কত বদলিয়ে গিয়েছি, অথচ দেশ যদি

---

[309]"নূতন গ্রন্থের সমালোচনা", পৃষ্ঠা- ৭৯৭।

[310] *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, পৃষ্ঠা- ৩৭।

অভিমানভরে তা না বুঝতে চায়?”[311] আবার এই টেনশনই এক ধরনের উন্নাসিকতার কাজ করে। দেবেশচন্দ্রের মনে হয়, গতিময় ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমুখী বিচ্ছুরণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যবাসীর মনন-চেতনের এই বদল আসলে বিচ্যুতি নয়, একধরনের বিবর্তন অতএব কাম্য। যার মধ্যে দিয়ে ছোঁওয়া যায় ভ্রমণের প্রকৃত কার্যকারিতা তথা উপযোগিতা। তিনি লেখেন-

> কিন্তু আমাকে বদলাতে যে হবেই। ইউরোপের বিচিত্র বহুমুখী প্রাণের সংস্পর্শে এসেও যদি কেহ না বদলায় তাকে জড়পদার্থ বলতে হবে। ইউরোপে কেন, শুধু ভারতবর্ষেই যদি থাকতাম তবু নব নব ভাবসংঘাতে পড়ে কত বদলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই, অথচ প্রত্যহের দেখা সেই পরিবর্তন কারো চোখে ঠেকত না। কোন ভাবধারাই এই ব্যবধানলোপকারী পরস্পরের সংযোগময় যুগে ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর সেই ভাবের আবর্তের মধ্যে থেকে বহুদিন পরে যখন হঠাৎ উঠে আসব তখন সবাই সবিস্ময়ে তাকাবে। তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক হবে যদি কেহ বলে- “আহা! কি সুদৃষ্টান্ত দেশে ফিরে এল বিদেশ থেকে; একটুও বদলায় নি।” এই ধরণের কথা হবে প্রকারন্তরে গতিশীল মনের অপমান। যা আমার হয়েছে তা ত পরিবর্তন নয়, তা পরিণতি।[312]

ভ্রমণজাত বদল যে আদতে ইতিবাচক বিবর্তন- এমন অনুভূতি হয় অন্নদাশঙ্কররেরও। তাঁর কাছে বিদেশ ভ্রমণ একাধারে স্বসত্তা তথা স্বদেশকে চেনা-জানারই গভীরতর পাঠ হয়ে ওঠে। নিজের ইউরোপ যাত্রার শেষে তিনি বলেন, “ভারতকে নতুন আলোকে চিনে নিতে সহায়তা করেছে। সে জন্য আমি ইউরোপের কাছে কৃতজ্ঞ।” জুলি.এফ.কডেল আবার ভারতীয়দের বিলেত যাত্রার

---

[311]দেবেশচন্দ্র দাস, পৃষ্ঠা- ১৩৩।

[312]প্রাগুক্ত।

কথনে প্রায় অবধারিতভাবে উঠে আসা এই দেশে ফেরার অংশের বর্ণনার মধ্যে এক গভীর সামাজিক ব্যঞ্জনা খুঁজে পান। তাঁর মনে হয়, দেশে ফিরে যাত্রীদের যে সামাজিক শুদ্ধিকরণের দাবি মেটাতে হয় তারই সমান্তরালে ভ্রমণের মাধ্যমে হওয়া আত্মশুদ্ধির কথা ফুটে ওঠে শেষাংশের এই বর্ণনাতে যা আদতে ভ্রমণগত উদ্দেশ্যের সাফল্যকেই উদ্‌যাপিত করে, "Indians often described their return home at journey's end, a moment rarely narrated by Western travellers. Indian travel writing evoked the social transgression that was travel itself, so the return must be narrated to create a literary cleansing parallel to the religious ritual cleansing undertaken by Hindu travellers. The return sutured reader and author and defined the trip's "success."[313]

অন্যদিকে এশিয়া ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেই অর্থে বিদেশকেন্দ্রিক বিরূপতার বোধ থাকেনা; বরং অনেক সময়েই দেশগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতারই পরিবর্ধিত অংশ তথা অভিব্যক্তি বলে ভাবার প্রবণতা থাকে। তাই সেসব দেশ থেকে শেখার ক্ষেত্রেও সঙ্কোচ বা বাড়তি সচেতনতার প্রয়োজন হয়না। অথবা বিদেশের প্রশংসা করে লোকনিন্দা কুড়ানোর ভয় থাকেনা। তাই যেখানে ইউরোপ ভ্রমণের প্রায় প্রতিটি কথনে যাত্রীরা তাঁদের দেশে ফেরার ব্যগ্রতা বোঝাতে বৃত্তান্তের শেষ কয়টি পাতা ব্যয় করেন। অথবা জাহাজ থেকে ভারত ভূখণ্ডকে ফিরে দেখার

---

[313]Julie F. Codell, "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives", Source: Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 173-189 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.173, Accessed: 03/06/2013 05:38

আনন্দ-উত্তেজনাকে তুলে ধরেন; এশিয়া ভ্রমণের কথনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমনটা চোখে আসেনা। বরং মন্মথনাথ দেশের মাটিতে পা রেখেই হওয়া বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে পাঠককে শোনান-

> জাহাজ গঙ্গার ঘাটের জেটীতে না লাগায় নৌকাযোগে তীরে আসিতে হয়। সুতরাং একজন ডিঙ্গির মাঝিকে ইঙ্গিত করিলাম। দেখিতে দেখিতে তিন চারিখান ডিঙ্গি জাহাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই আমাকে ডাকিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম যে তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথম আমার ডাক শুনিয়া আসিয়াছে আমি তাহারই নৌকায় চড়িব। তখন মাঝিদের মধ্যে এক তুমুল বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে, সে সর্ব্বপ্রথম আমার ডাক নিয়াছিল। অনন্তর বাক্‌যুদ্ধে যখন কিছুই স্থির হইল না, তখন হাতাহাতি আরম্ভ হইল; ফলে একজন বৃদ্ধ মাঝি ধাক্কা খাইয়া জলে পড়িয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাহার শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মাঝিদের এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে আমি মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণকাল সেখানে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।...যেরূপ ঝগড়া এবং কলহ জাপানে অতি ইতির লোকের ভিতরেও তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও দেখি নাই, আজ দেশের মাটীতে পা দিতে না দিতেই তাহা দেখিলাম। [314]

এবং তিনি নিশ্চিত থাকেন, জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয়দের এই তফাতের প্রকৃত কারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব, তাই দুই দেশের মানুষের মানসিকতার ব্যবধানের সরাসরি তুলনা টেনে তিনি লেখেন,

> মনে মনে ভাবিলাম, যতদিন দেশে সুশিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন আমরা এইরূপ অসভ্যই থাকিব।...তীরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি সহরাভ্যন্তরে যাইতে

---

[314]মন্মথনাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১৬৬-১৬৭।

লাগিলাম। সে দিন রবিবার। দলে দলে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা-পাত্র হস্তে লইয়া রাজ-পথ দিয়া যাইতেছিল। দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কার্য্যক্ষম। প্রকৃত দয়ার পাত্র আট দশ জনও ছিল কি না সন্দেহ। অমনি জাপানী-ভিখারীদের কথা মনে পড়িল। সভ্য জগতে অঙ্গহীন, রোগগ্রস্ত কিংবা বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষম লোক ব্যতীত কেহই ভিক্ষাকে জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা বলিয়া অবলম্বন করে না। জাপানীরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন বলিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ করিতে তাঁহারা হেয়জ্ঞান করেন। হে শিক্ষিত মহোদয়গণ, আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। দেখিবেন, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জাতি এবং ব্যক্তিগত সমস্ত দোষই একে একে তিরোহিত হইবে।[315]

সরোজনলিনীর ক্ষেত্রেও আমরা খেয়াল করি, গোটা কথন জুড়েই, স্বদেশপ্রেম থেকে সহবত- বহু বিষয়ে যে ভারতের জাপানের কাছ থেকে শেখা উচিত সে কথা বারংবার নির্দ্বিধাতেই জানান তিনি।

আবার ভিন্নতার এই অভিজ্ঞতা যে শুধু গন্তব্যভিত্তিক তা কিন্তু নয় বরং একই গন্তব্য বিষয়েও অনেক সময় যাত্রীদের অনুভব থাকে অনেকত্বে ভরা। বস্তুত আমাদের আলোচনার পরিসর জুড়ে যে সময়কাল রয়েছে সেই উনিশ-বিশ শতক, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুই-এর নিরিখেই এক যুগান্তরের ইতিহাস। যার সাক্ষী আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিও। প্রসঙ্গত ইউরোপ যাত্রার কথনের আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছি, উপনিবেশক বিষয়ে উপনিবেশিতের ধারণা বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বদলের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ভ্রমণকারীদের পর্যবেক্ষণের চরিত্রেরও ভোলবদল ঘটেছে। এবং এই বদলের ধারা বজায় থেকেছে গোটা ঔপনিবেশিক কালপর্ব জুড়েই। অষ্টাদশ শতকে ইতেসামুদ্দিনের বিলেত যাত্রাকে যেমন মেলানো যায়না উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালিদের ইউরোপ যাত্রা

---

[315]প্রাগুক্ত।

বিষয়ে উৎসাহের আতিশয্যের সঙ্গে তেমনই আবার বিশ শতকের বৃত্তান্তগুলিও প্রকৃতিগতভাবে বহু বদলের চিহ্ন ধারণ করে। সভ্যতা আর সাম্রাজ্যবাদকে অভিন্ন করে দেখার যে ধারণা তথা প্রবণতায় উনিশ শতকীয় কথনগুলি আচ্ছন্ন ছিল পরবর্তী শতকের আখ্যানগুলি (বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ যাত্রার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বৃত্তান্তগুলি) সে সম্পর্কেও ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে। তাই, ব্রিটিশ ন্যায়নীতি বিষয়ে পূর্ণ আস্থাশীল ত্রৈলোক্যনাথ যেমন ভারত এমনকি গোটা বিশ্বকে শাসনের ক্ষেত্রেই ইংরেজদের থেকে বেশি সুযোগ্য কোনো বিকল্প খুঁজে পাননি। ব্রিটিশ সুশাসন-সুশিক্ষার ধারক-বাহক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য এবং তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যে ভারতবাসীর কর্তব্যের মধ্যেই বর্তায় সেই বিষয়ে সংশয়াতীত হয়ে তিনি বলেছিলেন, "যে কোনও উপায়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান দরকার মনে করি, কারণ এই বিরাট শক্তি- যে শক্তি পৃথিবীর চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা ধ্বংস হইলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হইবে, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে যে বিপৎপাত ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিপৎপাত ঘটিবে, এমন কি সভ্যতাকেই ইহা কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দেবে।"[316] বিশ শতকে যুদ্ধধস্ত ইউরোপের প্রতি পূর্ববর্তী এই অখণ্ড আস্থা কিন্তু ক্রমেই নড়বড়ে হয়েছে, তাছাড়া উপনিবেশিত মননে জাতীয়তাবাদ যত ডালপালা বিস্তার করেছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা যত গভীর হয়েছে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকরকে, শাসকের ঔদ্ধত্য তথা প্রশ্নহীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে সওয়াল-জবাব করার আত্মবিশ্বাসও তত দৃঢ় হতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের উগ্র প্রকৃতি সম্পর্কেও। ইউরোপ বা এশিয়ার নানা প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে রামনাথ বিশ্বাসের যেমন মনে হয়, "পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল অনেক অসৎ দোষের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য কোনও জাত অথবা কোনও ধর্ম দায়ী

---

[316]ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৫।

নয়। দায়ী পুঁজিবাদ।”[317] এবং খোদ ইউরোপের মাটিতেই যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ শক্তি তথা বিকল্প হিসেবে সাম্যবাদ মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে- অনেক কথনই সেই ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে। কমিউনিজমের নতুন আদর্শকে কেন্দ্র করে এই উৎসাহ রাশিয়া, জার্মানী, স্পেনের মতো দেশগুলির প্রতি কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছে। ফলত বাঙালি মননে প্রধানত ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র কড়ে গড়ে তোলা ইউরোপের ছবিতেও ক্রমশ জায়গা করে নিতে শুরু করেছে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি। কমিউনিজমের দীক্ষা নিতেই ইউরোপ পাড়ি দেওয়া সৌমেন্দ্রনাথের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন থাকে বার্লিন বা মস্কোর মতো শহর। প্যারিসের বিষয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সপ্রশংস বর্ণনার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল থাকেনা তাঁর কথনের। প্যারিসের সঙ্গে বার্লিনের তুলনা টেনে তিনি লেখেন-

> প্যারিসে দিন সাত আট কাটিয়ে গেলুম বার্লিনে। কী আশ্চর্য প্রভেদ এই দুটি শহরের চেহারায় ও হাবভাবে! প্যারিস সুন্দর, অগোছালো, নোংরা, বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বার্লিন ধূসর, গোছালো পরিষ্কার, কর্ম-কঠোর রুদ্রমূর্ত্তি। প্যারিস যেন নটী, তার চেহারায় রসের দুর্বলতার ছাপ সুস্পষ্ট। বার্লিন যেন ধ্যানী তপস্বী, তার দৃষ্টি, চেহারা সব যেন জ্বলছে ধ্যানের আগুনে। অন্তরে যেন কি খুঁজে ফিরছে, সেই ভয়ংকর খুঁজে ফেরার রুদ্রতা তার চোখে মুখে। প্যারিসের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তার সৃজনী শক্তি তলানিতে এসে পৌঁচেছে। অন্তরে সে দেউলে তাই এতো ঘটা বাইরে। বার্লিনে, সে সৃষ্টির বীর্যে ভরা, অন্তরে তার অহরহ সৃষ্টিপরীক্ষা চলছে তার রস ও চিন্তার অফুরন্ত মিশ্রণে। তাই শুধু বাইরেটাকে সাজাতে গোছাতে সে ব্যস্ত নয়।[318]

[317]ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ, পৃষ্ঠা- ১৬০।

[318]সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১৩০।

গন্তব্যকে ঘিরে অনুভবের এই বিভিন্নতা সম্পর্কে একই কথা বলা চলে এশিয়ার নানা দেশের বিষয়ে কথনগুলির ক্ষেত্রেও। একদিকে যেমন ভ্রমণের উদ্দেশ্য বদলায় এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাপেক্ষে; তেমনই একই গন্তব্য বিষয়েও অভিজ্ঞতার ধাঁচা বদলাতে থাকে ব্যক্তিবিশেষে বা সময়ের নিরিখে। যে চোখে সরোজনলিনী জাপানকে দেখতে চান সেভাবে দেখেননা রবীন্দ্রনাথ। জাপানিদের যে স্বদেশপ্রীতি দেখে সরোজনলিনী মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার ভেতরে খুঁজে পান অন্ধ জাতীয়তাবাদের অশনি সঙ্কেত। উনিশ শতকের প্রারম্ভে, কেদারনাথ বা ইন্দুমাধবের দেখা অতীত ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রাখতে চাওয়া চিনের সঙ্গে কিছুতেই মেলেনা দুই-তিন দশক পরের রবীন্দ্রনাথ বা রামনাথের চিন ভ্রমণ। কিছু ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনের সুফল বিষয়ে ইন্দুমাধব যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অটল আস্থাকে খণ্ডন করেই সরোজনলিনী ভারতবাসীর সামনে জাপানকে উন্নতির বিকল্প মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। যাত্রার অভিপ্রায় অনুপাতেও বদল ঘটে অভিজ্ঞতার অভিমুখের। তাই হরিপ্রভা তাকেদা তাঁর জাপানি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে দেশের দৈনন্দিন যাপনের ছোট-বড় নানা খুঁটিনাটির বা ঘর-গেরস্থালির হালহদিশ যেভাবে দেন, বর্ণনার সেই বিস্তার স্বভাবতই পাওয়া যায় না অন্য কথনগুলিতে। ঠিক যেমন, বিমল মুখার্জী বা রামনাথ বিশ্বাসের সাইকেলে চেপে ইউরোপ, এশিয়ার পথে পথে চষে বেড়ানোর অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে মেলানো যায় না বাকি বৃত্তান্তগুলির মেজাজকে। দুর্গাবতী, কৃষ্ণভাবিনী, সরোজনলিনী, হরিপ্রভার দৃষ্টিকোণ আবার এমন অনেক পরিসরকে (বিশেষত গন্তব্য দেশের নারী সমাজ সম্পর্কে) ছুঁয়ে যায় যা চোখে আসেনা পুরুষ যাত্রীদের লেখনীতে। সরোজনলিনী বা কৃষ্ণভাবিনী সবিস্তারে তুলে ধরেন নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা বিষয়ে নানা সযত্ন পর্যবেক্ষণ। শুধু তাই নয়, সেখানে উঠে আসে অন্দরমহলের এমন অনেক আপাত 'তুচ্ছ' বিষয় যা অনুপস্থিত থাকে পুরুষদের কলমে। জাপানে গিয়ে হরিপ্রভা বা সরোজনলিনীর কথন তাই শুধু জাপানের নারীদের গুণাবলী পেশ করেই সমাপ্ত

হয়না, সেখানে থাকে তাদের বেশভূষা থেকে শুরু করে আচার-আচরণ, রন্ধনপ্রথা প্রভৃতি ছোট-বড় সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর। হরিপ্রভা জাপানের দৈনন্দিন ঘর-গৃহস্থালিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুবাদে, সযত্নে বর্ণনা করেন সেদেশের ভাত রাঁধার, স্নান করার, চুল বাঁধার নানা পুঙ্খানুপুঙ্খ আখ্যান। দুর্গাবতী ব্যবচ্ছেদ করে দেখান ভারত আর ইংল্যান্ডের নারীদের সাংসারিক জীবন বা শ্রমবণ্টনের নানা ভেদ। অভিজ্ঞতার এই রকমফের, দৃষ্টিকোণের বহুত্ব, লিঙ্গভিত্তিক বিশিষ্টতা, সময় তথা গন্তব্যের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বদল তথা ভিন্নতা আসে কথনভঙ্গিমা বা উপস্থাপনশৈলীতেও। যদিও ইউরোপ এবং এশিয়া যাত্রার বেশিরভাগ কথনেই যাত্রা শুরু থেকে শেষের নানা পর্বের মাঝে কাঠামো বা আঙ্গিকগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। যাত্রীরা মূলত চিঠি, ডায়েরি বা দিনলিপি অথবা প্রবন্ধের আকারে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন। এবং জাহাজ যাত্রা থেকে গন্তব্যে পা রাখা থেকে প্রত্যাবর্তন- আপাতভাবে এই ছক বা ক্রম মেনেই অধিকাংশ বৃত্তান্তগুলি লেখা হয়। তবে, বিদেশ যাওয়া ও বৃত্তান্ত লেখার বহর যত বাড়তে থাকে সংরূপ সম্পর্কে পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্তও (হরাইজন অফ এক্সপেকটেশন) বদলাতে শুরু করে। তাই ইউরোপ যাত্রার প্রথম দিককার বেশিরভাগ লেখায় আমরা যেমন দেখেছিলাম, নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে সমুদ্রপথের বিবরণ, জাহাজের গঠন, দৈনন্দিন রুটিন থেকে শুরু করে বিদেশবাসের নানা খুঁটিনাটি, সেখানকার যাবতীয় ছোট-বড় দ্রষ্টব্য, রীতিনীতি, নিয়মকানুনের যথাসম্ভব বিশদ ব্যাখ্যান তুলে ধরার প্রবণতা। বিশ শতকে দেশবাসীর বা আগামী দিনের যাত্রীদের জ্ঞানবৃদ্ধির সেই 'গুরুদায়িত্ব' থেকে লেখকদের কিছুটা হলেও রেহাই মেলে। তাই ত্রৈলোক্যনাথ বা কৃষ্ণভাবিনী যেমন শুরুতেই সচেতনভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন কোনোরকম সাহিত্যসাধনা নয় বরং দেশের সাধারণ মানুষ বা বিলেত আসতে ইচ্ছুক বঙ্গযুবাদের কথা ভেবে বিদেশবাসের তথ্যনিষ্ঠ ভাষ্য পেশই তাঁদের বই-এর মূল উদ্দেশ্য; অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবেশচন্দ্র দাস বা দুর্গাবতীকে বিদেশযাত্রার বিষয়ে তেমন গাইডবুকসুলভ

তথ্য পেশ করতে হয়না।[319] সংরূপগত পরিবর্তন তথা বিবর্তনের দিক থেকে ভাবলে তাই বাঙালির ইউরোপ ভ্রমণের কথন অনেকাংশেই ‘মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত’ থেকে ‘ভ্রমণ সাহিত্য’ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা বহন করে।[320]

(২)

বক্তব্য বা আঙ্গিকের দিক থেকে নানাবিধ অসমসত্ত্বতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালির বিদেশ ভ্রমণের কথনগুলিকে যদি কোনো একটি সাধারণসূত্রের নিরিখে পাঠ করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে বলতে হয় প্রতিটি ভ্রমণই কোনো না কোনোভাবে উপনিবেশিত আত্মের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে যেখানে ভ্রমণের সমান্তরালে উঠে আসে স্বজাতি বিষয়ে নানা তুলনা, আলোচনা, সমালোচনা – বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকে আত্মসমীক্ষণ।

বস্তুত ইউরোপ এবং এশিয়া ভ্রমণের নানা দিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম, পরধীন জাতির কাছে ভ্রমণ যে আদতে স্বদেশ উন্নতিরই পাথেয় সে কথা অনেক যাত্রীই তাঁদের

---

[319] এই বিষয়টির উপর ইতিমধ্যেই আমরা বিশদ আলোচনা করেছি ইউরোপ ভ্রমণের আলোচনার সময়ে।

[320]অবশ্য প্রথম পর্বের বা উনিশ শতকের সকল কথনই যে সময়ের সরলরৈখিক সরণ মেনে সহজ ভাষার সবিস্তৃত বর্ণানা দেয় আর বিশ শতকের কথনগুলি দেয় না, এমন স্থূল বিভাজনের দাবি অবশ্যই আমরা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ (প্রথম দুইবারের যাত্রা উনিশ শতকে, বিশ শতকেও তাঁর অসংখ্যবার নানা সূত্রে বিদেশ ভ্রমণ এবং সেই বিষয়ে লেখালেখিগুলি) বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতা আর অনুভবের শৈল্পিক প্রকাশ আর ব্যঞ্জনাময় নানান টীকাটিপ্পনী ভরা লিখন কোনো গতানুগতিক ধারা মেনে রুটিনমাফিক চলে না। একই কথা বলা চলে বিবেকান্দের লেখার বিষয়েও।

কথনের সূচনা পর্বেই দাবি করেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি বিশেষ নজর কাড়ে তা হল ভ্রমণের মাহাত্ম্য বিষয়ে সচেতন তথা সরব যাত্রীরা প্রায়শই তাঁদের যাত্রাকে তীর্থস্থান দর্শনের নামান্তর হিসেবে উপস্থাপন করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন শেক্সপীয়রের জন্মভূমি দর্শনের কথা বলেন তখন তাতে তীর্থমাহাত্ম্যে উদ্বেল ভক্তের আবেগ বা আকুতির কমতি থাকে না। একইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র জার্মানীর গবেষণাগার ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতাকে তথা উত্তেজনাকে বাঙ্ময় করতে সরাসরি তুলনা টানেন পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দর্শনের সঙ্গে-

> ...বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন ও তত্রস্থ উপাসক ও পুরোহিতদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও চিন্তাবিনিময় করিবার জন্য আমি ইউরোপে আসিয়াছি। বলিতে কি, রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ আমার মনে বড় একটা সম্ভ্রমের উদয় হইল না। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজ ইহা অপেক্ষা বিশাল, এবং মনের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক্ করে। কিন্তু শীঘ্রই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি তীর্থযাত্রী- যখন আমার পাণ্ডা অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া কে একে সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন, যখন প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন কাচের আধারের (Glass case) মধ্যে যত্নে সংরক্ষিত যে সমস্ত যন্ত্র রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ডেভী ও ফারাডে অনেকগুলি যুগান্তরসংঘটনকারী আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলান", ইত্যাদি,- তখন আর ভক্ত প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না, ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়ীলেন। বাস্তবিক যখন তীর্থযাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথের দর্শনলাভ করেন, তখন কি মূর্ত্তি কদাকার বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিন্দা করিতে বসেন, না ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন?[321]

জামাই উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত পাড়ি দেওয়ার আগে, রাজনারায়ণ বসুর শুভেচ্ছাবার্তাতেও উঠে আসে তীর্থভ্রমণের উপমা, 'Go, Son belov'd! As pilgrim bold to lands/ Beyond

[321]"ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চা: প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র", *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩১২, পৃষ্ঠা- ২৫।

the stormy ocean’s wide domain.”[322] বস্তুত উপনিবেশিত মননে জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্বাধীনতা-প্রগতির চূড়ান্ত পরকাষ্ঠা হিসেবে মনোনীত ইউরোপ বা ইংল্যান্ড যাত্রাকালেই যে কেবল তীর্থযাত্রার অনুভূতি জাগে তা কিন্তু নয়, এশিয়ার নানা দেশে ছড়ানো প্রাচীন ভারতের নানা চিহ্নকে চাক্ষুষ করে ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরির সুযোগকেও রবীন্দ্রনাথের তীর্থভ্রমণের থেকে কোনো অংশে কম মনে হয় না। ইন্দোনেশিয়া যাত্রার প্রাক্কালে তিনি লেখেন,

> ...ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপ সকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাস-চিহ্ন দেখবার জন্য আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।[323]

বস্তুত তীর্থবিষয়ক অনুষঙ্গ বা উপমার এই বারংবার ব্যবহারকে নিছক শব্দের শিথিল প্রয়োগ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়না, বরং একে পড়া বা বোঝা দরকার প্রাক-ঔপনিবেশিক ঘরানার তীর্থভ্রমণ মাহাত্ম্যেরই প্রক্ষেপ হিসবে যা নব্য বাঙালির মনে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের দেশ বেড়ানোর অ্যাডভেঞ্চার পড়ে গড়ে ওঠা ভ্রমণের ‘নতুন’ ডিসকোর্সেও দিব্যি জায়গা করে নেয়। এবং প্রায়শই কালাপানি পেরিয়ে বিদেশ যাত্রার বিষয়ে হিন্দু সমাজের চোখরাঙানি বা কুসংস্কারকে প্রতিহত করার সুচারু পন্থা হয়ে উঠতে চায়। ঝালিয়ে নিতে চায় তীর্থমাহাত্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্যটিকে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লেখেন,

---

[322]রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা – ১১২।

[323]“জাভা-যাত্রীর পত্র” (১নং পত্র), পৃষ্ঠা- ৫০৩।

> কে বলে বিলাতে তীর্থযাত্রা নাই? কে বলে বিলাতে তীর্থ নাই? সর্ব্বত্রই প্রতিভার আদর ও সম্মান আছে। তীর্থযাত্রার মূল কুসংস্কার নহে; মৃত প্রতিভার সহিত কথোপকথন। এখন ভারতে তীর্থের মহিমা বিলুপ্ত হইতে পারে, তীর্থযাত্রার প্রকৃত অর্থ চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূলে এই বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম। তীর্থযাত্রা ভবিষ্যতের মঙ্গলপ্রার্থনায় নয়, ইহা বর্ত্তমান পূজা-জড়িত ভালবাসার মতন। যখন এই ভক্তি ও প্রেম চলিয়া যায়, তখন তীর্থযাত্রা আর তীর্থযাত্রা নহে।[324]

আমরা বুঝতে পারি কীভাবে গতানুগতিক ধারণায় সংযোজন ঘটে নতুন ব্যঞ্জনার যা তীর্থকে নিছক ধর্মীয় অভিব্যক্তিতে আবদ্ধ রাখার অভ্যাস ভেঙে জ্ঞানার্জন বা জ্ঞান-গুণের কদরকেই প্রকৃত পুণ্যার্জন বলে চিহ্নিত করতে চায়। তীর্থভ্রমণে দেবভূমি দর্শনের মাধ্যমে পাপস্খালন বা আত্মশুদ্ধির মতোই এই 'আধুনিক' ভ্রমণ-ও যে ভিন্নতর তথা উন্নততর জাতিদের সংস্পর্শে-সংযোগে এসে পরাধীন জাতির আত্মোন্নতির বা দুরবস্থা মোচনের অন্যতম নিদান হতে পারে– এহেন বিশ্বাসের ঝলক বারেবারেই চোখে আসতে থাকে। অবশ্য ভ্রমণ শুধু নিরবচ্ছিন্ন আত্মসমালোচনার যোগান দেয় বা স্বজাতি বিষয়ক সমালোচনাগুলিকেই দৃঢ় করে এই কথা ভাবলে ভুল হবে। বরং আমাদের আলোচনার একেবারে শুরুতেই "প্রস্তাব" অংশে আমরা উপনিবেশ বিস্তারের পর্বে, ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের ইউরোপ বহির্ভূত বিশ্বে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে আত্মকে ক্ষমতায়িত করার যে প্রয়াস তথা প্রবণতার কথা বলেছিলাম, তার বিচ্ছুরণ চোখে আসে উপনিবেশিতের ভ্রমণ পর্বেও। ভ্রমণের সক্রিয় অভিব্যক্তি অনেক সময়েই শাসিত জাতিকে তার নিজের সম্বন্ধে শাসকের দাগিয়ে দেওয়া নানা অপারতা, অনগ্রসরতা এবং

---

[324]দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭৩২।

আত্মবিষয়ক নানা অপর্যাপ্ততার বোধকে অতিক্রম করার সাহস যোগায়। প্রসঙ্গত রঁলা বার্থ তাঁর *Mythologies*[325] বইতে দেখান মিথ তার বয়ান রচনা করে পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করে, যাবতীয় ইতিহাস তথা বাস্তবকে দূরে সরিয়ে রেখে বা বলা যায় তাদেরকে বিস্মৃত করতে চেয়ে। কারণ তার প্রধান অভীষ্টই হল এক স্বাভাবিকতার পোশাকে মোড়া কথন তৈরি যা ক্ষমতাসীন পক্ষ, শ্রেণি বা গোষ্ঠীর অবস্থানের স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে পারে। এবং জনমানসে এই ক্ষমতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন মান্যতাকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে তুলতে পারে। ঠিক এভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিষয়ে আনুগত্য অটুট রাখতে, শাসিত জাতির মনেও ক্রমাগত শাসক বিষয়ক নানা ভয় মিশ্রিত ভাবনা বা বিশ্বাস আরোপিত করার চেষ্টা চলে। ভারতীয় জনমানসে প্রোথিত ইংরেজ শাসকদের বিষয়ে এহেন নানা 'অদ্ভুত' ভাবনার কথা যেমন লেখেন কৃষ্ণভাবিনী। বাল্যকালে 'ইংরেজ' নামক শব্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কথা জানিয়ে তিনি বলেন

> আমি তখন আগ্রহে কত লোককে উহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ আমার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিল- "মেয়ের কথা শোন! ইংরেজরা কি মানুষ যে, তাদেরও আমাদের মত হাত পা আছে, তাহারা যে চন্দ্র নক্ষত্রদের সঙ্গে ঐ আকাশে বাস করে। আর একজন বলিলেন,-"আরে বাছা, তুমি হাস্‌ছ কি? ঐ অমুক লোকে দেখে এসেছে, তাদের গা টিপ্‌লে মদ পড়ে, আর চল্‌লে সোণা ঝড়ে। তারা এক কথায় কত রাজা মহারাজাকে ভিখারী কর্‌তে পারে, বন কেটে নগর বসাতে পারে।" আর এক মহিলা বলিলেন,-"ইংরেজরা নিশ্চয়ই আমাদের মহাভারত রামায়ণের দেবদেবীদের নাতি-পুতি, তা' নইলে, কি মানুষে কখনও অমন কাজ করিতে পারে?" এইরূপ নানা লোকের নানারূপ বর্ণনায়, বাল্যকালে ইংরেজজাতিকে যে রকম ভাবিয়াছিলাম, শৈশবের সঙ্গেই আমার সে কল্পনা-

---

[325]Roland Barthes, *MYTHOLOGIES*, Annette Lavers (Trans.) (New York: The Noonday Press, 1991).

> দৃশ্য তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু বড় হইয়া, আমাদের দেশের সাধারণ লোককে চিরজীবন ঐরূপ মিথ্যা ভেল্কিতে মুগ্ধ দেখিয়া, আমি যারপরনাই মনস্তাপ পাইতেছি।[326]

বস্তুত ভ্রমণ কথনগুলির পাঠ নেওয়ার সময় আমরা বুঝতে পারি কীভাবে ভ্রমণের সূত্র ধরে, ঔপনিবেশিক আবহের ক্ষমতার বিসম বিন্যাসের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজ তথা ইংল্যান্ড সম্পর্কিত অনেক বিশ্বাসকেই 'আজগুবি' বলে শনাক্ত করা যায়। ফলত শাসকশ্রেণিকে ঘিরে তৈরি হওয়া 'মিথ'-দের খণ্ডন করারও উপযুক্ত পরিসর গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে আসার পর ইংরেজদের সম্পর্কে নিজের ভাবনাগত পরিবর্তন বিষয়ে কৃষ্ণভাবিনী যেমন বলেন, "আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় একটা পুরাণ কথা আছে, 'যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বর ঘরুণী';- বাস্তবিক এ কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি। কোন ব্যক্তি বা জাতির সঙ্গে ঘর না করিলে তাহার উপরভিতর ভালমন্দ কখন সম্যকরূপে বুঝা যায় না।"[327] আমরা বুঝতে পারি, তাঁর ছোটবেলার 'বিলাত-ভেল্কি' বড়বেলার বিলেত ভ্রমণের পর কেমন ফিকে হয়ে যায় এবং বিলেত বিষয়ে এই সমস্ত 'মিথ্যা ভেল্কি'-তে না ভুললে তবেই যে পরাধীন জনগণের মনে দেশের জিনিসের প্রতি কদর জন্মাবে সে কথাও লেখিকা জানাতে ভোলেননা-

---

[326]কৃষ্ণভাবিনী দাস, "বিলাত-ভেল্কি", *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (মূল প্রবন্ধটি সাহিত্য, কার্ত্তিক-চৈত্র ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত), অরুণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪), পৃষ্ঠা- ৭৯৯।

[327]কৃষ্ণভাবিনী দাস, "ইংরেজ সমাজ", পৃষ্ঠা- ২৫।

আমাদের ভারতীয় ঢাকাই কাপড়, বিলাতী ঢাকাইয়ের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ; আমাদের কাশ্মীরী শালের পায়ের কাছেও পেশলির কলের তৈরী শাল দাঁড়াইতে পারে না; তথাপি, আমরা নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ভুলিয়া, ঐ সব নিকৃষ্ট দ্রব্যের অধিক আদর করি। আর যে সব আম, কুল ও সন্দেশকে আমরা বিলাতী নামে সম্ভাষণ করি, তাহারা যে জন্মেও কখনও ইংলণ্ড দেখে নাই, সে সকল যে আমাদের ভারতবর্ষেই উৎপন্ন বা ভারতীয়ের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, একথা অন্যকে জানাইতেও আমাদের যেন অপমান বোধ হয়!

ইংরেজরা যেমন ষাট হাজার সৈন্য দ্বারা, চব্বিশ কোটী ভারতবাসীর মনে ধাঁধা লাগাইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য সকল কাজেও ধূমধাড়াক্কা ও নিজেদের ক্ষমতা দেখাইয়া আমাদের চোখ ঝলসিয়া দিয়াছে। আমরা যেন নিজের দেশকে বিদেশীর চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, দেশের কিছুতেই আমাদের প্রকৃত আস্থা নাই ও গ্রাহ্য নাই। আমাদের মন ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে ঘুরিতেছে, আমাদের হৃদয় ইংরাজী ভাবের দিকে ছুটিতেছে, আমাদের রীতিনীতি ইংরাজী রঙে রঞ্জিত হইতেছে।...আমাদের দেশের লোকেদেরও যে মহত্ত্ব আছে, এ সব যেন দেখিতে বা ভাবিতে আমাদের গায়ে কাঁটা ফোটে! এমনই আমাদের বিলাত-ভেল্কি![328]

আমরা বুঝতে পারি, ইউরোপের স্বনির্মিত সভ্যতা তথা শ্রেষ্ঠতার ধারণা যে বিষয়ে উপনিবেশিত মননকে সম্মোহিত করা হয় রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, ভ্রমণজাত নানা বিরূপ বিসদৃশ অভিজ্ঞতার চাপে সেই সম্মোহনকে কীভাবে অনেকসময়েই সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এবং শাসক বিষয়ে এই পুনর্মূল্যায়ণ আদতে পরাধীন জাতির আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়; ফলত নিছক বাহ্যিক চাকচিক্যে অভিভূত না হয়ে স্বদেশ-স্বজাতির ‘মহত্ত্ব’-গুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত বিলেত ভ্রমণের বৃত্তান্ত লেখা যে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ জাতি বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরি বা বলা ভালো বেঠিক ধারণা ভাঙার বিষয়ে একান্ত জরুরি, সে কথা লেখেন বঙ্কিমচন্দ্রও। ইংরেজ তথা ইংরেজিকে ক্ষমতার সঙ্গে সমার্থক হিসেবে

---

[328]“বিলাত-ভেল্কি”, পৃষ্ঠা- ৭৯৯।

ভাবতে শেখা পরাধীন মনে বিলেত ভ্রমণ যে ইংরেজ সমাজের সামগ্রিক ছবিটি তুলে ধরতে পারে, সে বিষয়ে তিনি একপ্রকার নিশ্চিত থাকেন, "...অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না সাহেব কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল বাঁধিবে?"[329] সাধারণের মনে বাসা বাঁধা এহেন ধারণাকে ভাঙার এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে যেন ক্ষমতার সঙ্গে শাসকের ওতপ্রোত অবস্থানকে উৎপাটনের প্রচ্ছন্ন ইশারা ধরা দিতে থাকে। বস্তুত ইউরোপ ভ্রমণের কথনগুলি আলোচনা করার সময়েই আমরা টের পেয়েছি, বাঙালির বিলেত ভ্রমণ আসলে অনেকটাই আজন্ম দেখা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের ঠোকাঠুকি লাগার গল্প। যেখানে বই-এ পড়া তথ্যগুলিকে প্রায় তালিকা মিলিয়ে দেখার প্রয়াসের মধ্যেই তালিকা বহির্ভূত নানা জিনিসও সামনে এসে পড়ে। ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই গন্তব্য বিষয়ে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও সেইসুবাদে গড়ে ওঠা নানা অনুমান তথা আকাঙ্ক্ষার হিসেবপত্রও চলতে থাকে। প্রথমবার ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রেখে রবীন্দ্রনাথ যেমন লেখেন-

> ইংলণ্ডে আসার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে, তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়।[330]

---

[329]প্রাগুক্ত।

[330]"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" (দ্বিতীয় পত্র), পৃষ্ঠা- ৮০৩।

কথনগুলি পড়তে পড়তে আমরা খেয়াল করি, পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা যা ভ্রমণকারীরা নিজেদের চিন্তা-চেতনায় লালন করেছিলেন তার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফারাক অনেক সময়েই শাসক বিষয়ক মূল ভাবনগুলিকে শুধু বদলায় না বরং পুরোপুরি বিনির্মিত করতে শুরু করে। সিমন জিকান্দি যেমন বলেন, "cultures produced on the margins of a dominant discourse might actually have the authority: not only to subvert the dominant but also to transform its central notions" [331] আবার এই ধারণা বদলের বাস্তব অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপকে ঘিরে ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলা ভাবনা তথা আবেগকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও চলে। অন্নদাশঙ্কর যেমন ইউরোপ থেকে ফেরার সময় লেখেন, "বললুম, আবার আসব, ভয় কী! কতই বা দূর! জলপথে পনের দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাতদিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে এক মুহূর্ত।"[332] আমরা বুঝতে পারি বাঙালির ইউরোপকে ঘিরে জন্ম নেওয়া যে উত্তেজনাপ্রবাহ সেখানে চাক্ষুষ ভ্রমণের সঙ্গেই ওতপ্রোত থাকে মানসভ্রমণ। এবং ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি আদতে হয়ে ওঠে বাস্তব ও কল্পনার যুগলবন্দী- অনুমান আর অভিজ্ঞতার এক মধ্যবর্তী পরিসর। ডানকান এবং ডেরেক গ্রেগরীকে অনুসরণ করে বলা যায়, "Travel writing as an act of translation that constantly works to produce a tense 'space in-between'"[333] এবং এই 'space in-between'-এর পরিসরে দাঁড়িয়ে শাসক জাতি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ করার এমনকি কোনো কোনো বিষয়ে স্বজাতিকে এগিয়ে রাখতেও পারা যায়। আর

---

[331]Simon Gikandi, *Maps of Englishness: Writing Identity in the Culture of Colonialism*, (New York : Columbia University Press, 1996), পৃষ্ঠা- xv.

[332] অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা- ১০০।

[333]James Duncan and Derek Gregory, (Ed.), "Introduction", *Writes of Passage: Reading Travel Writing* (London and New York: Rouledge), পৃষ্ঠা- 8.

আত্মপ্রকাশের এই সম্যক অধিকারে শাসিত জাতি নিজের অবস্থানকে ক্ষমতায়িত করার সাহস দেখাতে পারে। ইংল্যান্ডের সমাজের মদের নেশা বা তাদের স্বার্থপরতা বা বহির্বিশ্ব বিষয়ে সাধারণ ইংরেজদের জ্ঞানের অগভীরতা বিষয়ে নানা সমালোচনা সেই সাহস তথা আত্মবিশ্বাসেরই সাক্ষী থাকে। ব্রিটিশদের সার্বিক গুণাবলীর বিষয়ে মুগ্ধ হয়েও ত্রৈলোক্যনাথের যেমন মনে হয়,

> ...দরিদ্রের প্রতি আমাদের ব্যবহার ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভাল। আমাদের বিভিন্ন জাতি বা অবস্থার লোকদের পরস্পরের ভিতর একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ আছে। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ নাই। আমাদের ধর্মে হিতব্রতকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করা হয়, সামাজিক দায়িত্ব মনে করা হয় না। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ও ন্যায়ের বোধ, বৈষয়িক হিসাবে তাঁহাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নৃপতি, বণিক, এবং ধনী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐশ্বর্য তাই ইউরোপের মত সম্ভ্রম লাভের অধিকারকে একচেটিয়া করে রাখে নাই।[334]

এবং জাতিভেদ থাকা ভারতীয় সমাজের যৌথতার বোধ বা কৌমজীবন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি নিবিড় এবং আন্তরিক সেই বিষয়েও তিনি নিশ্চিত থাকেন,

> আমাদের জাতিভেদ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে পরস্পর যে সমবেদনাবোধ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ইউরোপে তাহা নাই। পল্লীগ্রামে বিভিন্ন জাতি ও অবস্থার লোকদের ভিতর আমরা যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করি তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। বিপদে আপদে

---

[334] ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭।

> পরস্পরকে ইহারা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পরস্পরে একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লয়, এবং ভাই, দাদা, চাচা, ইত্যাদি সম্বোধন করে।[335]

এবং ভারত তথা বাংলার তথাকথিত অনগ্রসর সমাজ তথা পল্লিজীবন থেকেই যে ইংরেজরা কীভাবে আর্থিক সঙ্গতি বা সামাজিক মর্যাদার উর্দ্ধে উঠে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হয় সেই শিক্ষা নিতে পারে, সেই কথা জানাতেও তিনি ভোলেননা-

> যদি ইংরেজরা দেখিতে চাহে শিক্ষায় এবং সামাজিক মর্যাদায় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে একত্র এক পরিবারভুক্ত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ভারতীয় পল্লিগ্রামে আসা উচিত। আমাদের জীবন বিমা নাই, নিঃস্বালয় নাই, চাকুরীজীবী নার্স নাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পৃথক বৃত্তিধারী সংস্থা নাই। আমাদের প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নাই।...ইংলণ্ডের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে প্রতিবেশীদের বিষয়ে কাহারও মাথাব্যাথা নাই। পাশের বাড়ীর ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ অশিষ্টাচার মনে করা হয়। আমার বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, “It is my business” অন্যায় কৌতূহলীকে এই রকম জবাবই শুনিতে হয়। সেখানে জনের ব্যাপার জনেরই, টমের নহে। আমাদের দেশে অল্পবিস্তর রামের ব্যাপার প্রতিবেশী শ্যামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয় মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবধের উন্মেষ জীবনের গোড়া হইতেই আরম্ভ হয়।[336]

---

[335] প্রাগুক্ত।

[336] ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৭।

ব্যাখ্যার এই একই ধারা চোখে আসে রমেশচন্দ্রের লেখাতেও। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সেদেশের রীতিনীতিকে স্বচক্ষে দেখতে দেখতে তাঁর মনে হয় বাংলার মানুষের পরোপকারিতা বা বদান্যতার প্রকৃতি ইংরেজদের থেকে অনেক বেশি আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত-

> ইংলণ্ডের বদান্যতা ও বঙ্গদেশের বদান্যতা ভিন্ন প্রকার। ইংলণ্ডীয় সে যে স্বাধীনতা আছে, বঙ্গসমাজে তাহা নাই। ইংলণ্ডে দানশক্তি পরিমত ও নির্দ্দিষ্ট পথেই পরিচালিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে পরোপকার গুণ অজস্র, ও তদ্দেশীয় বেগবতী নদীজলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্লাবিত করে ও কোন প্রকার নিয়ম মানে না। ইংলণ্ডীয়েরা পর-দুঃখ দূর করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা দীন জনকে স্বজননির্বিশেষে যুগপৎ করুণা ও স্নেহ দিয়া সন্তুষ্ট করে। এক জন ইংরাজ স্বীয় দাতব্য দানাগারে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, বাঙ্গালীরা তদ্রূপ নয়। তাহাদিগের মধ্যে স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ অতি দরিদ্র হইলেও ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতরতা অনুভব করে না, এবং অতি দূর জ্ঞাতি-কুটুম্বকেও নিজ ব্যয়ে ভরণপোষণ করিয়া থাকে।[337]

আমরা বুঝতে পারি, ভ্রমণের সুবাদে শাসক জাতিকে তাদের স্বদেশে চাক্ষুষ করতে পারার অভিজ্ঞতা উপনিবেশিত মননকে শাসক-শাসিতের সম্পর্কিত আলোচনা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। জুলি.এফ.কডেল যেমন মনে করেন, ভারতীয়দের ইংল্যান্ড বা ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি আদতে ‘ইউটোপিয়া’ আর ‘ডিসটোপিয়া’-র মধ্যবর্তী স্তর 'এটোপিয়া'-র নির্মাণ করে যা পরাধীন জাতিকে একাধারে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং নিজেদের জাতিগত ভবিষ্যত বিষয়ে বক্তব্য পেশের সুযোগ তথা স্বাধীনতা দেয়। উপনিবেশের অসম শাসনযন্ত্রের মধ্যে যেখানে শাসক বা তার শাসন সম্বন্ধে কোনোরকম আলোচনা বা সমালোচনা করার অধিকার থাকে না সেখানে শাসিত জাতির জন্যে এই আপাত

---

[337] রমেশচন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭।

অবিশ্বাস্য কাজটির সুযোগ আদায় করে দিতে পারে ভ্রমণ। তিনি তাঁর "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives" প্রবন্ধে, ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার মাধ্যমে উপনিবেশিত মননের ক্ষমতা উদ্‌যাপনের এই বিশেষ অভিব্যক্তিটি ব্যাখা করে লেখেন, "Between British and Indian utopias and dystopias, Indian travellers wrote an atopia, a virtual space, in which they had the authority to criticize Britain and to determine India's future. This atopia was the product of their travel, which made comparisons and judgments possible.[338] এবং জাতীয়তাবাদ যত ডালপালা বিস্তার করে, যুদ্ধধস্ত ইউরোপের প্রতি পূর্ববর্তী মোহ যখন কিছুটা হলেও ফিকে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার যখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় এই আত্মবিশ্বাস আরও জোরদার হয়। সময়বিশেষে পাল্টা প্রশ্ন করার, সমালোচনা করার বা ভর্ৎসনা করার সাহসও মজবুত হয়। এবং এই আত্মবিশ্বসের ঝলক ধরা দিতে থাকে বিশ শতকে থেকে শুরু হওয়া এশিয়া ভ্রমণের পর্বেও। আত্মগঠনে তৎপর বাঙালি যখন ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে কখনো জাপানের মতো উন্নতিশীল দেশের থেকে অর্জন করতে চেয়েছে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি, কখনো বা এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগের অধ্যায়টিকে অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে চেয়েছে, নিজের হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, শাসক বিষয়ে বিরুদ্ধভাবের নানা নমুনাও মজুদ থেকেছে এশিয়া ভ্রমণের নানা পর্বে। কখনো তার প্রকাশ ঘটেছে এশীয় একতার চিন্তাদর্শের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা এই

---

[338] Julie F. Codell, "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives", Source: Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 173-189, Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.173, Accessed: 03/06/2013 05:38.

বিরুদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে জাপানের উন্নতি বা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশে। বা বন্দরে বন্দরে ইউরোপীয় জাহাজের পাশে চিন বা জাপানের জাহাজগুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এই দৃষ্টান্তগুলি বারেবারেই আমাদের চোখে এসেছে এশিয়া ভ্রমণের কথনগুলি বিষয়ে কথা বলার সময়। আমরা দেখেছি, সরোজনলিনীর ভাবনায় কীভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা বর্জনের মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। কেদারনাথও প্রচ্ছন্ন কৌতুক ভরা নির্ভুল শ্লেষে তুলে ধরেছেন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। এমনকি ইউরোপীয় শক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সংশয়হীন ইন্দুমাধবের কলমেও উঠে এসেছে দেশে দেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা। কখনো আবার ভ্রমণের সূত্রেই সুযোগ মিলেছে ইংরেজ সমাজের নানা নিয়মনীতি বিষয়ে তির্যক মন্তব্যের। সেইসঙ্গে চলেছে ইংরেজদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির তুলনামূলক চরিত্রবিচারও। ডাচ শাসিত ইন্দোনেশিয়া বেড়ানোর সময় যেমন সুনীতিকুমার বলেন,

> ডাচেরা এক বিষয়ে আপনাদের মতন বেশ ঢিলেঢোলা- সর্বদা ধনুকে ছিলে জুড়ে’ নেই আর টঙ্কারও দেয় না। ইংরেজ অফিসার যদি কোথাও একা-ও থাকে তা আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক বা চিত্রালের পাহাড়েই হোক, সে তার সামাজিকতার সব খুঁটি-নাটি সব অনুষ্ঠান এই বিরলে ব’সেও অত্যন্ত ধর্মভীরু লোকের মতন নিঁখুত-ভাবে পালন ক’র্‌বে- সেই রোজ রোজ দাড়ি কামানো, সেই ঈভ্‌নিং-ড্রেস প’রে নৈশ ভোজন করা। এগুলো তার জাতীয়তার, তার সম্প্রদায়ের বর্ণ-চিহ্ন...ডাচেদের মধ্যে কিন্তু ও ভাবটা নেই। তাই ওদের সঙ্গে বনিয়ে’ নিতে দেরি হয় না।[339]

---

[339] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৭৯।

আমরা বেশ বুঝতে পারি, বনিয়ে নিতে দেরি না হওয়ার কারণ শুধু ডাচদের খোলামেলা স্বভাব নয়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিসম অবস্থানের ভার না থাকলে যে কোনো আদানপ্রদানই আসলে অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়।[340] রবীন্দ্রনাথেরও স্বভাবগতভাবে ইংরেজদের তুলনায় ডাচদের বন্ধুত্বপরায়ণ বলে বোধ হয়, এবং দুই জাতির স্বভাবগত তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন,

> ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই, তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করি নি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলামেশা করতে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সংকরবর্ণ; তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, "যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্তকিছু-; এইজন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়। নিজেদের সর্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো বলে জানবার অবসর আমাদের হয় নি। এইজন্যে সহজে সর্বত্র আমরা ঢুকতে পারি; এইজন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ।"[341]

আবার ভ্রমণের সূত্রে ইউরোপীয় জাতিদের পারস্পরিক নানা ভিন্নতাকে প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশিই, ভারতের মাটিতে ইংরেজদের মতোই ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে ডাচ শাসন দেখতে

---

[340] ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি আলোচনার সময়েও আমরা দেখেছিলাম ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ইংরেজদের স্বভাবের তুলনা করার প্রবণতা। ইংরেজদের তুলনায় ফরাসি বা ইতালীয়দের বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের প্রশংসা, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে আগ্রহ – এসবের মধ্যেই শাসিতের বিরোধাভাসের নানা ছবি ফুটে ওঠে।

[341]"জাভা-যাত্রীর পত্র" (১১ নং পত্র), পৃষ্ঠা- ৫২৮-৫২৯।

দেখতে একধরনের বৃহত্তর উপনিবেশিত আত্মেরও বোধ জেগে ওঠে। ইন্দোনেশিয়ার ছোট ছোট দ্বীপ থেকে খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনে ব্যস্ত ডাচদের দেখে ইউরোপ আর এশিয়ার মানুষের স্বভাবপ্রকৃতির বৈপরীত্য হিসেবে তিনি বলেন,

> আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে- তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেইসব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সংকটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি, ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এইসব দ্বীপে যেদিন ওরা প্রথম এসে পাল নামালে-, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজসমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত !, সম্পূর্ণ অধিকৃত।[342]

এবং ভ্রমণজাত এই অভিজ্ঞতা ক্রমশই ইউরোপীয় শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া উপনিবেশিতের স্বভাব বিষয়ে একধরনের আত্মসমীক্ষণবাদী পাঠ হয়ে উঠতে থাকে,

> এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েছে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্যতন্ত্র সমাজবন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেইজন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরেছে ব'লেই জেনেছে আর পেয়েছে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হয়ে বসে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ঘরের

[342]"জাভা-যাত্রীর পত্র" (২০ নং পত্র), পৃষ্ঠা- ৫৪৬।

> কাছেই কে আছে, কী হচ্ছে, ভালো করে তা জানি নে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেননা, ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যেশক্তিতে জাভাদ্বীপ সকলরকমে অধিকার করে নিয়েছে-, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ, এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্ছে। আমরা একান্তভাবে গৃহস্থ। তার মানে, আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশমাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে, অন্য সকল যথার্থ কর্ম তারই ভারে অচলপ্রায়।[343]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদেশযাত্রার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ এবং এশিয়া এই দুই মহাদেশকেই অনর্গল ওঠাপড়া, বিবিধ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেন। অল্প বয়সে প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্গে পরবর্তীকালে অনেক বেশি অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখা ইউরোপ সফরের ফারাকের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, আর সেকথা আমরা আলোচনাও করেছি ইউরোপ ভ্রমণ বিষয়ক অধ্যায়ে। তাঁর “জাভা-যাত্রীর পত্র” বা “পারস্যে”-এর মতো শেষ পর্বের ভ্রমণ কথনগুলিতে আবার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সমীকরণ বিষয়ে নানা নিবিড় পাঠ তৈরি হয়। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, গুণের সঠিক সমাদর প্রভৃতির প্রতি নিখাদ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বিশ শতকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির অন্ধ ও অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদ, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিজ্ঞানের ক্রমাগত অপব্যবহার, প্রকৃতির প্রতি অবমাননা প্রভৃতি দিকগুলি রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ হতাশ করে তোলে। পারস্য সফরকালে বিশ্বপরিস্থিতি তথা

[343]“জাভা-যাত্রীর পত্র” (২০ নং পত্র), পৃষ্ঠা- ৫৪৬-৪৭।

ইতিহাস পর্যালোচনার নানা প্রসঙ্গে এই হতাশার কথা একাধিকবার উঠে আসে। পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে দেখা দেওয়া বিপদের লক্ষণগুলি সম্পর্কে তিনি লেখেন -

> বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধছে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুলছে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এক কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধন খোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয়, তার কারণ মত্ততা।[344]

এই শঙ্কা তথা হতাশার পাশাপাশি তিনি কিন্তু পাশ্চাত্যের হাতে দীর্ঘ অবদমনের পরে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে নতুন প্রাণশক্তিতে জেগে ওঠার লক্ষণগুলি বিষয়ে এক ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখতে পান, “নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এশিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাই বহুযুগ পরে এশিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়াল। এই মুক্তিপ্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখযন্ত্রণা থাক্‌, তবু এই উদ্যম, মনুষ্যগৌরব লাভের জন্যে এই-যে আপন সব-কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই।” এবং তাঁর মনে হয় ইউরোপের বিধ্বংসী স্বভাবের পরিবর্তে নবজাগ্রত এশিয়াই

[344]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩১।

হতে পারে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ, মুক্তির সোপান, "আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে।"[345]

উপনেবিশিত মননের আত্মদর্শনের এই পাঠে নারীদের লেখা কথনগুলি আবার এক স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবি তৈরি করে। প্রসঙ্গত সুস্যান ব্যাসনেট মহিলা অভিযাত্রীদের আত্মপরিচয়ের উৎকেন্দ্রিক অবস্থানটিকে চিহ্নিত করে তাঁর "Travel Writing and Gender' প্রবন্ধে বলেন, "they differ from other, more orthodox socially conformist women, and from male travellers who use the journey as a means of discovering more about their own masculinity."[346] এবং পরাধীন দেশের আরও বেশি পরাধীন নারীদের ক্ষেত্রে, যাঁরা শুধু জাতিগত অধীনতার পরিচয় বহন করেননা বরং লিঙ্গগত পরিচয়ের দায়ে যাঁদের আজন্ম দাসত্বের হাতকড়া পরে থাকতে হয়, তাঁদের লিখনে স্বভাবতই "they differ from other"- কথাটি সর্বৈব সত্য হয়ে ওঠে। কারণ অনেক সময় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পরার নিদারুণ মাশুলও গুণতে হয় তাঁদের। কৃষ্ণভাবিনীকে যেমন স্বামীর সঙ্গে বিদেশ যাত্রার ফলে সম্পর্ক ছেদ করতে হয় একমাত্র কন্যার সঙ্গে। বস্তুত বামা লেখনীগুলি পড়তে পড়তে আমরা অনুভব করি, সামাজিক নানা চোখরাঙানি যাঁদের জন্যে আরও অনেক বেশি তীব্র, দেশের মাটিতেই যাঁদের জীবন অন্দরমহল আর হেঁসেলে বদ্ধ তাঁদের পক্ষে প্রথমে বাড়ির বাইরে পা রাখা এবং তারপর সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশ যাত্রা কীভাবে স্বাধীনতার এক দ্বৈত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে। তাই জাহাজে চড়ার আগে, অন্দরমহলে আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে চৌকাঠের

---

[345]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৩৫।

[346]Susan Bassnett, "Travel Writing and Gender", *The Cambridge companion to Travel writing*, Peter Hulme and Tim Youngs (Ed.), (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), পৃষ্ঠা- 226.

বাইরে পা রাখার প্রস্তুতিপর্বের দীর্ঘ সযত্ন বিবরণ স্বভাবতই বহির্জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ যাত্রীদের জন্যে ততটা জরুরি হয় না যতটা হয় কৃষ্ণভাবিনী বা হরিপ্রভার জন্যে। এবং সংসারের হাজারো বেড়ী পেরিয়ে আসতে পারার এই অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব এবং উত্তেজনা ধরা থাকে তাঁদের ভ্রমণের প্রতিটি মুহুর্তে। দুর্গাবতী যেমন ইউরোপ যাওয়ার পথে ঈজিপ্টে উঠের পিঠে ওঠার বিড়ম্বনার গল্প বলেন। কৌতুকমিশ্রিত এই ব্যাখ্যানই বুঝিয়ে দেয় বঙ্গললনাদের থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়ে শেষ হয়ে যাওয়া জীবনে এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ঠিক কতটা অবিশ্বস্য, কতটা নজিরবিহীন। অভূতপূর্বতার এই বোধ ধরা দেয় হরিপ্রভার কথাতেও। ট্রেন ধরতে স্টেশন যাওয়া বা প্রথমবার মেমসাহেব সেজে বাজারে যাওয়া – সকল অভিজ্ঞতাই যেন প্রায় এক নতুন জন্মের মতো বোধ হয়। আমরা বুঝতে পারি, ভ্রমণ তাঁদের কাছে আদতে এক অর্থে আত্ম-উদ্‌যাপনের আখ্যান হয়ে ওঠে।

(৩)

বিদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি পড়ার সময় আমরা আরও একটি জিনিস টের পাই, তা হল পরাধীন জাতি তার বর্তমানে সঙ্গে যুঝতে বা নিজস্ব বিশিষ্টতা অন্বেষণে ভ্রমণ মারফৎ কখনো ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান নির্মাণ করতে চায়। কখনো বা নিজের অতীত গৌরব রোমন্থনের ‘গুরুদায়িত্ব’-ও পালন করে। ফলত তাঁদের উপস্থাপনা ভ্রমণের বর্তমান অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে প্রায়শই অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে পিচ্ছিল হতে থাকে। বর্তমান বাস্তবের থেকেও জরুরি হয়ে ওঠে না দেখা অতীত বা কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। ইউরোপ ভ্রমণকালে নিজেদের অতীত গৌরব বা

আর্য পরিচয়ের ঐতিহ্য বিষয়ে যেমন নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে। অধিকাংশ সময়েই ইউরোপীয় জীবনের জাঁকজমকের মাঝে দাঁড়িয়ে পরাধীন জাতির আত্মপ্রতিরোধের অন্যতম আলম্ব হয়ে ওঠে এই অতীত অনুষঙ্গ। অতীত বিষয়ে এই উল্লেখ, পরিচয়গত বিশেষত্ব নির্মাণের উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নেয় এশিয়া ভ্রমণের পর্বেও। পারস্যে গিয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ বারবার নিজের আর্য পরিচয়ের ইতিহাস তথা ঐতিহ্যটিকে উপলব্ধি করতে চান। ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণকালে অতীতকে দেখার বাসনা বারবার ঘুরে ফিরে আসে সুনীতিকুমার বা রবীন্দ্রনাথের কথনে। বালি দ্বীপের বর্তমান বাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতের সঙ্গে সে দেশের 'অতীত' সম্পর্কসূত্রটিকে অনুধবান এবং 'ভবিষ্যত'-এ সেই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ তথা আকাঙ্ক্ষার কথা সেই বৃত্তান্তের অন্যতম আকল্প হয়ে ওঠে। বস্তুত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির বোধ-বিশ্বাসের নানা স্তরে এই অতীতমুখীনতার দিকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন -

> একে পশ্চাৎমুখী পরিবর্তনবিমুখ বলে ভাবলে নিজেদের প্রতি অবিচার করা হবে। বরং বর্তমান যে পরিবর্তনের অপেক্ষা, তাকে পরিবর্তন করা যে আমাদের কর্তব্য, এই ইচ্ছার জন্ম দেয় হত অতীতের প্রতি মায়া।...এ অতীতকে কাল্পনিক বলাটা বাহুল্য, কারণ অতীত সবসময়ই কাল্পনিক। একালের অসন্তোষ, অপূর্ণতা, অপ্রাপ্তির উল্টো প্রান্তে আমরা নির্মাণ করে নিই এমন এক সেকাল, যা সুন্দর, কল্যাণময়, সুস্থ সামাজিকতার আবাসভূমি, এবং যা ছিল আমাদেরই সৃষ্টি, যেখানে আমরাই ছিলাম কর্তা।[347]

সুনীতিকুমার বা রবীন্দ্রনাথের লেখায় উঠে আসা এশিয়ার নানা স্থানের সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে 'বৃহত্তর ভারত'-এর অন্বেষণ বারবার অতীতের এই 'সুন্দর, কল্যাণময়' রূপটিকেই বর্তমান

---

[347]পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "আমাদের আধুনিকতা", *ইতিহাসের উত্তরাধিকার* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০), পৃষ্ঠা- ১৮৪।

বাস্তবের মাঝে নির্মাণ করে নিতে চায়। ঢেকে দিতে যায় দেশ ও জাতির বর্তমানের নানা খামতিকে। নীৎশে যেমন বলেন, “The things of the past are never viewed in their true perspective or receive their just value; but value and perspective changes with the individual and the nation that is looking back on its past.”[348] এবং উপনিবেশিত পর্বের বাঙালির বিদেশ যাত্রার কথনগুলির পাঠক হিসেবে আমরাও বেশ বুঝতে পারি, অতীত প্রসঙ্গ কীভাবে পরাধীন জাতির গ্লানি আর হীনম্মন্যতা উপর পেলবের আস্তরণ হয়ে উঠতে চায়। এবং গন্তব্যগুলিকেও যাত্রীরা আসলে নিছক দেখেননা, বরং তাঁদের নিজস্ব চাহিদা মেনে নির্মাণ করে নিতে চান। প্রসঙ্গত আমি আমার গবেষণাপত্রের নামকরণেও ‘ইউরোপ’ বা ‘এশিয়া’-র বদলে ‘পাশ্চাত্য’ এবং ‘প্রাচ্য’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছি, কারণ আমার মনে হয়েছে যাত্রীদের মননে, গন্তব্যগুলি কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয় বরং উপনিবেশিতের মানসিক মানচিত্রে স্থিত দুটি বিশেষ ধারণাগত ক্যাটাগরি যেখানে বিশেষ কিছু আচরণ বা প্রকৃতিকে সমগ্র প্রাচ্যের স্বভাব হিসেবে দাবি করে ‘প্রাচ্য’ আর ‘পাশ্চাত্য’ নামক দুই বিপরীত যুগ্মপদকে নির্মাণ করে নিতে চাওয়া হয়। আবার এই দুই পদের ব্যঞ্জনারও বদল ঘটে চলে সময়ের তালে তালে। প্রসঙ্গত এই বদল এবং সেই বদলের নানা দিক ও তলের কথা দিয়েই আমরা এই অধ্যায় শুরু করেছিলাম। এবং ধারণাদের এই নিরন্তর ভাঙাগড়া বা রূপান্তরের নিরিখেই আসলে কথনগুলিকে পড়া এবং বোঝা দরকার। ইউরোপ ভ্রমণ যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে ইউরোপ বিষয়ক ধারণাগুলিকে নানাভাবে ভাঙতে থাকে। একই জিনিস বলা চলে এশিয়ার ক্ষেত্রেও। আমরা টের পাই, দেশগুলি বিষয়ে অভিজ্ঞতার রকমফের এশীয় একতার ভাবনাগত প্রয়াসকে বাস্তবের পটভূমিতে কীভাবে ভাঙতে

---

[348]Friedrich. Nietzsche, *The use and Abuse of History.* Adrian Collins (Trans.) (New York : Macmillan, 1957), পৃষ্ঠা- 47.

থাকে। বৃহত্তর ভারতের ভাবনা ভেবে ভ্রমণকারীরা যতই বিগলিত হন না কেন সে সব দেশের মানুষের দৈনন্দিন যাপনে ভারত বিষয়ক ভাবনার আলদা কোনো তাৎপর্য যে নেই সে কথাও সুনীতিকুমার বা সরলা দেবীর লেখায় সামনে চলে আসে।[349] ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আদতে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এমনকি পারস্পরিক বিরোধিতাকেই সামনে এনে দেয়। আর সমভাবিতা বিষয়ক ধারণার এই ভাঙন, ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে ভ্রমণ। যেখানে আমরা দেখি, ঔপনিবেশিক আবহের চেনা গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এই সুযোগ পরাধীন জাতিকে- বাঙালি থেকে হিন্দু থেকে ভারতীয় থেকে প্রাচ্যবাসী থেকে বিশ্বমানব- আত্মপরিচয়ের অনেকগুলি তলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং আত্মপরিচয়ের এই নতুন নতুন পরিসর, কল্পনা আর বাস্তবের যুগপৎ উপস্থিতি, পারস্পরিক ঠোকাঠুকি আর সাযুজ্যহীনতার মধ্যে দোলায়মান ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির মধ্যেও আমরা অখণ্ড সমসত্ত্ব চিহ্নক দ্বারা আত্মকে চিহ্নিত করতে পারি না। বরং সেখানে উঠে আসে নানা পরস্পরবিরোধী চাপে আক্রান্ত আত্মের খণ্ডিত, প্রায়শই অসংলগ্ন এবং সদা বদলায়মান এক ছবি। ঠিক যেমন যতই কিছু নির্দিষ্ট নির্ধারিত চিহ্নকের দ্বারা গন্তব্যকে বুঝতে চাওয়া হোক না কেন বারেবারেই সেই সব চিহ্নকের সঙ্গে চিহ্ননের সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকে। একইভাবে, গন্তব্যের মতো আত্ম বিষয়েও কোনো চূড়ান্ত বা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত তৈরি হয়না বরং সিদ্ধান্তহীনতাই আত্মের এক বিশেষ চরিত্র হয়ে ওঠে।

একদিকে ভ্রমণের সুযোগ একধরনের আত্মশ্লাঘার জন্ম দেয়। আমরা দেখি কীভাবে এশিয়া ও ইউরোপ দুই তরফের ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলিই উপনিবেশিত মননকে তার গায়ে সেঁটে যাওয়া পরাধীনতার খোলস থেকে কিছুটা হলেও বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। নিজেকে নিছক

[349]জাতীয়তাবাদী আবহে এশিয়ার নানা দেশকে ঘিরে তৈরি হওয়া মনোভাব বা প্রত্যাশার সঙ্গে ভ্রমণকালীন নানা বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যেই আমরা আগের অধ্যায়ে এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি বিশ্লেষণের সময় আলোচনা করেছি।

পরাধীন, পদানত না ভেবে ‘মানুষ’ ভাবার, বিশ্বমানব সভ্যতার অংশ ভাবার সাহস যোগায়। ইন্দুমাধব যেমন প্রথমবার সমুদ্রযাত্রার সময়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখতে পারেন-

> এই স্থানে নানা জিনিস দেখিয়া ও নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া “কূপমণ্ডুক” অবস্থায় থাকিয়া এতদিন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, সেই ভাব আমার মনে আসিত। নানা দেশের নানা লোককে আমাদেরই মত আহার-বিহার করিতে দেখিয়া সবাইকে যেন ভাই ভাই ব’লে মনে হতো। হৃদয়ের চিরকাল সঞ্চিত সঙ্কীর্ণতা কত কমিয়া গেল। অর্থোপার্জ্জন যে কত চেষ্টাসাধ্য তাহা সহজে উপলব্ধি করিলাম। পৃথিবী যে কত বড় তা এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রাতে কতকটা বুঝিলাম। মানবের কায়িক শক্তি যে কত সামান্য, কত নগণ্য তাও উপলব্ধি করিলাম। কেবল বুদ্ধি বলেই মানব এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যের দিগ্বিজয়ী।[350]

ভ্রমণ অবশ্যই ‘ভাই ভাই’ ভাবতে পারার বা শাসক শ্রেণির সঙ্গে একাসনে বসার আত্মবিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা উপহার দেয় অনেক যাত্রীকেই । কিন্তু ভ্রমণকে ভিত্তি করে আত্ম বিষয়ে নিছক একমাত্রিক, পেলব, ইতিবাচক অনুভবই যে জেগে ওঠেনা সে কথাও বৃত্তান্তগুলির পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে। ইন্দুমাধবের অনুভবের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ একটি পাঠ যেমন চোখে পড়ে রাসবিহারী ঘোষের বক্তব্যে যখন তিনি তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মূল সুরটিকেই ব্যক্ত করেন স্বাধীনতা-অধীনতার প্রসঙ্গটির নিরিখে। ভাইকে ইউরোপ সফরের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন-

---

[350]ইন্দুমাধব মল্লিক, পৃষ্ঠা- ৫২।

> মুনিবদের দেশ দেখে এলাম রে! মুনিবদের দেশ দেখে এলাম! যেন একটা নূতন জগৎ! নূতন সৃষ্টি! স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোকের কাণ্ডই আলাদা!...“প্যারিস-এর হোটেলে একজন লোক আমায় একদিন বললে- ‘তোমরা তো দেখি খুবই বুদ্ধিমান, দীর্ঘকায়, হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ; তবুও তোমরা অত কোটি লোক এতদিন ধরে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করছ যে কি করে, এ আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না!’ আমি আর উত্তরে কি বলবো? কপালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। মোটের উপর আমি ইংল্যান্ড ফ্রান্স বেড়িয়ে কোনও সুখ পাই নাই। এই সব দেখে শুনে প্রাণে কষ্টটাই বেশি হয়েছিল।[351]

আকাশপথে পারস্য যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথও আকাশযানের সবল-কর্মঠ ওলন্দাজ নাবিকদের দেখতে দেখতে ইউরোপে মানুষের জীবনধারণের সাধারণ উপকরণগুলির প্রাচুর্য তথা রাষ্ট্রীয় অনুদানের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। এবং এরই সঙ্গে অবধারিত ভাবে চলে আসে ভারতের মতো উপনিবেশিত দেশের অনুন্নত, অপর্যাপ্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর তুলনা যেখানে মানুষের অন্নসংস্থানের তথা জীবনধারণের প্রাথমিক চাহিদাগুলিও মেটানো মুশকিল হয়ে ওঠে-

> এই ব্যোমতরীর চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্তিমান উদ্যম। যে আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূত বলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্‌বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। মনে প্রাণে সাধনা করে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি, কিন্তু আমাদের মন যদি-বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। কেননা, পর্যাপ্ত অন্নের জোরেই

---

[351]শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, *দাদার কথা: স্যার রাসবিহারী ঘোষের জীবন-কথা* (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৩), পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫।

> সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে চিন্তা রাষ্ট্রগত...[352]

এবং স্বাধীন দেশের সঙ্গে পরাধীন উপনিবেশিত দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মূলগত তফাতটিকে চিহ্নিত করে তিনি লেখেন- “...সে দিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন-কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হতে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।”[353] তবে ইউরোপ আর এশিয়ার সম্পর্কের অসামঞ্জস্যতা তথা আড়ষ্টতার সত্ত্বেও তাঁর মনে হয় ইউরোপে গিয়ে সেদেশের মানুষকে নতুন করে দেখার, রাষ্ট্রযন্ত্রের বা অসম সম্পর্কের সমীকরণের উপরে উঠে মনুষ্যত্বকে অনুধাবন করার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দেয় ভ্রমণ। নিজের ইউরোপ ভ্রমণের স্মৃতিরোমন্থন করে তিনি লেখেন -

> ...আমরা এশিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে একা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা, এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেমন সহজ শরীর এবং বর্ম-পরা শরীরের ধর্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায়, আর-একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখলুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে এদের কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো-বা বরণীয়। আমি তাকে ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ফিরেও পেয়েছি তার ভালোবাসা ও

---

[352]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩০-৬৩১।

[353]“পারস্যে”, পৃষ্ঠা- ৬৩১।

শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।[354]

বস্তুত "প্রসঙ্গ: ইউরোপ ভ্রমণ" অধ্যায়তেই আমরা উনিশ শতকের ইউরোপ ভ্রমণের কথনে উঠে আসা স্বাধীন দেশ দেখার সুফল বিষয়ে যাত্রীদের দীর্ঘ ব্যাখ্যানগুলি তুলে ধরেছিলাম। বিশ শতকের কথনে শাসিতের স্বকীয়তার উচ্চরণ অনেক বেশি জোরালো হয়েছে ঠিকই কিন্তু পুরনো ধারার চোরাস্রোতও বহমান থেকেছে। তাই বিশ শতকে স্বাধীনতার অনেক বেশি নিকটবর্তী সময়ে দাঁড়িয়েও, অনেক সময়েই কিন্তু উপনিবেশিত চৈতন্য নিজেদের উপনিবেশিত অবস্থান ও সেই অবস্থানজাত যাবতীয় নেতিবাচকতার বিষয়টিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। রাসবিহারী ঘোষ যেমন মেকলের ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা যে আদতে ভারতীয়দের পক্ষে শাপে বর হয়েছে এবং পরাধীন জাতিকে 'অশিক্ষার অন্ধকার' কাটিয়ে উঠতে যে সুসভ্য জাতির শাসনকে সসম্মানে স্বীকার করে নিতে হবে সে বিষয়ে নিঃসংশয় থাকেন-

মেকলে আমাদের খুবই গালাগালি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের যে উপকার করেছেন, তার তুলনায় সে গালাগালি কিছুই নয়। মেকলে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করবার জন্য স্বজাতির নিকট ওজস্বিনী বক্তৃতায় যে বার্তা প্রচার করেছেন, সে কেবল একমাত্র ইংরেজ জাতিরই পক্ষে সম্ভব।

মেকলে যদি এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সেরূপ প্রাণপণে না যুঝতেন, তবে জগতে আমাদের দশা আজ কি হত, সে কথা ভাবলেও প্রাণে আতঙ্ক হয়। ভগবানের যদি এই বিধানই হয় যে, ভারতবর্ষকে একটা নির্দিষ্ট কালাবধি বিজাতীয় অধীনতা স্বীকার করতেই হবে। তাহলে ভারতবর্ষ যে ইংরাজের অধীন হয়েছে, এটা তার সৌভাগ্য বলেই আমার মনে হয়।[355]

---

[354]"পারস্যে", পৃষ্ঠা- ৬৩১-৬৩২।

[355]শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১১৭।

একইভাবে এশিয়া ভ্রমণেও আমরা দেখি কীভাবে যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ প্রায়শই উপনিবেশিকতার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ঔপনিবেশিক নানা পাঠ বা ক্ষমতা প্রকরণগুলিকেই প্রকারন্তরে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলে। এও দেখি যে ভ্রমণ কীভাবে উপনিবেশিতের বিকল্প উপনিবেশায়নের আকাঙ্ক্ষার ধারক হয়ে উঠে নিজের পরাধীন সত্তাকে ক্ষমতায়িত করতে চায়। অর্থাৎ ভ্রমণকে আলম্ব করে ক্ষমতায়নের যে প্রয়াস উপনিবেশিতের আত্মনির্মাণের অন্যতম প্রকল্প হয়ে ওঠে, সেখানেও ঔপনিবেশিক শাসকের শেখানো পাঠের ছায়াপাত ঘটেই চলে। ঠিক যেমন বিদেশী শাসনযন্ত্রের পীড়নকে রীতিমতো চাক্ষুষ করার পরেও বিলেত দেখা বিষয়ে বাঙালির উত্তেজনা, ঔপনিবেশিক শাসক বিষয়ে মুগ্ধতার বোধ বা তাদের শাসন সম্পর্কে শ্রদ্ধা পুরোপুরি মুছে যায় ভাবলে ভুল হবে। বরং অজ্ঞানতা-অশিক্ষা কাটিয়ে ভারতের উন্নতির খাতিরে ব্রিটিশদের গুণগুলি রপ্ত করার জন্যে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ সফরের আবশ্যকতা বিষয়েও অধিকাংশই নিঃসংশয় থাকেন। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যেমন লেখেন,

> Now, what are the chief obstacles in the way of promoting this exceedingly desirable end (of getting the Indians to see the road to salvation)? Ignorance and prejudice. What is the best means to remove these twin sisters? Surely, to spread right notions and to disseminate correct ideas about England and the English people. And who are the best men to do so? Undoubtedly those who have been to England, have lived in English families and enjoyed English hospitality- those who have attended English schools and studied in

> English universities- those, in fact, who have had ample opportunities to study and observe English institutions at first hand and have learnt to prize and appreciate both without any preconceived bias or politicial or religious prejudice.[356]

ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে বিশেষত বিশ শতকের আখ্যানগুলিতে আমরা খেয়াল করি, আরও একটি নতুন ধারণার সঙ্গে ভ্রমণকারীদের পরিচয় হতে থাকে- তা হল বিশ্ববাদ। পরিবহণ আর পর্যটনের ক্রম উন্নতি ভ্রমণ তথা ভ্রমণকারীর অবস্থানের সংজ্ঞাকেও খুব দ্রুত পাল্টে দিতে থাকে। দেশ-কালের সীমিত ভৌগোলিক সীমার উপরে উঠে বিশ্বায়নের চিন্তা ফুটে উঠতে থাকে। অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন লেখেন- "রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে- কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ল'ড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আরজেণ্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিংবা নিউজীলণ্ডে চাকরীর যোগাড় করবে। এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোট বোধ হচ্ছে যে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী।"[357] এশিয়ার কথনগুলির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, হংকং-এর মতো শহরগুলিতে পৌঁছে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন তাগিদে একত্রে অবস্থান করতে দেখে কীভাবে যাত্রীদের মনে বিশ্বায়নের এক নতুন ধারণা মূর্ত হতে শুরু করছে। একদিকে যেমন ভারতের বাইরে নানা অঞ্চলে কর্মসূত্রে বসতি বাঁধা প্রবাসী ভারতীয় বা বাঙালিদের কথা উঠে এসেছে তাঁদের পর্যবেক্ষণে। তেমনই গুজরাতী

---

[356]Nishikanta Chattopadhyay, "Reminiscences of Old England", পৃষ্ঠা- ২ (উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে সীমন্তী সেনের *Travels to Europe:`self and other in Bengal Travel Narratives 1870-1970* (New Delhi: Oriental Longman Private Limited, 2005) বইটি থেকে

[357]অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা- ৪৭।

ব্যবসায়ী, শিখ পাহারাদার থেকে শুরু করে চীনা কুলি, জাপানি দোকানদার, ইউরোপীয় ভবঘুরে, আমেরিকান ট্যুরিস্ট– একত্রে জড়ো হওয়া নানা দেশ সংস্কৃতির মানুষে ভরা এক কসমোপলিটন পৃথিবীর ছবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সিঙ্গাপুরে পৌঁছে সুনীতিকুমার যেমন লেখেন, “এটা মালাই জা'তের দেশ; এখানে ইংরেজ কর্তৃক নতুন ক'রে স্থাপিত সিঙ্গাপুর (বা 'সিংহপুর') শহর, যে শহরের পত্তন ক'রেছিল না কি হিন্দু ধর্মাবলম্বী যবদ্বীপবাসীরা; এই সিঙ্গাপুরে চার লাখের উপর লোকের মধ্যে তিন লাখের বেশি হচ্ছে চীনা; আমরা ক'জন ভারতবাসী- চারজন বাঙালী আর একজন তামিল- এহেন জগাখিচুড়ির দেশে এসে, সব-চেয়ে বেশি খুশি হ'লুম একটি ঈরানী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ ক'রে।”[358] এবং এই মিশ্র-সংকর সংস্কৃতিতে মিলে-মিশে যাওয়া 'জগাখিচুড়ি'-র পৃথিবীতে, 'স্বদেশ'-এর সংজ্ঞার আর কোনো সহজ ও স্থিতধী অবয়ব তৈরি হয়না। তাই রমেশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণভাবিনীর রচনায় যে 'পরাধীন হতভাগ্য দেশ'-এর আকল্পের সচেতন ব্যবহার বারবার ফিরে এসেছিল, অন্নদাশঙ্কর রায় কিন্তু প্রশ্ন তোলেন সেই বিষয়ে-

> কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙ্গে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, উদ্ভিদের মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চাইল না, পাখির মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়তে উড়তে চলল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম্, তার পরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজিম্, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখতে দেখতে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চ'লে যাচ্ছে, বিয়ে করছে কোন্‌খানে মরছে তার ঠিক নেই। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লীগ্রামে এক তামিল চাষা- ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত- ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে।

[358] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭৮।

> সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়তো ক্যানাডায় বাসা বাঁধবে কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন্ দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজিম্ যাবে? বাপের মাতৃভূমি, না নিজের মাতৃভূমি, না নিজের ছেলের মাতৃভূমি-কার প্রতি? কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখছি, কত কত ইংরেজের ফরাসী, জার্মান, জাপানী ছেলে দেখছি, সাদা-রঙের আয়া লালচে কালো-রঙের ছেলেকে ঠেলা গাড়ি ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য-ধাঁচের মুখে মঙ্গোলীয়-ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগত জুড়ে একটা সঙ্কর জাতি গ'ড়ে উঠেছে, সে জাতির নাম মানব জাতি। এই নতুন মানবের জন্য যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গোরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।"[359]

এবং দেশ, দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলিকে ক্রমে ভেঙে যেতে বা মুছে যেতে দেখার এই অভিজ্ঞতা আসলে ভ্রমণকারীদের আত্ম-অনুসন্ধান বা শাসক-শাসিতের টেনশনের ধারাটিকে অতিক্রম করে যেন এক অনাগত ভবিষ্যতের উত্তর-উপনিবেশিক পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কিত আরও জটিল বোঝাপড়ার দিকে ইশারা করে। এবং আমরা বুঝতে পারি, ঔপনিবেশিকতার সুদীর্ঘ সময়পর্বে অধীনতা আর স্বাধিকার, প্রভাব আর প্রতিরোধ, দেশজ সংস্কার আর বিদেশী রেওয়াজ, আঞ্চলিক বিশিষ্টতা থেকে আন্তর্জাতিকতা– বিপরীতমুখী নানা ভাব আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুঝতে থাকা উপনিবেশিত জাতিও আসলে তার পরিচয় বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই পারে না। বরং তার সামনে আত্মসন্ধানের এক অন্তহীন যাত্রাপথ তৈরি হয়। তৈরি হয় নানা সংশয়, নানা স্ববিরোধ। তপন রায়চৌধুরী যেমন নব্য বাঙালির আবস্থানের এই জটিল বহুস্তরীয়তার দিকটিকে ব্যাখ্যা করে লেখেন,

---

[359]অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা- ৪৮।

> ...the educated Indian began to see no choice but an adoption of western ways- in education, means of livelihood, family organization and even the construction of a social ideology- as his only route to a reasonable existence. This existential compulsion was in deep tension with the felt need for cultural self-assertion and genuine attachment to a whole range of inherited values and ways of life. An anxiety to resolve such tensions and to findanswers which self-consciously precluded or surrender to the west or at least protected one's cultural self-esteem left its mark on modern Indian sensibilities. The encounter with the West in the context of colonial rule initiated torture processes of change full of complexities, uncertainties and ambivalences.[360]

এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তের নানা দিক আলোচনা করতে গিয়েও আমরা বারেবারে এই 'uncertainties and ambivalences'–কেই উপনিবেশিত অস্তিত্বের এক প্রধান স্বর হিসেবে উঠে আসতে দেখেছি, যেখানে তার অন্তর্ভূমি আর বহির্ভূমির মাঝে ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক-এর অনর্গল যোগবিয়োগ চলেছে । যেখানে সে ঔপনিবেশিক শাসকের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিতে নিতেও কিছুটা স্বকীয়তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। শাসকের শেখানো বিবিধ পাঠে অভ্যস্ত হয়েও সেই পাঠের নানা উৎকেন্দ্রিক উচ্চারণ তৈরি করে নিতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে হোমি ভাবা বিশ্লেষিত, 'Colonial mimicry'-র কথা- "Colonial mimicry' is the desire for a reformed, recognisable Other, as a subject of a difference

---

[360]Tapan Raychaudhuri, *"Transformation of Indian Sensibilities", Perceptions, Emotions, Sensibilities : Essays on India's Colonial and Post-colonial Experiences* (New Delhi and Oxford: Oxford University Press, 1999), *পৃষ্ঠা- ১০-১১.*

that is almost the same, but not quite. Which is to say, that the discourse of mimicry is constructed around ambivalence; in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess, its difference."[361] যাত্রীদের ভাবনাগত নানা দোলায়মানতা আর অনিশ্চয়তার পাঠ নিতে নিতে আমরাও অনুভব করি যে এই স্লিপেজ বা বিচ্যুতিই আসলে উপনিবেশিতের অস্তিত্বের নিজস্বতা। এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, জাঁক দেরিদার *Difféfrance*[362]-এর অনুষঙ্গ। différence আর defer- এই দুই শব্দের যুগলবন্দীতে তৈরি হওয়া শব্দভ্রমের সাহায্যে দেরিদা বোঝতে চেয়েছিলেন কোনো শব্দের মধ্যেই আসলে স্থির নিশ্চল কোনো অর্থ থাকেনা বরং সেখানে অর্থ বিষয়ক যাবতীয় নিশ্চয়তা বিষয়ে স্থগিতাদেশ জারী হয়। সেখানে সব অর্থই হয়ে ওঠে আপতিক ফলত তাদের ব্যঞ্জনাও হয় অফুরান। উত্তরগঠনবাদী এই ভাবনার সাপেক্ষে আমরা পাঠ করতে পারি আমাদের উপনিবেশিত পর্বের ভ্রমণ কথনগুলিকেও। অর্থাৎ উত্তরগঠনবাদীরা যেমন চিহ্নক (signifier) আর চিহ্নেনের (signified) নির্দিষ্ট[363] আগল মুক্ত করে শব্দকে এক উন্মুক্ত পরিসরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন সেখানে যেমন শব্দের কোনো স্থির বা চূড়ান্ত প্রতিকৃতি তৈরি হয় না। উপনিবেশিত আত্মের নানা খণ্ডচিত্রও আসলে তেমনই বহু ব্যঞ্জনা, বহু

---

[361]উদ্ধৃতিটি আগেও একবার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য: টীকা নং- 58।

[362]Jacques Derrida, *of Grammatology,* Corrected Edition, Gayatri Chakravorty Spivak (Trans.) (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press 1997).

[363]ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর শব্দকে যে চিহ্নায়নের প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন সেখানে চিহ্নক আর চিহ্নেনের সম্পর্ক ছিল নিছক কাকতালীয়। তবে তিনি সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই কাকতালীয়তার মধ্যেই একটি স্থায়ী অর্থ গড়ে ওঠার কথা বলেছিলেন। কিন্তু অর্থগত এই স্থায়িত্ব বা একমাত্রিকতাকেই অস্বীকার করেন উত্তরগঠনবাদীরা। তাঁদের বিশ্লেষণে এই প্রক্রিয়া সদা প্রবহমান যেখানে ক্ষণস্থায়ী একটি অর্থসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরেই নতুন অর্থ তৈরির তাগিদে সেই পুরনো সম্পর্কটি ভেঙে যায়।(Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics*, Baskin Wade (Trans.), Perry Meisel and Haun Saussy (Ed.), Columbia University press, 1959.)

বিকল্প, বহু সম্ভাবনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে জার্মানীর কয়েকটি প্রাইমারী স্কুল দেখতে গিয়ে রামনাথ বিশ্বাস যেমন লেখেন- "প্রত্যেকটি স্কুলেই জার্মাণ সাম্রাজ্যের মানচিত্র রক্ষিত ছিল। ছেলেদের বুঝাবার জন্য দুই রকমের মানচিত্র ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর কোন কোন দেশে রাজ্য ছিল এবং দ্বিতীয় মানচিত্রে দেখান হয়েছিল ভবিষ্যৎ জার্মাণী কি চায়।[364] ঠিক এমনভাবেই উপনিবেশিত বাঙালির ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিকেও আমরা বর্তমান সীমাবদ্ধতা আর আগামীর হতে চাওয়ার মধ্যে এক বিরামহীন সংলাপ বা ক্রমাগত দর কষাকষি হিসেবে পাঠ করতে পারি। সেখানে পরাধীন জাতির বিবর্তনের বা উন্নত ভবিষ্যৎ তৈরির চূড়ান্ত কোনো ধাপ বা সর্বজনগ্রাহ্য স্থির নিশ্চিত কোনো কাঠামো বা মডেল সামনে আসে না। আত্ম-অনুসন্ধানের এই আখ্যান আদতে কোনো পরিণতিকে বা 'হওয়াকে' সূচিতই করে না; বরং এক 'হয়ে ওঠার', এক ক্রমনির্মিতির ছবিকে তুলে ধরে। কারণ উপনিবেশিত বাঙালির আত্মনির্মাণের এই প্রকল্প অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ, অবিন্যস্ত এক প্রয়াস যেখানে বাস্তব আর বাসনার মাঝে সবসময়েই কিছু না কিছু ব্যবধান রয়ে যায়। আর এই ব্যবধানের মাঝেই অপসৃয়মান থাকে উপনিবেশিতের চৈতন্য যে চৈতন্য কখনই সমগ্র বা অখণ্ড নয় বরং নানা স্ববিরোধ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরা খণ্ডচৈতন্য।

---

[364]ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ, পৃষ্ঠা- ১৮৫।

পরিশেষে

আলোচনার প্রারম্ভেই "প্রস্তাব" অংশে আমরা স্বীকারোক্তি রেখেছিলাম যে এই আলোচনা মূলত আবর্তিত হবে একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে। কারণ, উপনিবেশিত পর্বের বাঙালির ভ্রমণ বিষয়ে এই বিশ্লেষণে 'বাঙালি' বলতে আমরা সর্বৈবভাবেই ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত বাঙালি শ্রেণি যাঁদের পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছি। এবং ঔপনিবেশিক পর্ব বলতেও আমরা মূলত বোঝাতে চেয়েছি ইংরেজি শিক্ষা চালু হওয়ার পরবর্তী সময়টিকে। যখন ঔপনিবেশিক পাঠক্রমের শক্তিশালী অভিঘাতে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে শুরু হয় মননগত উপনিবেশায়নের পালা, জন্ম হয় আমাদের আলোচ্য শ্রেণিটির। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল হবে, ভ্রমণের সুযোগ শুধু এই এক শ্রেণির ভারতীয় বা বাঙালিদেরই হয়েছিল। মাইকেল.এইচ.ফিশার যেমন তাঁর *Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain*[365] বইতে দেখাচ্ছেন সপ্তদশ শতক থেকেই এদেশের মানুষ পাড়ি জমাতে শুরু করেছিলেন বিদেশের পথে, "Indian men and women have been travelling to England since about 1600, roughly as long as Englishmen have been sailing

[365]Michael. H Fisher, *Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain, 1600–1857* (New Delhi: Permanent Black, 2006).

to India'[366]। এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই সেই অর্থে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি, বেঁচে থাকার তাগিদে বা নতুন জীবনের সন্ধানেই মূলত তাঁরা পাড়ি জমিয়েছিলেন অজানা দেশে। তাঁরা মূলত সফর করেছেন খালাসী, লস্কর, পরিচারক/পরিচারিকা, সেপাই হিসেবে। ধনী ভারতীয় যাত্রীদের ভৃত্য বা বাবুর্চি হিসেবেও কম মানুষ যাত্রা করেননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সব মানুষদের পক্ষে নিজেদের ভ্রমণের কোনো লিখিত বয়ান রেখে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সেই না লেখা যাত্রার পাঠ হয়তো উপনিবেশিতের ভ্রমণ বিষয়ক ভাবনা তথা গবেষণার এক সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দিগন্তের সন্ধান দিতে পারবে। বস্তুত আমাদের নির্বাচিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালিদের কথনগুলিতেও কখনো কখনো আমরা 'শিক্ষিত' বাঙালির সীমিত বৃত্তের বাইরে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার যে ভিন্নতর একটি ধারা বিদ্যমান আছে, তার আভাস পেয়েছি। যা উঠে এসেছে মূলত জাহাজের তৃতীয় শ্রেণি বা ডেক যাত্রীদের বর্ণনার ভিতর দিয়ে। জাহাজের ডেকে বসেই রান্না চাপানো তামিল মুসলমান ভাণ্ডারী, ফরাসি কলোনিয়াল রেজিমেন্টে চাকরি করা তামিল খ্রিস্টান যুবক, ইংরেজি আদবকায়দায় অনভ্যস্ত তামিল হিন্দু, হংকং-সিঙ্গাপুরের রাস্তায় টহল দেওয়া শিখ পাহারাদার, চট্টগ্রামের মুসলমান লস্কর, কাশ্মীরি শালওয়ালা, কলেরা আক্রান্ত খালাসী, ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকা পাড়ি দেওয়া শিখ- এমন অনেক নিম্নবর্গীয়[367] চরিত্রই ধরা পড়েছে আমাদের

---

[366] Michael. H. Fisher, "From India to England and Back: Early Indian Travel Narratives for Indian" Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 153-172 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.153, Accessed: 03/06/2013 05:38.

[367]সাব-অলটার্ন এর বাংলা অভিধা হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি রণজিত গুহ প্রথম ব্যবহার করছেন "নিম্নবর্গের ইতিহাস" প্রবন্ধে। (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১৫)।

আলোচ্য কথনগুলিতে। এবং সেই সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতার ধাঁচা বা সফরের সার্বিক কাঠামোর সঙ্গে যে মোটেই মেলে না আমাদের নির্বাচিত যাত্রীদের কথনের ধরনধারন, তাও আমরা দিব্যি টের পেয়েছি। জাহাজের তৃতীয় শ্রেণি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সুনীতিকুমার যেমন লেখেন,

> ...পাঁচতলা জাহাজের সব নীচের তলায় হ'চ্ছে তৃতীয় শ্রেণির ক্যাবিন।। হাওয়া এখানে খুব কম আসে, ক্যাবিনগুলি ঘিঞ্জি, ছোটো এক-একটাতে নীচে উপরে তিনটে বা ছটা ক'রে বিছানা। এগুলো দেখে মনে হয় অপরিষ্কার। এর মধ্যে অনেকগুলি ফরাসি, আনামি, তামিল যাত্রী ঠাসাঠাসি ক'রে আছে। একটা ভাপ্‌সা জাহাজের খোলের গা-ঘুলিয়ে'-দেওয়া দুর্গন্ধ, হাওয়া যেন ভারী-ভারী; উপরের খোলা সমুদ্রের নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়ে ভিতরে ঢুক্‌লে, প্রথমটা যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন হ'য়ে গা বমি-বমি ক'রতে থাকে,- পরে এটা স'য়ে যায়।[368]

এই বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদের এযাবৎ আলোচিত যাত্রীদের সঙ্গে এই সমস্ত যাত্রীদের অবস্থানগত তফাতের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। টের পাওয়া যায় তাঁদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণরীতির ভিন্নতার কথাও। এবং আমরা বুঝতে পারি, এই বর্ণনা

বস্তুত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে 'সাব-অলটার্ন' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন আন্তেনিও গ্রামশি, তাঁর কারাগারের নোটবইতে, মূলত প্রোলেতারিয়াতের প্রতিশব্দ হিসেবে। কিন্তু রণজিত গুহ শব্দটির অর্থ আর কেবলমাত্র 'প্রোলেতেরিয়াত'-এর অর্থে বেঁধে না রেখে সাব-অলর্টান স্টাডিজ-এর প্রথম পর্বের মুখবন্ধে বলছেন – "The word 'subaltern' in the little stands for the meaning as given in concise Oxford Dictionary, that is, 'of inferior rank'.It will be used in these pages as a name for the general attribute of subordination in South-Asian society whether this expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way." (Guha, Ranajit (Ed.), "Preface", *Subaltern Studies I,* New Delhi: Oxford University Press, 1982.)

[368]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৫১।

আসলে শুধু প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির দৃশ্যগত তারতম্যের কথা বলে না, বরং তুলে আনে এক অসম শ্রেণি অবস্থানের কথা যেখানে ঔপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের মাঝের ব্যবধানের থেকেও কোনো অংশে কম নয় উপনিবেশিত সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক ব্যবধান। এবং এই বিসমতার সূত্র ধরে, 'উপনিবেশিত' এই শব্দবন্ধটিকেই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ব্যবচ্ছেদ করে দেখানো যেতে পারে। প্রসঙ্গত "পটভূমি" অধ্যায়ের আলোচনাতেই আমরা দেখেছিলাম, ব্রিটিশ শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা ভারত তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের যে ভোলবদল ঘটিয়েছিল তা মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের সঙ্গে সমাজের বাকি অংশের অবস্থানের এক দুস্তর ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজের তৃতীয় শ্রেণি বা ডেক প্যাসেঞ্জারদের আলাপচারিতার মধ্যে, তাঁদের মুখে শোনা নানা অভিনব গল্প, বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে এই ব্যবধানের বা ভাবনাগত ভিন্নতার বাস্তবতাকেই আমরা আরও স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারি। যা আদতে উপনিবেশিতের আত্মের নানা নতুন প্রকোষ্ঠের দিকে ইশারা করে। যেমন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত যাত্রীদের লেখাতে উঠে আসা জাহাজের খাওয়াদাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে কখনই মেলানো যায় না তৃতীয় শ্রেণির সেপাইদের সীমিত খাদ্যতালিকা। দুধ-চিনি ছাড়া সবুজ চা, ভাত, মাংস, সবজি আর কলাতেই যাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জাহজে উঠে ইংরেজ বা অন্যান্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে একত্রে সহাবস্থানের যে অভিনব সুখ আলোচ্য অনেক যাত্রীই প্রত্যক্ষ করেছিলেন[369], তেমন সৌভাগ্য কিন্তু আদৌ এই যাত্রীদের হয় না। বরং কর্তৃপক্ষের নানা নজরদারী, নিয়মের মাত্রাধিক কড়াকড়ি এবং অনেক সময়েই অবমাননাকর নানা ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। রাসবিহারী বসুর বর্ণনায় যেমন উঠে আসে কীভাবে কর্তৃপক্ষের কড়াকড়িতে ডেকবাসী শিখ যাত্রীদের নিজেদের রান্নার রসদটুকু যোগাড় করতেও

[369]ইউরোপ এবং এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি বিশ্লেষণকালে জাহাজযাত্রার নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশদ আলোচনা আমরা ইতিমধ্যেই করেছি।

নাজেহাল হতে হয়। মন্মথনাথ বলেন, তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসাজনিত নানা অব্যবস্থা বা গাফিলতির কথা। আবার কখনো বা জনৈক যাত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে তিনি জানতে পারেন চিনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাজ পাখী ধরে ভারতে নিয়ে এসে ধনীদের কাছে বিক্রি করার অজানা রোমাঞ্চকর গল্প। সরোজনলিনী ও তাঁর স্বামী হংকং-এর পাঞ্জাবী সার্জেন্টের মুখ থেকে শোনেন চৈনিক গুণ্ডাদের আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হওয়ার করুণ অভিজ্ঞতা। আর এইসব উৎকেন্দ্রিক গল্প-অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে নিতে আমরা উপলব্ধি করি যে এই সমস্ত যাত্রীদের বিদেশ যাত্রা বা বিদেশ বাসের সঙ্গে এলিট ক্লাস বাঙালির ভ্রমণের অভিব্যক্তির মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'চশমা নাকে বাবুদের' দেশচিন্তার সঙ্গে হাসিম শেখ বা রামা কৈবর্তের দূরদূরান্তের কোনো সম্বন্ধ দেখেননি[370], তেমনই এঁদের গল্পের সঙ্গে আমাদের উচ্চবর্গীয় যাত্রীদের জীবনযাপনের যে অগাধ দূরত্ব সেখানে গন্তব্যকে ঘিরে গড়ে ওঠা ধারণা বা প্রত্যাশার পারস্পরিক মিল আদপেই থাকে না। কিন্তু মুশকিল হল, এই সকল ভিন্নতর অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের কাছে ধরা দেয় কেবল ক্ষণিক স্ফূরণ হিসেবে তাদের কোনো সামগ্রিক পাঠ আমরা নিতে পারি না, বলা ভালো সেই সব অভিজ্ঞতার কোনো প্রত্যক্ষ ভাষ্যও আমরা শুনতে পাই না। কারণ এই সকল কথাই উপস্থাপিত হয় এলিট যাত্রীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং মূলত জাহাজযাত্রার অংশেই; গন্তব্যে পৌঁছে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ শোনার সুযোগ প্রায় হয় না বললেই চলে। এবং আমাদের নির্বাচিত শ্রেণি অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভাবিত উচ্চ

---

[370]উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের জাতির ইতিবৃত্ত রচনার গোড়াতেই যে একটা গলদ আছে, একপেশেমি আছে এমন একটা সন্দেহ জাতীয়তাবাদের জন্মলগ্নের কারিগর বঙ্কিমচন্দ্র, নিজেই তৈরি করে ফেলেন যখন তাঁর "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধটিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন "বল দেখি চসমা-নাকে বাবু। ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর!....বল দেখি তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?"- ("বিবিধ প্রবন্ধ – বঙ্গদেশের কৃষক", বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৫০।)

বা মধ্যবিত্ত বাঙালি ভ্রমণের সূত্র ধরে যেভাবে স্বদেশ বা স্বজাতির কাঙ্ক্ষিত মানচিত্রটিকে কল্পনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সেই কল্পনা বা দেশনির্মাণের প্রকল্পে এইসব মানুষদের তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা জুটতেও আমরা দেখিনা। প্রসঙ্গত হাসান আজিজুল হক তাঁর "কান্ডজ্ঞানের দর্শন" প্রবন্ধটিতে ভারতবর্ষীয় সমাজ-ইতিহাসের এই সীমিত সঙ্কুচিত পরিসরের সমালোচনায় বলেন,

> সমাজের যে বিন্যাস তাতে জনসাধারণ, কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষের কণ্ঠ শোনার উপায় নেই। আমাদের সামাজিক উন্নয়ন এতই কম হয়েছে, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো এমন করে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, যার ফলে দেশের আশি থেকে পঁচাশি ভাগ মানুষ শুধু যে মানবেতর জীবনযাপন করে তাই নয়, তাদের কণ্ঠও কেউ শুনতে পায় না....এটা আমাদের এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। তার মানে দেশের সকল মানুষকে নিয়ে আমরা দেশ তৈরি করতে পারিনি...। আমরা এমন একটা সংস্কৃতি নির্মাণ করতে পারিনি, যাতে সমগ্র জনসাধারণের উপস্থিতি আছে।[371]

আমরাও আমাদের গোটা আলোচনা জুড়ে যে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি নিয়ে কথা বলেছি সেগুলিতেও জানসাধারণের সার্বিক বা সামগ্রিক কণ্ঠ শোনার সুযোগ হয়নি, বরং অনেকসময়েই তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের বিষয়ে একধরনের হাল্কা কৌতুকভরা টীকা-টিপ্পুন্নী চোখে এসেছে। চোখে এসেছে দূরত্বজনিত কৌতূহল। "জাহাজের কল-কব্জার পাশে যেখানে-যেখানে একটু ফাঁক সেখানে চট-চেটাই বিছিয়ে, লোকের আস্তানা- জলের পাম্প, মুরগীর ঝোড়া, রান্নার ডেক্‌চি, কাঠের হরেক রকম ফ্রেম, খালাসীদের যন্ত্রপাতি"-র মাঝে ঘেঁষাঘেঁষি করে নানা জাতের লোককে সফর করতে দেখে সুনীতিকুমার যেমন বলেন,

---

[371]হাসান আজিজুল হক, "কাণ্ডজ্ঞানের দর্শনঃ আরজ আলী মাতব্বর", আফিক ফুয়াদ (সম্পা.) দিবারাত্রির কাব্য: উপন্যাস সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৪২।

> এই যে এত লোক একসঙ্গে র'য়েছে জাহাজে, এটা একটা ক্ষুদ্র আন্তর্জাতিক রাজ্য ব'ল্‌লেই হয়। নরদেবতা কত বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকট হ'য়ে, যেন আমারই কৌতূহলকে চরিতার্থ করবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছেন- এদের সঙ্গে কথাবার্তা না ক'র্‌লে, আলাপ না জমালে, এদের যেন প্রত্যাখ্যান করা হবে। তার দ্বারা আমিই বঞ্চিত থাক্‌বো। তাই এদের মধ্যে এসে, গল্প-গুজব ক'রে, ভাষায় কুলোলে কোথাও একটা রসিকতা ক'রে, কার কী উদ্দেশ্যে গমন, কার বাড়িতে কে আছে এই-সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে আর উত্তর দিতে-দিতে সময় কাটাতে আমার বেড়ে লাগে। ধীরেন বাবু আর সুরেন-বাবুও সঙ্গে থাকেন, তাঁরাও বেশ কৌতুক অনুভব করেন।[372]

আবার কখনো এই কৌতুকের সঙ্গে মিশে গেছে প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতাও। থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের জাহাজের ডেক থেকে হাত নাড়ার 'বহর' দেখে সরলা দেবী যেমন লেখেন,

> জাহাজ থেকে তীরবর্ত্তী আত্মীয়বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে যাত্রীদের রুমাল ঘোরান অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। রুমাল ঘোরাচ্ছিলেন সেকেণ্ডক্লাসের ডেক থেকে কতকগুলি থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার। বঙ্গীয় যুবক আর দুটী সেকেণ্ডক্লাসের ফিরিঙ্গি মেয়ে- খাঁটি সাহেবসুবোরা নয়। হয়ত বর্ম্মাযাত্রী অ্যাংলো সাহেবদের কলকাতায় আপনার বলতে কেউ ছিল না- আর এই নব্য বঙ্গসন্তানেরা বোধ হয় কোথাও শুনে থাকবেন জাহাজ থেকে রুমাল ঘোরানটা পুরোদস্তুর যাত্রী-কায়দা; তাই অবিশ্রাম বিঘূর্ণন চলতে থাকল। কলকাতার উপকূলের যখন বিন্দুবিসর্গও আর দৃষ্টীগোচর রইল না; তখনই তাঁরা ক্ষান্ত দিয়ে নেপথ্যে অন্তর্দ্ধান হলেন।[373]

শব্দচয়ন আর বলার ভঙ্গিমাই বুঝিয়ে দেয়, এই পর্যবেক্ষণ নিছক সহযাত্রীদের বর্ণনা দেয় না বরং তাঁদের পারস্পরিক 'ক্লাস'-এর ফারাকটিকে প্রাঞ্জল করে তুলতে চায়। বস্তুত ভ্রমণকালের

---

[372]সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৭।

[373]উদ্ধৃতিটি আগেও একবার ব্যবহার করা হয়েছে, দ্রষ্টব্য: টীকা নং – 171।

অনেক পর্যবেক্ষণেই এহেন শ্রেণিসচেতন উচ্চারণ বারংবার চোখে আসে আমাদের। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন ইংল্যান্ডের পরিচারিকাদের বেশবাসের পরিপাট্য বিষয়ে বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন,

> রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে কেবল পরিচ্ছদ দেখিয়া ভদ্রকন্যা ও পরিচারিকার মধ্যে প্রভেদ বুঝা আগন্তুকের পক্ষে বড়ই কঠিন। তবে মুখ দেখিয়া প্রভেদ বোঝা তত শক্ত নয়;- গরীব লোকের মুখে স্বাভাবিক রুক্ষতা আছে ও তাহাদের কপোলদেশ প্রায়ই আরক্ত। ভদ্রকন্যার মুখ লজ্জাময় ও তাহারা প্রায়ই পাণ্ডুকপোল। পরিচ্ছদেও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রভেদ কতক বুঝা যায়।[374]

আমরা বুঝতে পারি পাঠক বা ভবিষ্যত যাত্রীরা যাতে এই দুই শ্রেণির আপাত সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত না হন বা 'ভদ্রকন্যা'-দের চিনতে ভুল না করেন সেই জন্যেই লেখকের এহেন সযত্ন বিশ্লেষণ। শিবনাথ শাস্ত্রীও ইংরেজদের মদ্যপানের আসক্তির নিন্দা করতে গিয়ে বলেন, "...আমাদের দেশে ভদ্রলোক কখনও শুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ করে না, ছোটলোকেরাই প্রবেশ করে।"[375] বনামবিদ্ধ পক্ষে হিসেবে 'ভদ্রলোক' আর 'ছোটলোক' বা 'গরীব' আর 'ভদ্রকন্যা'- শব্দের এহেন প্রয়োগ তথা উপস্থাপনা থেকে লেখক এবং তাঁদের আদত পাঠক দুই-এরই শ্রেণিপরিচয় বুঝতে ভুল হয় না আমাদের। এবং লেখক ও পাঠকের এই বৃত্তে যে এই নিম্নবিত্ত বা বর্গের যাত্রীরা প্রায় ব্রাত্য সে কথাও বেশ বোঝা যায়। সেইসঙ্গে এও বোঝা যায়, বৃত্তান্তগুলিতে, পরাধীন জাতির উন্নতির স্বার্থে ভ্রমণের সুফল বা ভ্রমণজাত শিক্ষা-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার যে রেওয়াজ, তার আওতাতেও এই মুষ্টিমেয় 'ভদ্রলোক'-রাই আসেন, আপামর দেশবাসী নয়। ফলত বিদেশ যাত্রার যাবতীয় খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে বিদেশী জাতির রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ-

---

[374] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃষ্ঠা- ৭১৫।

[375] *আত্মচরিত*, পৃষ্ঠা- ২১২।

এসবই আবর্তিত তথা নিয়ন্ত্রিত হয় এই ‘শিক্ষিত’, ‘শহুরে’ ‘ভদ্রলোকেদের’ দৃষ্টিকোণ আর রুচি মেনে, ‘ছোটলোকেদের’ কথা ভেবে নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি সেই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির ভ্রমণ অভিজ্ঞতার নিবিড় পাঠ নেওয়া যায় তাহলে সেখানে আত্মদর্শনের কোন্ ছবি ধরা পড়বে? তাঁরা কি আদৌ ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালির কায়দায় দেশ বা জাতীয়তার প্রকল্প নির্মাণ করতে চাইবেন নাকি তাঁদের জীবনবোধে জেগে উঠবে ভানুমতীর মতো প্রশ্নাতুর বোবা বিস্ময়- “ভারতবর্ষ কোনদিকে?”[376] যে প্রশ্ন নব্য বাঙালির দেশ তথা জাতি বিষয়ক যাবতীয় প্রকল্প-পরিকল্পনাকেই নিমেষে নস্যাৎ করে দেবে। এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর আমাদের কাছে নেই। তবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে উপনিবেশিত আত্মের যে বিবিধ ব্যঞ্জনার কথা আমরা বলেছিলাম সেই ব্যঞ্জনাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে এই না নেওয়া পাঠগুলি। ইংরেজি ধারায় শিক্ষিত-দীক্ষিত উপনিবেশিতের প্রতিমুহূর্তের যে স্ববিরোধ, ভাবনা-চিন্তার দোলাচল আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা তাঁদের অস্তিত্বের অন্যতম সূচক হয়ে উঠেছিল; সরাসরি ইংরেজি শিক্ষার অভিঘাতে না আসা উপনিবেশিতের এই অংশের গল্প নিশ্চয় তার থেকে অনেকটাই অন্যরকম হবে। আর তাঁদের কথন, তাঁদের অভিজ্ঞতা স্বভাবতই উপনিবেশিতের আত্মদর্শনের ধারণাকে আরও অনেক বেশি স্তরায়িত, অনেক বেশি বর্ণাঢ্য এবং অবশ্যই অনেক অনেক বেশি জটিল তথা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

---

376 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসের সাঁওতাল রাজকন্যা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

বাংলা

1. ঘোষ, দুর্গাবতী। *পশ্চিমযাত্রিকী*। সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.)। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ২০০৭।
2. ঘোষ, মন্মথনাথ। *জাপান প্রবাস*। কলকাতা: এম্পায়ার লাইব্রেরী, ১৯১০।
3. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *পশ্চিমের যাত্রী*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৯।
4. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ। *পিতৃস্মৃতি*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্‌, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭।
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, মাঘ *১৪২১*।
6. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮।
7. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৭।
8. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড।কলকাতা: বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৯৩।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৫।
10. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।*রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৬।
11. তাকেদা, হরিপ্রভা। *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা*। সিংহ, মঞ্জুশ্রী (সম্পা.)। ডি.এম. লাইব্রেরি। কলকাতা: জানুয়ারি ২০০৯।
12. দত্ত, রমেশচন্দ্র। *ইয়ুরোপে তিন বৎসর অর্থাৎ ইউরোপবাসিদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় ও নানাদেশ বর্ণনাবিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ*। কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯০।
13. দাস, কৃষ্ণভাবিনী। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*। সেন, সীমন্তী (সম্পা.)।কলকাতা: স্ত্রী, ১৯৯৬।
14. দাস, দেবেশচন্দ্র। *ইয়োরোপা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।
15. পাল, বিপিনচন্দ্র। *মার্কিনে চারিমাস*। কলকাতা: যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৩৭৭।|

16. বন্দ্যোপধ্যায়, কেদারনাথ। *আমাদের চিনচর্চা, শতবর্ষ আগের ভ্রমণকথা: চিনযাত্রী*। শংকর (সম্পা.)। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১০।
17. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস, চক্রবর্তী, মণীশ, রায়, সবিতেন্দ্র (সম্পা.)। *বিভূতি-রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৭।
18. বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র, বসু, লেডী অবলা। *রচনাবলী*। কলকাতা: বিবকানন্দ বিজ্ঞান মিশন, ১৪১৬।
19. বসু, রাসবিহারী। *রাসবিহারী বসু রচনা সংগ্রহ*। দাস, অসিতাভ (সম্পা. ও অনূদিত)। কলকাতা: পত্রলেখা, এপ্রিল ১৯৯৯।
20. বিবেকানন্দ, স্বামী, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড*। কলকাতা: উদ্বোধন, কার্য্যালয়, ১৯৬২।
21. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। কলকাতা: উদ্বোধন, কার্য্যালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।
22. বিশ্বজিৎ রায় (সম্পা.)। *স্বামী বিবেকানন্দের দুটি ভ্রমণকাহিনী: বিলাত যাত্রীর পত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। বইমেলা: লালমাটী, ২০১৫।
23. বিশ্বাস, রামনাথ। *ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ*। পর্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৯৪১,।
24. বিশ্বাস, রামনাথ। *মুক্ত মহাচীন*। কলকাতা: ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড, ১৯৪৯।
25. মল্লিক, ইন্দুমাধব, দেবী, সরোজনলিনী। *ইন্দুমাধবের চীনভ্রমণ, সরোজনলিনীর জাপানে বঙ্গনারী*। সেন সীমন্তী (সম্পা.)। কলকাতা: ছাতিম বুক্‌স, জানুয়ারি ২০১০
26. মুখার্জী, বিমল। *দুচাকায় দুনিয়া*। চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র (সম্পা.)। কলকাতা: স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১২।
27. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *আমার ইউরোপ ভ্রমণ*। গোস্বামী, পরিমল (অনূদিত)। কলকাতা: চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।
28. রায়, অন্নদাশঙ্কর। *পথে প্রবাসে*। বেরা, অবনীন্দ্রনাথ (সম্পা.)। কলকাতা: বাণীশিল্প, ১৯৯৯।
29. রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। *আত্মচরিত*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, শ্রাবণ ১৩৬০।
30. রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী*। রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা.)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১।
31. রীত, প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পা.)। *ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১২।
32. শাস্ত্রী, শিবনাথ। *আত্মচরিত*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, আশ্বিন ১৩৫৯।
33. শাস্ত্রী, শিবনাথ। *ইংলণ্ডের ডায়েরি*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ২০০৯।

34. সেন, অভিজিৎ, রায়, উজ্জ্বল (সম্পা.)। *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ*। কলকাতা: স্ত্রী, ১৯৯৯।
35. সেন, চন্দ্রশেখর। *ভূপ্রদক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন (১ম খণ্ড)*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯২০।
36. সেন, জলধর। *আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ,* বর্ধমান রাজ বিজয় চাঁদ মাহাতবের “Impression” অবলম্বনে রচিত। কলকাতা: গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড সন্স, ফাল্গুন, ১৩২১।
37. সেন, সুধা। *সুদূর পশ্চিম ভ্রমণের দিনলিপিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বুক কোম্পানি, ১৯৪০।

ইংরেজি

1. Dutt, Romesh Chandra. *Three Years in Europe, 1868-1871* (*including an account of his second visit in 1886).* Calcutta: 1896.
2. Sen, Keshubchunder. *Keshubchunder Sen in England Diary, Seremons, Addresses & Epistles.* 95, Keshubchunder Sen Street: Nababidhan Publication Committee, 1938.
3. Tagore, Rathindranath. *On The Edges of Time.* Kolkata: Orient Longmans, June, 1958.

অনুষঙ্গ:

বাংলা

1. আচার্য, অনিল, চক্রবর্তী, অরিন্দম (সম্পা.)। *বাঙালির ইওরোপ চর্চা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, এপ্রিল ২০১৬।
2. আজুমা, কাজুও। *প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ও জাপান*। কলকাতা: পুনশ্চ, মে ২০১০।
3. কৃপালনী, কৃষ্ণ। *দ্বারকানাথ ঠাকুর: বিস্মৃত। পথিক.* রায়, ক্ষিতীশ (অনূদিত)। ভারত: ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪।

4. ঘোষ, বিনয় (সম্পা.)। *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিন্তা*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৬৩।
5. ঘোষ, বিনয়। *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: বাক্ সাহিত্য, অক্টোবর ১৯৭৫।
6. ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: ওরিয়েণ্ট লংম্যান, আষাঢ় ১৩৯১।
7. ঘোষ, মন্মথনাথ। *কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র*। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৩১৩।
8. ঘোষ, সুরেশচন্দ্র। *দাদার কথা: স্যার রাসবিহারী ঘোষের জীবন-কথা*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, এপ্রিল ২০১৩।
9. চক্রবর্তী, দীপেশ। *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট, ২০১১।
10. চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। *একাল যখন শুরু হল*। বাগচী, জয়িতা (সম্পা.)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর ২০০৭।
11. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০১৪।
12. চক্রবর্তী, স্বপন। বাঙালির ইংরাজী সাহিত্যচর্চা। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১১।
13. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল, ২০০০।
14. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।
15. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড। যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ বৈশাখ ১৪০৫।
16. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সংকলন)। *প্রবাসী নির্বাচিত সংকলন: সংকলিত,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা: মাঘ ১৪১১।
17. চৌধুরী, প্রমথ। *আত্ম-কথা*। কলকাতা: দি বুক এম্পরিওম লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩।
18. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। *আমার বাল্যকথা*। দত্ত, বিমলেন্দ্য (সম্পা.)। কলকাতা: কারিগর, বইমেলা ২০১৬।
19. দত্ত, মধুসূদন। *মধুসূদন রচনাবলী*। গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ২০১৫।
20. দাস, কৃষ্ণভাবিনী। *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ,* চট্টোপাধ্যায়। অরুণ (সম্পা.)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৪।

21. দে, মাধবী। *ব্যক্তি ও স্রষ্টা মণীন্দ্রলাল বসু*। কলকাতা: *পুস্তক বিপণি,* ২০০৩।

22. দেব্যা, রাজলক্ষ্মী। *কেদার বদরী ভ্রমণ-কাহিনী ও অন্যান্য তীর্থচিত্র*। সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সম্পা.)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

23. পাল, বিপিনচন্দ্র। *আমার জীবন ও সমকাল* (প্রথম পর্ব্ব)। বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা (অনূদিত)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

24. পাল, বিপিনচন্দ্র। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। দাশ, অমিত (সম্পা.)।কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ডিসেম্বর ২০০৯।

25. বক্‌সি, দ্বিজেন্দ্রনাথ। *আধুনিক জাপানে তীর্থভ্রমণ ও একটী মূর্তিতাত্ত্বিক সমীক্ষা*। কলকাতা: বেন্‌তেন্‌ পাবলিশার্স, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪।

26. বন্দ্যোপধ্যায়, ভবানীচরণ। *নববাবুবিলাস, নববাবুবিলাস, নববিবিলাস, কলিকাতা কমলালয়*। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.)। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯।

27. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১।

28. বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতেন্দ্র, রায়, মণীশ, চক্রবর্তী, তারাদাস (সম্পা.)। *বিভূতি রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৭।

29. বসু রাজনারায়ণ। *সে কাল আর এ কাল*। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বৈশাখ, ১৩৮৩।

30. বসু স্বপন (সম্পা.)। *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ডিসেম্বর ২০০৮।

31. বসু স্বপন, চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.)। *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২৯ নভেম্বর ২০০৩।

32. বসু স্বপন, হর্ষ দত্ত (সম্পা.)। *বিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১১ই মার্চ ২০০০।

33. বসু, রাজনারায়ণ। *আত্মচরিত*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০০৬।

34. ভট্টাচার্য, তপোধীর। *পশ্চিমের জানালা*। কলকাতা: একুশশতক, ১৪১৯।

35. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতিঃ ১৮৫০-১৯৪৭*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৪১১।

36. ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল। *দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ*। কলকাতা: রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, আষাঢ় ১৩৪৬।

37. ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১৫।

38. মজুমদার, নেপাল। *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৬।

39. মজুমদার, লীলা। *সুকুমার*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মে ১৯৮৯।

40. মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ। *হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা*। কলকাতা: বাল্মীকি যন্ত্র, ১২৯৯।

41. মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর। *সঞ্জীবচন্দ্রঃ জীবন ও সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

42. মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*। কলকাতা: চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১৪।

43. রক্ষিত, নগেন্দ্র নাথ। *বিলাতের চিঠি*। কলকাতা: কালীঘাট প্রেস, ১৯৫৬।

44. রায় রামমোহন। *রামমোহন রচনাবলী*। ঘোষ, অজিত কুমার (সম্পা.)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৮।

45. রায়, রজতকান্ত। *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭।

46. রায়, রামমোহন। *রামমোহন রচনাবলী*। ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পা.)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩।

47. রীত, প্রত্যূষকুমার (সম্পা.)। *রামমোহন প্রসঙ্গে ক্ষীতীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫ শে বৈশাখ, ১৪১৭।

48. শাস্ত্রী, শিবনাথ। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.)। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ২০১৬।

49. শ্রীপান্থ। *কলকাতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ডিসেম্বর ২০০৫।

50. সিংহ, কালীপ্রসন্ন। *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*। নাগ, অরুণ (সম্পা.)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, আগস্ট ২০১৪।

51. সেন, বিজয় রাম। *তীর্থ-মঙ্গল*। বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২।

52. সেনগুপ্ত, প্রসাদ। *হিন্দু কালেজ*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

53. হালদার, গোপাল। *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, অগ্রহায়ণ ১৩৭২।

ইংরেজি

1. Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.
2. Barthes, Roland. *MYTHOLOGIES*. ANNETTE LAVERS (Trans.). New York: The Noonday Press, 1991.
3. Bhabha, Homi. K. *The Location of Culture*. London: Routledge, 1994.
4. Bhattacharji, Shobhana (Ed.). *Travel Writing in India*. New Delhi: Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 2008.
5. Bose, Sugata. *The Nation As Mother: And Other Visions of Nationhood*. Gurgaon: Penguin Random House, 2000.
6. Chakraborty Dasgupta Subha (Ed.). *Literary Studies in India: Genology.* Kolkata: Jadavpur University, Comparative Literature, July 2004.
7. Chakraborty Dasgupta, Subha (Ed.). *Of Asian Lands: A View From Bengal*. Kolkata: Centre of Advanced Study, Department Of Comparative Literature, 2009.
8. Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
9. Chowdhury, Nirad. C. *Autobiography of an Unknown Indian.* Mumbai: Jaico Publishing house, 2012.
10. Derrida, Jacques. *of Grammatology*, Corrected Edition. Gayatri Chakravorty Spivak (Trans.). Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press 1997.
11. Devee, Sunita. *The autobiography of an Indian Princess.* Murray, John(Ed.). London, 1921.
12. Duncan, James. Gregory, Dereck (Ed.). *Writers of Passage: reading travel writing*. London and New York: Rouledge, 2002.

13. Fisher, Michael. H. *Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain, 1600–1857*. New Delhi: Permanent Black, 2006.

14. Gikandi, Simon. *Maps of Englishness: Writing Identity in the Culture of Colonialism*. New York: Columbia University Press, 1996.

15. Grewal, Inderpal. Home and Harem: Nation, Gender, Empire, and the Cultures of Travel. London: Leicester University Press, 1996.

16. Guha, Rnajit (Ed.). *Subaltern Studies I.* New Delhi: Oxford University Press, 1982.

17. Hasan Mushirul (Ed.). *Westward Bound: Travels of Mirza Abu Taleb*. New Delhi: Oxford University Press, YMCA Library Building, 2005.

18. Hulme, Peter. Youngs Tim (Ed.). *The Cambridge companion to Travel writing*. Cambridge: Cambridge University press, 2002.

19. I'tesamuddin, Mirza Sheikh. The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, Originally in Persian, of a Visit to France and Britain. Kaiser Haq (Trans.), Leeds: Peepul Tree Press, 2001.

20. Lenin, Vladimir llich. *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*. Resistance Books, 1999.

21. Lisle, Debbie. *The Global Politics of Contemporary Travel writing*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

22. Loomba, Ania. *Colonialism/ Post colonialism: The new critical idiom*. London and New York: Routledge, 2005.

23. Louise, Pratt, Mary. *Imperial Eyes: Travel writing and Transculturation*. London and New York: Routledge, 1992.

24. Mandal, Somdutta (Ed.). *Indian Travel Narratives*. Jaipur: Rawat Publications, 2010.

25. Moares, Dom. *The Penguin Book of Indian Journeys*. New Delhi: Penguin, 2004.

26. Mookerji, Radha kumud. *Indian Shipping: A History of Seaborne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*. Munshiram Manoharlal PVT LTD, 2020.

27. Nietzsche, Friedrich. The use and Abuse of History. Adrian Collins (Trans.). New York: Macmillan, 1957.
28. Raychaudhuri, Tapan. *Europe Reconsider: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal.* Delhi: Oxford University Press, 1988.
29. Raychaudhuri, Tapan. *Perceptions, emotions, sensibilities: Essays on India's colonial and Post-Colonial Experiences.* New Delhi and Oxford : Oxford University Press, 1999.
30. Said, Edward. W. *Orientalism: Western concepts of Orient.* Penguin Books, 1985.
31. Sanyal, Ram Gopal. *A general biography of Bengal celebrities: both living and dead.* Kolkata: Uma Churn Chucker Butty, 1889.
32. Sarkar, Sumit. *Modern India 1885-1947.* New York: St. Martin's Press, 1989.
33. Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics.* Wade Baskin (Trans.), Perry Meisel and Haun Saussy (Ed.). Columbia University press, 1959.
34. Sen, Simonti. *Travels to Europe:`self and other in Bengal Travel Narratives 1870-1970.* New Delhi: Oriental Longman Private Limited, 2005.
35. Sharma, K, Sinha, A.K, Banerjee, B.G*. Anthropological Dimensiomns of Pilgrimage*, New Delhi: Paragon Books, 2009*.*
36. Siegel, Kristi (Ed.). *Issues in Travel Writing: Empire, Spectacle, and Displacement.* New York: Peter Lang, 2002.
37. Thompson, Carl. *Travel writing.* London and New York: Routledge, 2011.
38. Todorov, Tzvetan. *The morals of History.* Alyson Waters (trans.). Minneapololis: University of Minnesota Press, 1995.
39. Viswanathan, Gauri. *Masks Of Conquest: literary Study and British Rule in India.* New Delhi: Oxford University Press, YMCA Library Building, 2000.

40. Youngs, Tim. *The Cambridge Introduction to Travel Writing.* Nottingham Trent University, 2013.

বৈদ্যুতিন জার্নাল:

1. Adler, Judith, Travel as Performed Art, Source: American Journal of Sociology, Vol. 94, No. 6 (May, 1989), pp. 1366-1391, Published by: The University of Chicago Pres Stable URL: https://www.jstor.org/stable/2780963, Accessed: 24-07-2018 09:30.
2. Burton, Antoinette,"Making a Spectacle of Empire: Indian Travellers in Fin-de-Siècle London", Source: History Workshop Journal, No. 42 (Autumn, 1996), pp. 126-146 Published by: Oxford University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4289470, Accessed: 03/06/2013 05:23.
3. Chandorkar, Leena, The Circle of Travel and the Journey of Life: Re-reading Pandita Ramabai's AmericanTravelogue, Source: Indian Literature, Vol. 57, No. 6 (278) (November/December 2013), pp. 160-172, Published by: Sahitya Akademi.
4. Chatterjee, Partha, Five Hundred Years of Fear and Love, Source: Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 22 (May 30 - Jun. 5, 1998), pp. 1330-1336, Published by: Economic and Political Weekly, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4406835, Accessed: 24-07-2018 09:37 UTC.
5. Codell, Julie F., "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives", Source: Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 173-189 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.173, Accessed: 03/06/2013 05:38.

6. Diana L. Eck, India's "Tīrthas": "Crossings" in Sacred Geography, Source: History of Religions, Vol. 20, No. 4 (May, 1981), pp. 323-344, Published by: The University of Chicago Press, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/1062459, Accessed: 24-07-2018 09:43 UTC.
7. Fisher, MichaelH., "From India to England and Back: Early Indian Travel Narratives for Indian" Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 153-172 Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.153, Accessed: 03/06/2013 05:38.

8. Gupta, Jayati, Modernity and the Global "Hindoo": The Concept of the Grand Tour in Colonial India, Source: The Global South, Vol. 2, No. 1, India in a Global Age (Spring, 2008), pp. 59-70, Published by: Indiana University Press, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40339282, Accessed: 24-07-2018 09:34 UTC.
9. Gupta, Swarupa, 1857 and Ideas about Nationhood in Bengal: Nuances and Themes, Source: Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 19 (May 12-18, 2007), pp. 1762-1769, Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4419582, Accessed: 24-07-2018 09:35
10. https://www.tagoreweb.in/.

11. Mukhopadhyay, Bhaskar, Writing Home, Writing Travel: The Poetics and Politics of Dwelling in Bengali Modernity , Source: Comparative Studies in Society and History, Vol. 44, No. 2 (Apr., 2002), pp. 293-318, Published by: Cambridge University Press
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3879448, Accessed: 24-07-2018 09:26 UTC.

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43856514, Accessed: 24-07-2018 09:40.

12. Tickell, Alex, Negotiating the Landscape: Travel, Transaction, and the Mapping of Colonial India Source: The Yearbook of English Studies, Vol. 34, Nineteenth-Century Travel Writing (2004), pp. 18-30 Published by: Modern Humanities Research Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3509481, Accessed: 03/06/2013 05:49.
13. Trivedi, Harish, The First Indian in Britain Or "The Wonders of Vilayet" Source: Indian Literature, Vol. 47, No. 6 (218) (Nov-Dec 2003), pp. 169-177 Published by: Sahitya Akademi Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23341080, Accessed: 03/06/2013 05:33.